স্বনির্বাচিত
কিশোর সমগ্র

মহাশ্বেতা দেবী

পুনশ্চ
৯এ নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

SWANIRBACHITA KISHORE SAMAGRA
A Collection of bengali stories & novels
by Mahasweta Devi

First Published
January, 1959

Price : Rs. 40.00 Only.

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ১৯৫৯

প্রকাশক
পুনশ্চ
১১৪ এন, ডা: সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী রোড
কলকাতা-৭০০ ০১০

মুদ্রক
ডটলাইন প্রিন্ট এ্যাণ্ড প্রসেস
১১৪ এন, ডা: সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী রোড
কলকাতা-৭০০ ০১০

ISBN 81-7332-087-X

দাম ঃ ৪০.০০

সূচিপত্র

মানিক দুলের বন্ধু

মানিকের চোখ থেকে ঘুম তখনও যায়নি, মানিকের মা'র চিল চিৎকারে পাখপাখালিও জেগে উঠল। কী হয়েছে? ডাকাত পড়েছে? না অন্য কিছু?

—চার চারটে ছেলে থেক্যে লাভ কি? সড়কি, টেঁটা, তীরধনুক কি নেই ঘরে? আমার এমন মেটে আলুর বন! সব খুঁড়ে তেড়ে খায়্যে গিছে দাঁতালটা? কবে থেকে বলছি দুর্দান্ত দাঁতাল! ওটা বরা নয়, রাক্ষস! মার উটোকে। তা মারবে কেন? চারটেই তো অমনিষ্যি।

"অমনিষ্যি" শুনে মানিকের হাসি পেল। মা রাগলে অমন বড় বড় কথা বলে বটে। সেদিন রামের পিসি সর্ষের তেল ধার করতে এসেছিল। মাকে খুশি করার জন্যে সেই বলেছে, তোর মত ভাগ্যি কার বউ? পাঁচ ছেলে যেন পাঁচটি অত্ন বললে হয়। কী গলার জোর, কী হাঁকুড়ি, আহা দেকতে যেমন দশানন! অমনি মা বলল, পাঁচটি অত্ন, না চখে ছানি পড়েছে তুমার? চারটে ছেলে মানুষ না কী? দেখতে নরাকার। আসলে ভুস্যি! আর মানিকটো? উটো আমার গলার কাঁটা বললে হয়!

-- ছি বউ, অমন কথা বলতে নাই।

-- দুলে বাগ্‌দীর ঘরে অমন ছেলে জন্মায় কেনে বলতে পার? না লাঠি, না সড়কি, তোর দাদারা লাঠি ঘুর্যে গোবর সিংগির খাজনা লুটতে গেছে, কালীনাচ লেচ্যে চাল, নারকেল, কাপড় আনে, রুপোর আধুলি। তুই? তুই জানিস বনে-বাদাড়ে ঘুরতে।

-- পাঁচটো আঙুল কি সমান হয়?

-- সব কটা অমনিষ্যি।

-- কী বললি বউ?

-- অমনিষ্যি! কথা বুঝ না?

-- তোর মত কতা আমরা জানি?

হ্যাঁ। মা চারটি কথা জানে বটে। মানিকের মামাবাড়ি সৈদাবাদের ওপারে কুঞ্জঘাটা। সেখানে না কি মহারাজ নন্দকুমার এত এত বামুন পণ্ডিত এনে বসত করিয়েছে। সবাই টুলো পণ্ডিত। অনেক মন্তর, শোলোক জানে। মা দিদিমার সঙ্গে বামুনদের তালপাতা জোগান দিত।

তালপাতা জলে ভিজিয়ে, সেদ্ধ করে, পাট পাট করে তবে লেখার যুগ্যি হয়। দুলে বাগ্‌দী ছাড়া তালপাতা জোগাবে কে? জোগাত আর বামুনদের কথাবার্তা শুনত। শুনতে শুনতে মা অমনি বড় বড় কথা শিখেছে। অমনিষ্য, পঙ্গপাল, অরন্ধন, গভ্যস্রাব, অম্রেত, কত কী! এই বনের কানাচে ঘোনাপাড়া গ্রামে মানিকের মায়ের সম্মান খুব। মা স্বচক্ষে মহারাজা নন্দকুমারকে দেখেছে। কুঞ্জঘাটা রাজবাড়ির রথ, দুর্গাপুজো দেখেছে, গঙ্গার বুকে নৌকো বোঝাই সেপাই লস্কর দেখেছে। মায়ের মতো কে আছে?

সে জন্যে মাকে সবাই খাতির করে। আর বলতে কি!

মানিকের দাদারা মাঝে মাঝে অধর সিংগির লেঠেলগিরি করে, মাঝে মাঝে গোবর সিংগির। গোবরের নাম গোবর্ধন. কিন্তু মা বলে গোবর সিংগি। যখন এর লেঠেল, তখন ওর বাগান, পুকুর, হাটের সওদা লুঠ করে। যখন ওর লেঠেল, তখন এর। সে জন্যে মানিকের মায়ের ঘরে এটা সেটা থাকত। মা অবশ্য ধারও দেয় পাড়াপড়শিকে। রামের পিসিকে এক ঘটি তেল দিয়েছিল মা। বলেছিল, তেল নাই বুঝি?

-- আর থাকে বউ? হুঁদো হুমকো তিন ছেলে কোত্থেকে লাঠি আনছে তো আনছেই। তেল মাখাচ্ছে তো মাখাচ্ছেই।

জিগ্যেস করল্যে কথা ভাঙে না মোটে।

-- ভাঙবে কেনে? একোর চ্যালা হয়েছে না সব ক'টা?

-- চলি বউ। এক খালুই কই মাছ রেখে গেলাম, খেও। যেমন তেমন নয়। বাদার কই!

রামের পিসি চলে গেলে মানিকের মা বলেছিল, মাথায় এক ছিটো বুদ্ধি নাই? অযচ্ছল কই মাগুর হাওড়ে, মানিক আনছে তো আনছেই। আমার বাড়ি কেউ মাছ দেয়?

কিন্তু আজ সকালে মা খেপল কেন?

মানিক চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল।

-- কী হয়েছে মা?

-- সব্যনাশ করে গেছে দাঁতালটা।

--ইস্‌স!

-তোর দাদারা কুথাক্?

-- তেতপ্পর রাতে ফিরেছে তো, ঘুমচ্ছে।

--বটে! কাল মাচাঙে বসার কথা ছিল না একো আর দুকোর?

যা! সব ক'টাকে তোল। তোরে দে হবে নাই। আমি ঝ্যাটা মেরে বাড়িতে সবগুলানকে তুলছি।

মানিক সরে পড়ল বাঁকে বসানো দুটো মেটে কলসি নিয়ে।

— তুই যাচ্ছিস কুথাক্?

— বড় পুকুরের জল নে আসি, ভাত বসাবি না? খেতেও তো জল লাগবে।

যেতে যেতেই মানিক শুনতে পেল, মা চেঁচাচ্ছে, উঠলি?

মুখপোড়া অমনিষ্য সব! কুনো কাজে মন নি! বনের ধারে ঘর, কৎ সোবধানে থাকবি, না কোনরকম হুঁশপব্য নাই গা?

শিয়াল এসে হাঁস ধরছে, ময়াল সাপে ছাগল খাচ্ছে, দাঁতাল এসে ভুস্যিনাশ করছে, সব আমার ঘাড়ে? আমিও পবন লেঠেলের মেয়ে, তোদের ঠ্যাং ভেঙে রেখে দিব...

বড় পুকুর বলতে পাশের বনের মাঝে পুকুর। ছিল, সিংগিদেরই কোন শরিকের বাড়ি ছিল, বাগান ছিল, পুকুর ছিল। বর্গীর হাঙ্গামার সময় বর্গীরা তো লুটপাট খুনজখম করত, ঘরে আগুন দিত। হাঙ্গামা শুরু হয় অনেক আগে।

মানিক তখন জন্মায়নি। সে সময়েই দেশ ঘর ছেড়ে ওরা পালিয়ে যায়।

কোথায় কোন পদ্মাপারে চলে গেছে সব! বর্গীর হাঙ্গামার কথা মা বলে না, ঠাগ্‌মা বলে। ঠাগ্‌মার বয়স অনেক। রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখেছে যে, তার বয়স হবে না? ছোটবেলা মানিক বলত, সত্যি, মা?

- কী সত্যি?

মা খেজুরপাতার চেটা বুনতে বুনতে বলত। মা বসে থাকতে পারে না কোনদিন। এই চ্যালা চ্যালা কাঠ চ্যালাবে, এই বড় বড় মাটির হাঁড়িতে ভাত রাঁধবে, মাটির কড়াইয়ে মাছ-

কাঁকড়ার বেন্নন, ধপাধপ কাচবে কাঁথা মাদুর, আর যখন কোন কাজ নেই, তখন খেজুর পাতার চেটা বুনবে পিদিমের আলোয়।

ঠাগ্‌মা বলবে, সেই সাতবছুরে খুকি আনলম। পাঁচ বেটা বেটির মা হলি, কপাল পুড়ল, তখনে নয় ভেস্যে ভেস্যে বেড়ালছি। আখুনও দু'দণ্ড বসতে জানিস না?

- না মা! বসে থাকলে আমার রঙ্গ যেমন রবশ হয়ে পড়ে।

- এত খাটনি খাটলি?

- তুমি বা শোঁসা পাড়তে যেয়ে নাপ মেরে মাজা ভাঙলে কেন? নইলে তো একটু সাহায্য হত।

- পেরথম ফলটা...ষাঁড়াতলায় দেব...

- নাও, এখনে ঘুমোও দেখি?

- তুই শুবি না?

- অমনিষ্যগুলো আসুক?

মানিক বলবে, হ্যাঁ মা, ঠাগ্‌মা রামরাবণের যুদ্ধ দেখেছে? সত্যি?

- ই কি ছেলে রে! ঠাগ্‌মার কথায় অবিশ্বাসী? এখনে ঘুমবি না মানিক! দোরআগড় দিতে হবেক।

- বুঁচি যে ঘুমচ্ছে?

- কৎখন জেগে থাকতে পারে? ছাগল তুলল, হাঁস তুলল, পিদিম জ্বালল, মশালে কাঁটালআটা জড়াল, আর পারে?

ঠাগ্‌মা বলবে, বউগুলো নে আয়। বুঁচিকে শউর ঘর পাটা!

- তুমি ঘুমবে? না কি দক্তাপাতা মুখে দিউনি আজ?

- দিইছি, ঘুমই।

ব্যস, বুঁচির পাশে ঠাগ্‌মা শুয়ে পড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে নাকডাকানি কী!

না, মানিকদের অনেকগুলো ঘর নেই। বনের বাঁশ কেটে, মারি কেটে এক উঠোনে পাশাপাশি দুটো বড় ঘর। একটা ঘরে উঁচু মাচাঙে, মা ঠাগ্‌মা আর বুঁচি শোয়। মাচাঙের নীচে চারটে ছাগল বাঁধা থাকে, কোণে থাকে বাঁশের খাঁচি চাপা হাঁসগুলো। কাঁঠাল কাঠের ভারি দরজা বন্ধ করলেই ঘরের ভেতরটা কী নিশ্চিন্ত, কী নিশ্চিন্ত! মানিকরা পাঁচ ভাই ঘুমোয় পাশের ঘরে। ঘরের ওপর পাটাতনে শুধু বর্শা বল্লম দা। ওদের মাচাঙের নীচে সর্ষে, কলাই চাল।

মা'র ঘরে দেয়ালে বাঁশের গজালে ঝোলে বাবার মাথার মাথাল, বাবার হাতের সড়কি, আর ধনুক।

বাবাকে মানিকের মনে পড়ে না। সে নাকি মস্ত শূরবীর মানুষ ছিল। পবন দুলে যখন হাঁকাড় মেরে তীর ছুঁড়ত, বা সড়কি চালাত, বাঘ বল, ডাকাত বল, ভয়ে পালাত।

বর্গীর হাঙ্গামা, বর্গীর হাঙ্গামা! সে সময়ে নাকি বাবা ছিল দুর্লভ রায়ের ডান হাত। দুর্লভ রায়ের এই কোঠাবাড়ি, ঘরের নীচে পাতাল ঘর, সুখবাড়ি আর মোহনপুর মৌজার খাজনা বাবার পাহারায় পাতালঘরের তৌজিখানায় রাখা হত। বাবা পেয়েছিল চাকরান জমি, বছরে দু'মোহর মাইনে, পায়ের মশমশে জুতো, গায়ের পিরান, আর সম্বচ্ছরের চাল। বর্গীরা যে বছর প্রথম মুর্শিদাবাদ ঢোকে, তখন দুর্লভ রায় নবাবের ফৌজদার। তিনি লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকেন, পরিবার থাকে সুখবাড়িতে। বাবা, গঙ্গা কাকা, দুলে- বাগদী- ডোমরা সুখবাড়ি আর মোহনপুরে বর্গী ঠেকাত। দুলে-বাগদী -কাওরা- ডোম সব তো শূরবীরের জাত। সাধে কি মতি ডোম বল্লম নাচিয়ে কালীনাচ নাচে আর গায়, আগে ডোম, বাগে (পাশে) ডোম, পিছে ডোম সা- জে! ঢাঁই-মেগর- ঘাগর বা - জে! এদের মেটে বাড়ি, সে বাড়িতে তো বর্গীর লোভ নেই। ওরা হানা দিত, ঘিরে ফেলত পাকা বাড়ি, বেটাছেলেদের

বলত, যা আছে সব আনো- টাকা, সোনা, রুপো, স-ব! তা দুর্লভ রায়ের বাড়ি চারবার লুঠ হয়। গোয়াল পোড়ে, গোলা পোড়ে, চতুর্থবার বাবা বলেছিল, মা জননী! আর তো পারা যায় না। জান বল, জান দেব। কিন্তু যা যাচ্ছে, তা তো ফেরাতে পারব না?

ভীষণ, ভীষণ সময় সেটা। ১৭৪১ থেকে ১৭৫১ কতবার যে বর্গীরা এল। রাঢ়ভূমি, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান ছেড়ে মানুষ পালাল পদ্মাপারের দেশে। পরিত্যক্ত বাড়ি জঙ্গলে ঢাকল, দেবদেউলে সাপ বাঘের আস্তানা, ধানখেত অনাবাদী পড়ে থাকে। তা দুর্লভ রায় যেবার উড়িষ্যার যুদ্ধে মারা গেলেন, সেবার দুর্লভ রায়ের বাড়ির সবাইকে বাবারা তুলে দিয়ে এল ভাওয়ালী নৌকোয়। যাও, গঙ্গাপারে যাও, বেঁচেবর্তে থাক। কর্তার বংশটা থাকুক। ভিটের জিম্মাদার পবন দুলে।

ওই ভিটে কেন, বাড়িও রক্ষা করতে চেয়েছিল বাবারা। তাই বর্গীরা এসে পড়লে বাবা বলেছিল, বাড়িতে মেয়েরা নেই, ছোট ছেলেমেয়ে নেই। আছি আমরা। লড়াই করে মারলে তবে ঢুকতে পাবে।

বর্গীরা একশ দুশ, —বাবারা বিশজন। কী ভীষণ লড়াই যে হয়েছিল ঘোড়সওয়ার বর্গী আর পায়ে হাঁটা পবনদের! তীর উড়ছিল, বর্শাবল্লম ছুটছিল, ওরা বলছিল "হর-হর মহাদেও!" বাবারা বলছিল, "জয় কালী!"

সেই যুদ্ধেই অনেকজনকে মেরে তবে বাবা মারা যায়। গঙ্গারাম কাকা, রামের জ্যাঠা, মতি বাগ্‌দি, ধনুর্ধারী বাগদী, অঙ্গদ কাওরা, এরা মরে গেছে মনে করে বর্গীরা বাড়িতে সোনাদানা না পেয়ে চলে যায়।

গঙ্গারাম কাকারা বাবাদের টেনে টেনে নিয়ে বাড়ির কাছারি ঘরে তুলে ঘরে আগুন দেয়। বলে, সগ্যে চলে যাও! লড়াই করে সগ্যেই যায়। কত্তাকে বলবে, তার বংশ বেঁচ্যে আছে।

বাবার পেতলের মাথাল, সড়কি আর ধনুকটা এনে মা'র সামনে নামিয়ে রেখেছিল গঙ্গারাম কাকারা। মা মুখে আঁচল গুঁজে দাঁড়িয়ে ছিল।

ঠাগ্‌মা হাহাকার করে কেঁদেছিল। সুখবাড়ির ঘরে ঘরে কান্না, ঘরে ঘরে কান্না। গঙ্গারাম কাকা বলেছিল, সুখবাড়িতে আর সুখ নেই গো! এবারে গাঁ-বসত তুলতে হবে।

শুনে ঘোনাবুড়ো বলেছিল, সে তো হবেই। সুখবাড়ি যারে বলছ, সে তো ছিল ফকির চক। তার আগে ছিল বিজুবন। তাই তো হয়। আজ বিজুবন, কাল গেরাম, পরশু শোঁসান। আবার নতুন গেরাম হয়।

সে এক সময় গেছে বটে! আলিবর্দি যুদ্ধ করে করে বাংলার নবাব হলেন, আর নাগপুর থেকে মারাঠারা এল চৌথ চাইতে। বাবা মাকে বলেছিও, দিল্লিতে বড়

বাদশা থাকে। তার কাছে বর্গীদের রাজা নাকি অনেক টাকা চেইছিল। সে এক গজকচ্ছপ বুড়ো বটে! বলে দিল, টাকা হেথা কোথা? যাও বাংলা মুলুক। সেখানে আলিবার্দি মহা সুখে রাজত্যি করছে। সে জনা দিল্লিতে টাকা পাঠায়, তবে আমার চলে। দেখ! খাজনার সিকি ভাগ, 'চৌথ'' তার কাছে যেয়ে নাও গা! সেই থেকেই বর্গীরা এসে মার-কাট-লুটপাট শুরু করল, আর আলিবার্দিও না কি আজ এ দেশ, কাল সে দেশ, তাদের সঙ্গে লড়াই করতে থাকল।

বাবা বলেছিল, যেগুলো ঘোড়ার পিঠ থেকে নামে নে মোটে, শুকনো ছোলা চিব্যে যুদ্ধ করে, সেগুলোই বর্গী। বড় নদী দেখলে ভয় পায়। ঘোড়া যে নদী পেরুতে পারে তেমন নদী পেরোয়, ঘোড়ার পিঠ ছেড়ে তো নামবে না। সড়কি চাল্যে দিলাম, বুক ফুঁড়ে পিঠ দে বেরুল, বেটা মরল ঘোড়ার গলা আঁকড়ে। বুঝেছ?

সে সময়ের কথা মা'র কাছে মানিক এত শুনেছে, এত শুনেছে যে চোখ বুজে গড়গড়িয়ে বলে যেতে পারে।

তখনি না কি দেশ ছেড়ে অগণন মানুষ পদ্মা পেরিয়ে পালায় কোন দেশ, কে জানে! আরেক দল পালায় কলকেতা-সুতোনুটি। সেথা মস্ত নদী! ঘোড়ার পিঠে চেপে পেরবে এত সুখ নেই।

ঠাগ্‌মা বলে, আমাদের সোনার রাজ্য শোঁসান হয়ে গিছল রে!

জগতরে কলকেতা নে গিছল দুল্লভের দাদা মাতঙ্গ আয়।

জগত থাকতে পারেনি। বলে ও বাবা! শওর যদি দেকতে হয়,

তবে মুশশিদাবাদের মত শওর থাকতে হোথা থাকবে কেন?

সেখানে নাকি সায়েবরা ঘোড়ায় চেপে ঘোরে, এই বড় বড় বাজার, আর বর্গীর ভয়ে যারা ধনীমানী পালিয়ে আসছে, তারা শুধু কাঠের ধোঁ দিয়ে ইট পোড়াচ্ছে আর কোঠাবাড়ি তুলছে।

তা বাবারা কয়েকজন শূরবীর মানুষই মরে গেল যখন, দুলে বাগ্‌দী-ডোম-এরা কি ভরসায় সুখপাড়ায় থাকত? সে সময়েই ঘোনা বাগদী, বাগ্‌দী পাড়ার সব চেয়ে বুড়ো আর জ্ঞানীগুণী লোক বলল, চ! আমরা নতুন গেরাম পত্তন করি।

ঘোনা বাগ্‌দীর নাম ছিল ঘনশ্যাম কিন্তু সবাই বলত ঘোনা দাদা! ঘোনা কাকা! ঘোনা ঠাউরদা, ঘোনা কর্তা! ঘোনা বাগ্‌দীর নাকি অনেক বিদ্যে জানা ছিল। সে অনাবৃষ্টিতে মেঘ ডেকে জল নামাত, অতিবৃষ্টিতে মেঘদের পাঠিয়ে দিত পুবে পশ্চিমে। সাপ কাটলে রোগী সারাত, গরু হারালে গুনে গেঁথে এনে দিত। জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে গাছপালার সঙ্গে কথা কইত। মানিকের দাদারা দেখেছে, বর্ষায় পুকুর ভেসেছে তো ঘোনা বাগ্‌দী হাঁটু জলে একটা ডোঙা ভাসিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

- অ ঠাউরদা! নিমনিমে আঁধার যে!

- চুপ কর্ মাছ ডাকছি।

- ডাকলে আসবে?

- তোর বাপ তো লাই, গঙ্গারামরে শুধা গে যা! মাছ ডাকলে না এসে পারে?

সত্যি সত্যি মাছ সার বেঁধে আসছে, আর লাফ দিয়ে ডিঙিতে পড়ছে।

মানিক যখন দেখেছে, ঘোনা ঠাউরদা তখন খুব বুড়ো। বুকের লোম, মাথার চুল, চোখের ভুরু, সব সাদা। তখনো একটা গোটা কাঁঠাল খায়, এক পালি চালের ভাত খায় দুপুরে কাঁঠালবিচি পোড়া, তেল-নুন-লঙ্কা দিয়ে।

মা তো বুঁচির বিয়ের কথা ওকেই জিগ্যেস করতে গিয়েছিল।

গ্রামে এমন মানীগুণী লোক আছে, যেন বটবৃক্ষের মতো সকলকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। বিয়ের পরামশ্য নিতে যাবে, টাটকা ভাজা মুড়ি, এক খালুই মাছ, এক ছড়া কলা আর এক কলসি গুড় নিয়ে গিয়েছিল মা। গাঁয়ের শিউলিরা হচ্ছে গ্যাছী। ওরা তাল খেজুরের রস জ্বাল দিয়ে পাটালি বানায়। তালের পাটালি হল ''লবাত'' আর খেজুরে পাটালি হল ''পাটালি''।

সব শুনে মেনে ঘোনাবুড়ো বলল, ছেলের নাম দুজ্জোধন?

- হ্যাঁ বাবা!

- বাপের নাম সুধন্য? সোনাডাঙায় ঘর?

- হ্যাঁ বাবা।

- বলি, তারা আল্য, না তুই গেলি?

- তারা আল্য।

- কী দেবে বলছে?

- উপোর নত, বালা, জসম, মুড়কি মালা!

- তা আর দিবে নাই? দুল্যভ রায়ের যত বাসনকোসন পোঁতা ছিল, সব সরিয়েছে সুধন্য আর তার বাপ কালা। সরিয়ে খাগড়ায় বেচেছে। মহাপাপী, মহাপাপী! দুল্যভ রায়ের বউ ভাবছে, বাসনপত্তর নিয়ে এল বলে, এরা তো এদিকে গিয়ে সোনাডাঙা উঠেছে। এখনি নাকি মহা মাতব্বর হয়েছে সুধন্য। মাথায় তালপাতার ছাতা, হাঁটু অব্দি ধুতি, গালে পান চিবোয় আর হাটে যেয়ে তোলা ওঠায়।

-ও মা! তবে আমার দোরে হাঁটছে কেনে?

-পবনের কোলপোঁছা মেয়ে বলে কথা! তারে বউ করে আনলে মান পাবে সমাজে। পবনের বিটি!

- তা হলে?

- কেন, তালুটের নয়ন দুলে? শূরবীর মানুষ! বাঁশ কাটে, বেচে, চাকরান জমি চযে, তিনটে ছেলেই নবাবের লেঠেল হবে। হোথা মেয়ে দাও গা!

নয়ন দুলের ছেলে গণেশের সঙ্গেই লক্ষ্মীর বিয়ে হল। ঘোনা বুড়ো ঘোনাপাড়ার পত্তন করেছিল তো! পুব-দক্ষিণে হাঁটতে হাঁটতে এখানে পৌঁছে ষাঁড়াতলায় শাবল পুঁতেছিল। বলেছিল, গাঁয়ের ঠাকুর গাঁয়ে ফেলে সব পালিয়েছে গো!

-কোথায় ঠাকুর?

- ঠিক বলিছি। সকালে দেখিস!

সকালে ষাঁড়াতলা খুঁড়ে আহা কী সুন্দর ঠাকুর বেরল।

পাথরপাটায় মা ষষ্ঠী, কোলে ছেলে, কাঁখে ছেলে, পাশে একটি বেড়াল মুখে মাছ ধরে আকাশপানে চেয়ে আছে।

সেই ঠাকুরই ষাঁড়াতলায় পিতিষ্ঠে হলেন। আর সকালে দেখা গেল, গ্রাম পত্তনের এমন জায়গা হয় না। চার চারটে পুকুর, আম-জাম-কাঁঠাল-বাতাপি-পেয়ারা-কুল, নানা নিধি ফলের গাছ। বাঁশঝাড় অনেকখানি জুড়ে, এক দিকে কানাইয়ের বিল, তাতে পানকৌড়ি আর মাছরাঙা। পুবদিকে ভাঙাচোরা বাড়ি। ঘোনাবুড়ো বলেছিল কোথা হতে বা এল বর্গী, জাগ্যত গাঁ শোঁসান হচ্ছে, মানুষ পালিয়ে যাচ্ছে কোথা কোথা। আবার দেখ! আমরা হেথা নতুন বসত কত্তেছি।

মানিকের ঠাগ্‌মা বলেছিল, এ কে করাচ্ছে, অ ঘোনাদাদা!

হ্যাঁ, ঘোনাকে "ঘোনা" বলে ডাকেনি কেউ। জ্ঞানীগুণী মানুষ একটা, যেন গাঁয়ের মাথা হবে বলেই জন্মেছিল।

- কে জানে কে করাচ্ছে? চত্তির মাসে যখন উলটোপালটা বাতাস বয় কে বওয়ায়? কোথাও চত্তির মাস লেগেছে গো পবনের মা! বর্গীদের টেনে আনছে এখানে, আবার হেথাকার, মানুষকে কোথায় পাঠাচ্ছে, অত ভেবে কি করব? হেথাই ঘর বাঁধি। কেমন বিজুবন হয়ে রয়েছে, আহা সব ছেড়ে গেছে গো!

- ওই যে ঘর দেখা যায়?

- না না, তারা ছিল মৌজামালিক নিশ্চয়। নইলে ইটের দালান দিত? পরের ঘরে বাস করতে নেই গো! অমন সাধের ঘরে থাকতে পারেনি। হোথা গেলে তাদের অভিশাপ লাগবে। আমরা দুলে-বাগদী-ডোম-কাওরা বই তো নয়। যেমন ঘর ছেড়ে এসেছি, তেমন ঘর বাঁধব? ইটের দালান দেখলে বর্গী আসবে।

- হেথা বর্গী আসবে না?

- এই বিজুবনে? আমাদের কাছে পাবে কী?

জোয়ান ছেলেরা বলেছিল, কী পাবে? লেঠেলের কাছে লাঠির ঘা, বর্শেলের কাছে বর্শার ঘা। ধানুকীর কাছে তীর? বকিস না পিসি, আমাদের কাছে পোঁটলা পোঁটলা কড়িও লাই, ঘরে সোনাদানাও লাই।

সেই থেকে গ্রাম পত্তন।

তা ঘোনাপাড়া নাম আপনা আপনি হল। নতুন গাঁ পত্তন হয়েছে শুনে ক্রমে ক্রমে লোক এল আরও। বর্গীর ভয়ে তখন কোথাকার মানুষ কোথা ছিটকে পড়ছে কে হিসেব রাখে!

কোথা মানকরা, কোথা সারগাছি, কোথা আবুইডাঙা, কোথা খালুড়ি, সব জায়গা থেকে ক্রমে ক্রমে লোকজন চলে এল। সবাই তো ঘোনাবুড়োর কাছেই আসত।

- খানিক জায়গা দেন আজ্ঞা। বগ্যির ভয়ে ঘুরে মরছি, আর মরে ঘুরছি।

-জায়গা দেবার আমি কে?

- কার মৌজা জানি না কিছু।

- এ একটা কথা বটে, মৌজা কার! আলিবর্দি যদি বাংলার নবাব হয়, তবে সকলি তো তার?

- হ্যাঁ কত্তা।

-সব যদি তার হবে, তবে নাতিকে পগগে বেঁধে সে ঘুরে মরছিল কেন? আলিবর্দি— যার মৌজায় নবাব, সে জনা আকাশে বসে সব দেখছে তার সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে, যাও, নির্ভয়ে বসত করগা! তবে বাবু এই কানাইয়ের বিল আর বাঁশবনটা ছেড়ে।

ঘোনাবুড়োর নামেই গ্রাম ঘোনাপাড়া হল।

যতকাল ছিল, সকলের মাথা হয়ে বাস করে গেছে। দোতলা মেটে ঘর ওরই ছিল। সকালে গরম ভাত রাঁধত, বিকেলে জল ঢেলে তাই খেত।

কার বিয়ে হবে, কে মরেছে, কার গরুর চোখ উলটে গেছে, কাকে সাপে কাটল, কোথায় বাঘ বেরিয়েছে, সব কাজে ঘোনার পরামর্শ।

ষাঁড়াতলার ষষ্ঠীপাটা তো গ্রামের রক্ষয়িত্রী দেবী হয়ে গেলেন। বিকেলে ঘোনাবুড়োসেখানেই বসত। পাঁচজনের খবর শুধোত। বসে থাকত যেন রাজা।

মরে গেছে এই গত ফাল্গুনে। গঙ্গারাম, মুকুন্দ, হাঁড়িরাম, পাঁচজাতের প্রৌঢ়রা এসে বসেছিল। মরণকালে ঘোনাবুড়ো বলে গেল, আবার বর্গী আসবে নিঘ্‌ঘাৎ। আমি সব মনে জানছি।

-কোৎ হতে? অ কাকা!

- অনে-ক ধুর হতে।

- সেই বগ্যিরা?

- নতুন বর্গী!

- কী হবে?

- সব শোঁসান হয়ে যাবে ক্রেমে ক্রেমে।

- কী দেখছ চোখ ঘুর্‍্যে?

- চোত থেকে জষ্টি জলছত্তর দিবি আমার নামে, আর, আর হলায়গলায় থাকবি, গাঁয়ে যেন সব একত্তরে থাকে, আর আমার কানাইয়ের বিলের ও পারে শোঁসানে দিবি।

এত কথা বলে বুড়ো মরে গেল।

মানিকের ঠাগ্‌মাই কাঁদল বেশি। বউ নেই, বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে মেয়ে জামাই কোথায় শিউড়ি না কোথা পালিয়ে গেছে, কেমন জ্ঞানীমানী লোক দেখ। ভুগল না, ভোগাল না। আহা, ওই তো আমারে রামরাবণের যুদ্ধ দেখিয়েছিল গো! আমি তখন লতুন বউ। সবে ঘর কত্তে এসেছি।

আগে তো মানিক বিশ্বাসই করত না যে ঠাগ্‌মা রামরাবণের যুদ্ধ দেখতে পারে। মানিকের বন্ধুও বিশ্বাস করত না।

এখন দুজনেই বিশ্বাস করে।

কেন করবে না বল?

ঠাগ্‌মার বাপের বাড়ি জেমোকাঁদীর ওপারে। সেখানে ছিল আকুশির রাজা ত্রিলোচন রায়ের হাতিশাল। ত্রিলোচন রায় ছিল মহা শূরবীর মানুষ। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর দরকারে ত্রিলোচন রায় হাতি পাঠাতেন। সে আস্তাবল, হাতির স্নান করবার, জল খাবার আকুশির বিল, সব গঙ্গার ভাঙনে না পদ্মার ভাঙনে চলে গেছে তা ঠাগ্‌মা জানে না।

ত্রিলোচন রায় বিজয়াদশমীর দিন হাতির লড়াই করাতেন। দেখতেন মাহুতরা কেমন শেখাচ্ছে হাতিদের। অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আর সবাই দেখত হাতির লড়াই।

একটা হাতির নাম ভীম, একটার নাম দুজ্জোধন।

একটার নাম কালীনাগ, একটার নাম কেষ্ট।

একটার নাম রাম, একটার নাম রাবণ।

তাই যদি হয়, তা হলে ঠাগ্‌মা দেখবে না রামরাবণের যুদ্ধ?

দেখবে না কেমন করে দুজনে লড়ে?

এ কথাই মানিক ওর বন্ধুকে বলেছিল। আর বন্ধুর সে কী হাসি। হেসে কুটিপাটি যাকে বলে। সেদিন বন্ধু ওকে একটা আশ্চর্য জিনিস খেতে দিয়েছিল।

- এমন মিষ্টি মিষ্টি, কী গো?

- খোবানি, তুমি খাওনি কখনো?

- কখ্‌খোন খাইনি।

- সকালে কী খেয়েছ?

- কেন, জল দেয়া ভাত।

- খেতে ভাল লাগে?

- খু-ব। মা যদি একটু আচার দেয়...

- মা খেতে দেন বুঝি?

- আর কে দিবে?

বন্ধু দিঘির জলে ছোট্ট একটা ঢিল ছুঁড়ে বলেছিল, আমাকে আমার মা কোনদিন খেতে দেয়নি। কোনদিন না।

-তোমার মা লাই বুঝি?

বন্ধুর চোখে অমনি ঘোমটা নেমে এসেছিল যেন। যেন নিজেকে আড়ালে ঢেকে নিয়ে বন্ধু বলেছিল, আছে, আবার নেইও।

- সে আবার কী?

- সে তুমি বুঝবে না। বোঝার দরকার কী? আর, কত কম দেখা হয় আমাদের, কত কম কথা হয়, এ সব কথা বলে কী হবে?

বন্ধুর কথা ভাবতে ভাবতে মানিক বড় পুকুরের কাচের মতো জল ভরল কলসিতে। মানিক শুনেছে, এ পুকুর যাদের ছিল, দেশ ছেড়ে পালাবার কালে তারা নাকি এখানে ঠাকুর দেবতার মূর্তি, পুজোর বাসন সব ডুবিয়ে রেখে গিয়েছিল।

দাদারা একবার বলেছিল, ডুব দে হাঁড়িগুলো তুলব?" মা বলেছিল, তা আর তুলবে না? একে খাটনির অন্ত লাই, তাতে পেতলের হাঁড়ির কালি তুলে মরি। আর, পরের দেব্য নিবি বা কেন?

- না, তুমিই তো বল, নলেন কাকা আজকাল তেমন হঁড়ি তিজেল গড়ে না।

- বুঝেছি। যা গাছের গুঁড়িটা চ্যালা করে ফেল একো। দুকো আর তেনো তালপাত কেটে ঘরের ছামনি সারবি। পেঁচো দু'সারে আগড় বাঁধবি। কী বাপের কী ছেলে! সে আগড় বেঁধেছে তো দাঁতাল হেলাতে পারেনি। তোরা অমনিষ্যি, কুপুত্তুর!

খুব যত্ন করে জল ভরল মানিক। মানিক ছাড়া কেউ বড়পুকুরে আসে না কষ্ট করে। আসবে কেন বল? ষাঁড়াতলার ষষ্ঠীপুকুরের জলই খায় সবাই। ও পুকুরে কাপড় কাচা, বাসন মাজা, স্নান করা নিষেধ।

চত্তির মাসে দু'কোশ দূরে হাটতলার পথে যে জলছত্তর দিল ঘোনাপাড়ার লোকরা, সেও তো এখান থেকেই জল নিয়ে। একা মানিক বড় পুকুরে আসে।

একা একা বনবাদাড়ে ঘুরতে তার ভাল লাগে, গাছপালার সঙ্গে কথা কইতে ভাল লাগে।

দাদাদের মত বর্শেল, লেঠেল হতে ভাল লাগে না। অমনি একা একা ঘুরত বলেই তো মানিক তার বন্ধুকে পেয়েছিল!

এখনও ভাবলে বিশ্বাস হয় না।

দুই

বন্ধুর কথা কেউ জানে না, জানবেও না। বন্ধুত্বের শর্তটাই এ-রকম। সে জন্যেই মানিকের ভাল লাগে এত। কেউ জানে না, কেউ জানে না। তার এমন একজন বন্ধু আছে, যে ঘোনাপাড়া বল, তালুট বল, সরাটি বল, কোনও জায়গায় কোনও মানুষের মতো নয়।

অবশ্য মানিকের বিশ্বভুবনটাই একটুখানি। ঘোনাপাড়া ছেড়ে কোথাও যায়ওনি মানিক। যেতই বা কী করে? জন্ম থেকেই ওর একটা পা সরু, দূর্বল। যে জন্যে ছোটবেলা থেকে আজ এগার বছর বয়স অব্দি মানিক অন্য ছেলেদের সঙ্গে সাঁতরে কানাইয়ের বিলের অনেকখানি গিয়ে পদ্মফুল তোলেনি। বর্ষার জলে ঝাঁপাঝাঁপি করেনি। গাছে উঠে আম পাড়েনি। পাখির ডিম চুরি করেনি।

কালী পুজোর এক মাস আগে থেকে ছেলেরা, জোয়ানরা কালীনাচতে যায়, চাল-কড়ি-কুমড়ো তোলে। মানিকের দাদাদের কালীনাচের দলের এতই নাম, যে দূরে দূরেও ডাকে। একবার নাকি ওরা কুঞ্জঘাটা গিয়ে নন্দকুমারের কাছারিতে নাচ দেখাবে। এমন আশা রাখে।

যায়নি, কোনদিন যায়নি মানিক কালীনাচ নাচতে।

শূন্যে লাফ মেরে হাতে তালি বাজিয়ে গায়নি

"লাচ মা লাচ গো রণকালী!

হেই মা তুমি লাচ শোঁসানে মশানে

লেচে লেচে দেখাও হে মা চতুরালি!"

কেমন করে নাচত? তার কি পা আছে?

চৈত্র মাসে রুদ্রদেবের উৎসব দেখতে যায়নি সরাটির পাশে গজালগাছায়। দাদা বলেছে, তুই যাবি সেথা মনসাকে হাঁস বলি দেই মুন্ডু ছিঁড়ে, দেখে পালাস। সেথা মড়ার খুলি নে লাচ, আগুন লাচ, মশাল নাচ, দেখল্যে পরে আটাশ খাবি। কোথাও যায়নি মানিক। মানিক সবসময়ে একলা। এখন তো ওর বয়সী ভোমা, সহদেব, ছিরে, জগা, সব ছেলেরা গুলতি দিয়ে পাখি মারে। জালে আঠা মাখিয়ে টিয়া ধরে, বেচতে যায় বেদেদের কাছে। ছিরে তো জ্যান্ত গোখরোর লেজ ধরে নিমেষে মাথার ওপর বোঁ বোঁ ঘুরিয়ে আছড়ে মারতে পারে, মানিক পারে না।

মানিককে নিয়ে ওর মা'র কম ভাবনা ছিল! কোলের ছেলে মানিক, বাপ বলতে কিছু জানে না। মানিকের পরে পরেই বুঁচিটা জন্মাল। কেমন করে যত্ন করত মা? ঠাগ্‌মাই তেল মাখাত, ঝিনুকে দুধ খাওয়াত। কিন্তু ডান পা তো অমনি থেকে গেল।

শেষে সরাটিতে মাটির ঘোড়া মানত করে এল মানিকের মা। আর পুজো দিতে

নিয়ে গেল মানিককে। গঙ্গারাম কাকার গরুর গাড়ি এসেছিল। মা, মানিক, ঠাগ্মা, বুঁচি, সবাই গেল। রামের পিসিও সঙ্গ ধরল।

কী সুন্দর দিনটা ছিল! বিষ্টি নেই, অথচ রোদ কড়া নয়। আকাশটা যেন ইচ্ছে করে সুয্যি ঠাকুরকে বলেছে, আজ তেতপ্পর তাত ঢেলো না ঠাকুর! আজ মানিক সরাটিতে যাবে। পথে তিনখানা গ্রাম, একটা জমজমাট হাট দেখেছিল মানিক। অবাক হয়ে মাকে বলেছিল, "শম্ভুদা এখানে সাপ খেলা দেখাচ্ছে, দেখ মা!"

ঠাগ্মা বলেছিল, দেখায়! ঘুরে ঘুরে দেখায়! কৎ বড় হাট রে বউ! রামের পিসি বলল, কাটরার বাজার দেখল্যে কী বলতে গো জ্যেঠি?

- নে! হাট আর দেখাস না আমাক্। আকুশির হাটে হাটবারে বিশটা হাট-মুনশি তোলা উঠাত। গো-হাটাই কৎ বড়! শৎ শৎ গরু!

বুঁচি বলেছিল, আমরা খাব্য না মা?

- না। পূজা মানব্য, মাটির ঘোড়া দিব্য। মা বিশালাক্ষী বড় জাগ্যত। মানিকের পা ভাল হব্যে, আমার দুখ্য ঘুচব্যে, এত খিদা কিসের? খেতে পেছিস্ তাতেই খিদা জাগ্যে। নাই পেতি, তো লাড়ী মর্যে যেত।

মানিক বলেছিল, আমাদের মা ষষ্ঠী জাগ্যত নয়, মা? তিনি আমার পায়ে জোর দিতে পারে না?

- তিনি কচি-কাঁচাদের দেখ্যে।

সরাটি মস্ত গ্রাম। বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে বিশালাক্ষী নাকি থানের পূজারীকে বলেছিলেন, গাঁ-বাসীকে বল্ কেনে? গাঁ ঘেরে মাটির আড়া দিক? আমি কি ঘোড়ার লাথ খাব্য?

তা গাঁ-বাসী সরাটি ঘিরে মাটির উঁচু পাঁচিল দিয়েছিল। এত মাটি কেটেছিল, এত মাটি, যে সে এক দিঘিই হয়ে গেল। সে দিঘিতে স্নান করে পুজো দিতে হয়। দিঘি থেকে মায়ের থান অব্দি পর পর দোকান। কুমোররা মাটির হাতি, ঘোড়া বেচে। মুড়ি, চিড়ে, বাতাসার দোকান, মাটির হাঁড়ি পাতিলের দোকান।

ভক্তিভরে পুজো দিয়েছিল মানিকের মা। মানিকের হাতে লাল সুতোর তাগা বেঁধে পুজারী বলেছিল, যা ঘরে। আজ হতে তোর পায়ের জ্বালা বেথা মা ল্যিল। মনে জোর কর্গা। সকল কাজ করবি, মায়ের নাম ল্যিবি, সাষ্টাঙ্গে পেন্নাম কর, থানের ধুলো খা।

বিশালাক্ষী বলতে এক বিশাল বটগাছ। তার কোটরে নাকি মা আছেন। মস্ত মাটির বেদী। দেখানে কত হাতি, কত ঘোড়া! হাতি মেনেছে মা! হাতির পিঠে বইতে হয়, তত ধান- সোনা-কাঁসা পেতল দাও! ঘোড়া মেনেছে, খোঁড়া-কানা-হাবা বোবাকে ভাল করে দাও, তাগড়া ঘোড়ার মতো ছনমনে।

পুজো দিয়ে মা সকলকে অবাক করে একটা ঢেবু পয়সা দিয়েছিল। বলেছিল, পা ভাল হলে মানিক এসে টাকা দিয়্যে পুজা দিব্যে গো মা!

মা চাল, বেগুন, লবণ, লঙ্কা আর ডালবাটা এনেছিল। দিঘির পাড়ে নতুন হাঁড়িতে রান্না ভাত, বেগুন, আর ডালবাটা সেদ্ধ, লবণ লঙ্কা দিয়ে খাবার স্বাদই আলাদা। পলাশপাতার থালায় সেই প্রথম খাওয়া মানিকের। পোষলা করে ওরা, তখন তো কলাপাতায় খাওয়া হয়।

বাড়িতে ওরা কানা উঁচু পিতলের থালায় খায়, পিতলের ঘটিতে জল।

ঘরে ফেরার সময়ে সব দেখতে দেখতে আসবে, মানিক ঘুমিয়েই পড়েছিল।

কী আশ্চর্য, এর পরেই মাকে আজরা বেদেনী তেল দিয়ে গেল। বলল, কবে বল্যেছিলি, তা অষুদপালা পাব্য, তবে তো তেল বানাব্য। বিষলক্ষীর পূজা দিলি, ই় তেল তো উ ঠাকুরথানে বেচ্যি আমি।

ঠাগ্‌মা বলেছিল, মায়ের মানসা এক বছরের, তা বাদে ত্যাল লাগাবি বউ।

সে এক বছর কবে কেটে গেছে।

মানিক এখন তেলও মালিশ করে। আর জোর করে কষ্ট করে বাঁকে জল বয়, ছাগল-হাঁস-মুরগিকে খেতে দেয়, মাছ ধরে ফটাফট। ছাঁকনি জাল ফেলে ধরে, ছিপ ফেলে ধরে, পুকুর ভাসলে গামছা দিয়ে ছাঁকে।

এগুলো মানিকের কাজ। কলুবাড়ি সরষে ভাঙিয়ে তেল করে আনে। উঠোনে লঙ্কা, বেগুন, লাউ, কুমড়ো, শসা, ডাঁটা আজ্জায়।

অনেক, অনেক কাজ করে।

বড়ছেলে এককড়ি, একো বলে, মা! আমরা অমনিষ্য, মানিক তবে কী?

- ও মানিক।

মেজ ছেলে দু'কড়ি, দুকো বলে, মা! মানিকের বিয়ে হব্যে না?

- মা বিশালাক্ষী জানে।

সেজ ছেলে তিনকড়ি, তেনো বলে, মা, মানিকটা পাগল!

কোথা কোথা ঘুর‍্যে?

- মা ওকে দেখব্যে।

ন'ছেলে পাঁচকড়ি, পেঁচো বলে, মা! ঘোনাদাদু বলত, মানিক সুলক্ষণ ছেলে।

মা নিশ্বাস ফেলে বলে, নয়তো কী? আপন মনে থাক্যে বটে, কিন্তুক ঘরের কথা ভুল্যে না। যতটুক্ পার‍্যে কর‍্যে।

তোদের মত্তো নয়, তাতে কী?

-আমরা কি মন্দ?

-না সন্না হেন ছেলা সব! লাঠি-সড়কি-বল্লম বাগাছিস কেনে? ডাকাত হবি?

-যেয়্যে নাম লিখাব চাঁদ রায়ের কাছে।

-তা বাদে?

- ফৌজে যেয়্যে লড়াই করব।

- তাতেই দল পাকাচ্ছিস সব?

একো বলেছিল, আখুন অবধি বাবার নাম লয় সব। তার বেটা হয়্যে আমরা...।

- যা করবি করগা যা! সে তার মায়ের কথা শুনে না। স্তি পুত্তর কথা ভাবে না। চিনত গুধা লুঢাই সোম্‌সার আমার! আর আমার বেটারা? চার বেটার চার বউ, গেঁদা গেঁদা মিঞা সব। আখুন আনতে পারি না। বুঁচিরে তো লিয়্যে যাবে তারা, তখুন? ঘরের কথা মনে ভাবিস? আমি কতদিন আর?

-না না, আখুনি তো যাব না। ঘর বা দেখব না কেনী? চার বেটা ফৌজে গেলে মা! উঠানে গোলা বাঁধব্য।

- বুঝলাম!

- বিশ্বাস যায় না তোর?

- গেলম বিশ্বাস। কুন কালে বিয়া, তা হতে সোমসার, সোমসার, সোমসার! তুরাদের বাপ ঘর আসতে রাত কত্য! আখুন সোমসার যেমুন তিতা লাগে গ! কবে বা তুরা বুঝবি, কবে ছুটি পাব্য?

ঠাগ্‌মা বলে আমি আছি না? ছুটি কথা তোর? মানিক আখুনো আবুঢ়া।

- না, উয়ার বিয়া দিব নাই। একোদের বিয়া আমি দিল্যম না তুমি?

মানিকের চার দাদার বিয়ে, সেও গল্পকথা। বন্ধু সে গল্প শোনে আর হাসে।

-কত বছর হল?

অ্যানে-ক কাল। তখুন আমি ছোট।

- এক সঙ্গে চারটে বিয়ে?

- হাঁ। ঠাগ্‌মার পা ধরল্য পরম দুলে।

পরমেশ্বরের চার মেয়ে। মানিক যখন হয়নি, তখনই পরমেশ্বর ঠাগ্‌মাকে বলত, পিসি! কী বুদ্ধি করে জন্মেছে সব! চারটে মেয়েই তোমার চার নাতি চেয়ে খানিক খানিক ছোট। সময় হলে আমি আর পবন বেয়াই হব।

তখন ওরা সুখবাড়ি থাকে। উঠোনের তিনদিকে তিনটে ঘর। একদিকে গোয়াল। মানিক শুনেছে, শত কাজের মধ্যে বাবা গরুর খোল জাবনা মাখত, গরুর গা দলাই-মলাই করত, গোয়াল ঝাঁটা দিয়ে ধুত। বলত, দুদ দিয়ে কচিকাঁচাদের বাঁচ্যে রাখে, এটোকা যতন কত্তে হবে।

সুখবাড়িতে না কি অনেক সুখ ছিল।

কিন্তু সে সুখ তো থাকল না।

ঘোনাপাড়ায় এসে তবে পরমেশ্বর দুলে মানিকদের বাড়ি এল তিন বছর আগে। ঘোনাদাদুও বলল, বিয়ে হোক, বিয়ে হোক, অ্যানেক দিন গাঁয়ে বিহাপরব নাই।

দাদার নাম এককড়ি, বউয়ের নাম তারা।

মেজদাদা দু'কড়ি, বউয়ের নাম পরী।

সেজদাদা তিনকড়ি, বউয়ের নাম ভুতি।

ছোটদাদা পাঁচকড়ি। বউয়ের নাম দুলি।

বিয়ে হয়েছে, গরুর গাড়িতে বউ এসেছে ঘরে। বিলের মাছ। রাঙা চালের ভাত, কাঁটাচচ্চড়ি আর চালতার টক সবাই খেয়েছে পেট ভরে।

আটদিনের দিন বউরা বাপের বাড়ি কাটজুড়ি ফিরে গেছে।

বন্ধু বলে বউরা আসবে না?

- আখুনো ছোট, খানিক বড় হোক।

বড় হলে আসবে?

- হ্যাঁ, তখন ওরা বাসনকোসন, পাঁচমশলা, তেল, চিঁড়ে মুড়কি দিয়ে সাজ্যে পাঠাবে। বুঁচিরও তো বিয়ে হয়েছে, সেও ঘর কত্তে যাবে। আর, মা বলে, দাদারা ঘর তুলুক আরও। বউ এনে রাখবে কোথায়?

- তোমার বিয়ে হবে না?

মানিক মাথা নাড়ে।

- মা বলে, আমার নাকি সংকটা ফাঁড়া আছে। যদি নাই বাঁচি?

- সেই জন্যে বুঝি গলায় মাদুলি পরেছ?

- হ্যাঁ...

- আচ্ছা বন্ধু! আমি তোমাকে খুব বড় পীরের মাজার থেকে খুব ভাল মাদুলি এনে দেব।

- কবে দেবে গ?

-এরপর যেদিন আসব?

বলেই চলে যায় বন্ধু। মানিকের ওপর নিষেধ আছে, সে কক্ষনো উঠে দেখতে যায় না বন্ধু কোথা দিয়ে গেল। কিন্তু ঘোড়ার পায়ের খটাখট শব্দ শুনতে পায়। তখন মানিক উঠে পড়ে। এ বাগানটা যেন গল্পের দেশের বাগান। বিশাল, বিশাল বাগান। সবটা উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। ঘোনাপাড়া ছাড়িয়ে, কানাইয়ের বিলের পুবে এমন একটা বাগান আছে তা মানিক জানতই না। কী সাহস করে পাঁচিলের নীচে জল বইবার নালা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল একদিন।

কী আশ্চর্য, কী আশ্চর্য, শত শত আম গাছ, প্রতিটি গাছ নিচু পাঁচিলে ঘেরা। বাগানের মধ্যে দিয়ে জলবাহী নালার জাল বেছানো। কানাইয়ের বিল থেকে তিরতিরে জল ঢুকছে তো ঢুকছেই।

একপাশে এক মস্ত দিঘি। তার বাঁধানো ঘাটের মাথায় চবুতরা।

বাগানে মখমলের মতো সবুজ ঘাস। জলে পদ্ম ফুটে আলো হয়ে আছে।

মানিকের মনে হয়েছিল সগ্যে চলে এসেছে সে। কী সুন্দর কী সুন্দর! আর যেই দেখল এক জোড়া নীলকণ্ঠ পাখি ডানা মেলে উড়াল দিয়ে নেমে এসে ঝুপঝাপ জলে স্নান করছে সেই মানিকের মন যেন আলো হয়ে গেল। কেন হবে না বল? এ তো সবাই জানে যে অনেক ভাগ্য করে এলে তবেই জোড়া নীলকণ্ঠ পাখির দেখা মেলে।

ঘাটের সিঁড়ি ধরে নেমে মানিক জল খাবে বলে মাথা নিচু করল। জলে একটা পাতলা রোগা ছোট ছেলের ছায়া। ছেলেটার রং তামাটে। কোমরে ছোট্ট ধুতি, কোঁকড়া চুল তেলে জলে চকচক করছে। গলায় কাল সুতোর সঙ্গে একটা মাদুলি। ছেলেটার মাথার ওপর কী নীল আকাশ!

মানিক ফিসফিস করে বলল, এটা আমার বাগান। ভগমান আমার তরেঁই বাগানটো সির্জেছে।

একটা পাতা ছিঁড়তে ইচ্ছে হল না মানিকের, একটা ফুল ছিঁড়তেও না।

কিন্তু বাড়িতে ফেরার সময়ে মানিক কানাইয়ের বিলের কিনারা থেকে এত এত সুষনি শাক তুলে এনেছিল। মা বলে, সুষনি শাক কেউই আনে না গ! ওই শাক খেলে গা ঢেলে ঘুম আসে।

বাগানটা যে কতদূরে তা মানিক বাড়ি ফেরার সময়ে বুঝেছিল। মা বলেছিল, কুন বনবাদাড়ে ঘুরিস?

- দেখ মা, কেমুন শাক!

- পেলি কুথা?

- কানায়ের বিলে।

ঠাগ্মা নিশ্বাস ফেলে বলেছিল, এমন অবেলায়, বিলের ধারে কু বাতাস বয়। ভূতে ঢেলা মারে।

মানিক যে কবে ভূতের লাথি খাবে!

বুঁচি বলেছিল, ইস্! ছোটদাদার মাদুলি আছে না? ভূত ওর কাছকে ঘিঁষবে নাই।

বুঁচির জন্যে লাল লাল গুঞ্জা ফল এনেছিল মানিক। বুঁচি গুঞ্জা ফলের মালা গাঁথে, গলায় পরে। মা বলেছে, ঘর করতে যাবার কালে বুঁচিকে রুপোর মটরদানা আর লাল পুঁতির মালা দেবে। তারপর মানিকের মুখ দেখে বলেছিল, কী হল্য?

এমন চোখ মুদে কী ভাবিস?

মানিক মাথা নেড়েছিল্ল। সগ্যে ঘুরে এসেছে ও, সে কথা কি বলা যায়?

'আর, মা যখন সন্ধ্যেবেলা মশালে আঠা জড়াচ্ছে, তখন মানিক বলেছিল, বাবা না কি সগ্যে গেছে, সগ্য কেমুন গ' মা?

- সগ্য? কুন্‌-অদুখ্য নাই। সব্যদা সুবাতাস বয়। সগ্যবাসীরা দুধের নদীতে ছান করো্যে আর সনার থালে পরমান্ন খায়। তা বাদে পালঙ্কে ঘুম যায়।

- দেখতে কেমন?

- গাছে গাছে ফল, নদীতে নদীতে জল, পাখি ডাকে, ফুল ফুট্যে, সোন্দর জাগা!

-হ্যাঁ মা! সোন্দর, খুব সোন্দর!

মানিক তো সগ্য দেখেই এসেছিল।

তিন

বাগানটা যে কার, কেন কেউ ওদিকে যায় না, মানিক কাউকে জিগ্যেস করেনি। বড় দাদারাও কানাইয়ের বিলের ওদিকটায় যায় না। ওদিক দিয়ে নাকি মুর্শিদাবাদ যাবার পথ। মাঝে মাঝে ঘোড়ার পিঠে নবাবের ডাক যায়। ওদিকে, ও পথে একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে হাঁটলে মুর্শিদাবাদ পৌঁছনো যায়।

ঘোনাপাড়া গ্রামের লোকদের মধ্যে একা গঙ্গারাম কাকা দেখে এসেছে মুর্শিদাবাদ, সেও অনেক কাল আগে।

গঙ্গারাম কাকাই এল মায়ের কাছে! না, ঘোনাকর্তা নেই। গাঁয়ের মাথা বলে একটা মানুষ দরকার।

- কেনে ঠাকুরপো?

- একো, দুকোর মতো ছেলারা তো লড়াই করতে চায়, নবাবের ফোজে যেতে চায়, ই কাজ করা, কি না করা?

নিশ্বাস ফেলে মা বলল, লেঠালের বিটি আমি। উয়াদের বাপও ছিল শূরবীর। তা ছেলাদের মনও ঘরে নাই। কিন্তুক আখুন তো সে দিন নাই, যে উয়াদের কথা বলব্যে কুন-অ মুরুব্বি। লিয়ে যাবে উদের, বল্য?

- উপায় বল্য একটো?

- আখুন চত্তিরে রুদ্দ ঠাকুরের মেলা, আষাঢ়ে মনসা মেলা, বছরে চারটা কালীমেলার ধুম! আগে এত ছিল নাই। আখুন বোশেখী কালী, আশ্বিনা কালী, পোষ কালী বাপ রে রায় দেশে আর ঢাক-ঢোল থামে না।

- বর্গীর হাংগামাও নাই, বুড়া নবাব নাই, লাতিটো তো বয়সে গিঁদা আখুনো। উদিকে কিছু লোকের অ্যানেক টাকা, তারাও মেলা ডাক্যে। আবার চিন্তাভয় দূরে গিছে, গঞ্জে গঞ্জে মানুষ আনন্দ কর্যে।

- মেলাগুলানেই যাক কেনে? লাঠি খেলাক, বর্শা খেলাক, তীর চালক, উপাজ্যন করুক! মুরব্বি জুটে, তো ল্যিয়ে যাবে ফোজে। না জুটে তো লেঠাল—পাইক তো হতে পারব্যে।

- সেই ভাল!

- তাই বল্য! লয় তো ছেলোগুলান্ ডাকাত হয়্যে যাব্যে। আমার ছেলাদের...তুমিই ল্যিয়ে যাব্যে...বাপ নাই তো কাকা আছে।

- নয় তাই হল্য। মানিক কী কর্যে দেখ!

- কী করল্য মানিক?

-ওঠা বনেবাদাড়ে ফির্যে বুল্যে।

- করুক! উর যা মন ল্যায় করুক! একটো ছেলা কাছে থাকুক আমার!

- বউঠান! পাঁচটো বেটা তুমার!

- দুলে-বাগ্‌দীর বেটা, হাতে লাঠি টেঁটা, ঘর্যে থাকব্যে কুন্‌অটা? উয়াদের বাপ থাকত্য?

- না তুমার মতন, না পবন দাদার মতন...মা ঈষৎ হাসল। বলল, উ নিজের মতন!

গঙ্গারাম কাকা চলে গেলে মা গালে হাত দিয়ে বসে থাকল।

অনেক, অনেক দিনের কথা! ঝিমঝিমে দুপুরে বাঁশগাছের পাতা সরসর, কাঠবেড়ালীর ছুটোছুটি। বুঁচি মাটির হাঁড়িকুড়ি নিয়ে খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর ঠাগ্‌মাও ঘুমচ্ছে। মানিকের মা গালে দোক্তাপাতা আর চুনের টিপি গুঁজে চুল শুকতে বসে আনমনা হয়ে গেল।

কাকে বলবে, কে মনে রেখেছে, পবন বলত, এ ছেলাটো সন্নেসী হয়্যে যাবে একোর মা!

স-ব লক্ষণ তেমুন!

মানিকের মা কি সে কথা ভুলেছে না ভুলতে পারে? একটু বড় হবার পর থেকে রোগা পা টেনে টেনে মানিক বনেবাদাড়ে ঘোরে। আগে ঘুরত ষষ্ঠীতলা অবধি, এখন দূরে দূরে যায়। হয়ত একদিন এত দূরে চলে যাবে যে আর ঘরে ফিরবে না। ও যা ছেলে! বনের ফল, বিলের পানফল, এটা সেটা খেয়ে কাটিয়ে দেবে। এই যে ঘোরে, বাঘ, সাপ, ডাকাত, ভূতপ্রেত, কিচ্ছু ভয় করে না ওর। তাই তো মানিকের মা ছেলেকে দিব্যি দিয়ে রেখেছে, যেখানে খুশি যা। কিন্তু সাঁঝে ঘরে ফিরবি। এখন তো সাত সকালেই পান্তা খাইয়ে দেয় মানিকের মা। আবার ঘরে এলে খেতে দেয়। ছিপ ফেলে মাছ ধরে, শাকসুলপো, মানকচু, বুনো খুঁধুল আনে। সময়ে মাছ কুটেবেছেও দেয়। বুঁচির সঙ্গে ছাগল-হাঁস-ঘরে তোলে। খুরপি নিড়েন নিয়ে উঠোন, ঘরের আশপাশ পরিষ্কার করে। স-ব করে, কিন্তু ওর মন পড়ে থাকে বাইরে।

দুপুর তাতে কৃষ্ণতুলসীর মৃদু গন্ধ ছড়ায়। এত এত কৃষ্ণতুলসী এনে ঘর ঘেরে

বসিয়েছে মানিক। বেদেনীরা বলে কৃষ্ণতুলসীর গাছ, ঈশেরমূল গাছ বসাও। সাপ আসবে না। সত্যিই বড় গোখরোটাকে আর দেখে না মানিকের মা। এসব দিকে মন আছে ওর। সে তো থাকেই কতজনের। আবার তারা সন্নেসীও হয়ে যায়।

ভাবতে ভাবতে চোখ বুজে আসে মানিকের মার। কড়ে আঙুলের মতো ছোট্ট মেয়ে বউ হয়ে এসেছিল, শাশুড়ির কোলে ঘুমত। একটু বড় হতে মাথায় চাপল সংসার। এখনও চেপে আছে। কবে বউরা আসবে, তাদের কাজকর্ম শিখিয়ে দিয়ে ছুটি নেবে মানিকের মা?

এমন দুপুর পাতা, ঝরাতে, আনচান বাতাসে, পাখির ডাকে, বনসোঁদালীর তীব্র গন্ধে, কোথাও গরুর গাড়ির চাকার ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দে মৌতাতী দুপুর। এই ভরা দুপুরের মৌতাতে মানিক তার সগ্যের বাগানে চলে গিয়েছিল।

নালার গর্ত বেয়ে ভেতরে ঢুকে মানিক দৌড়েছিল পুকুরপাড়ে। জলে হাতমুখ ধুয়ে নেবে, গাছের ছায়ায় বসবে, লজ্জাবতী ফুলের পাতায় আঙুল ছোঁয়াবে আর পাতাগুলো মুড়ে যাবে, হঠাৎ মনে হয়েছিল কে যেন তাকে দেখছে।

- কে, কে তুমি?

চমকে উঠেছিল মানিক।

- এস, এদিকে এস।

কী সুন্দর মানুষ, কেমন পোশাক-আশাক, গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মানিক পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়েছিল। তারপর বলেছিল,

- তুমি কে?

- তুমি, কে, তাই বল্য?

- আমি বড়, আগে জিগ্যেস করেছি।

মানিকের একটুও ভয় করেনি। এটা তো সগ্যের বাগান! এখানে সব আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে পারে।

- আমি মানিক দুলে।

- এখানে কেন?

- এটা তো আমার বাগান।

-তাই বুঝি?

-নিশ্চয়। এটা আমার সগ্যের বাগান!

- স্বর্গ! বেহস্ত! তা তুমি এখানে কী কর?

- গাছ দেখি, ফুল দেখি, জলের সঙ্গে কথা বল্যি। পাখিরা আমার কাছে আস্যে।

- ফল ছেঁড় না?

- না না না। তুমিও ছিঁড় না। এ বাগানের ফল কি ছিঁড়তে আছে?

- তা বটে, তা বটে!

- তোমার ঘর কুথা?

- ঘর?...সে, সে অনেক দূরে। তোমার ঘর?

- হো-ই ঘোনাপাড়া। দক্ষিণে...দূরে...অনেক দূরে।

- এত দূরে এসেছ?

- ঘাসে বস্য না খানিক? আমার পা কনকন কর‍্যে।

- বোস, বোস।

- দুজনেই দেখছিল দুজনকে।

-কী, আমাকে দেখে ভয় করছে?

মানিক একটু হেসে বলল, ভয় করব্যে কেনে? তুমার চখ কত সুন্দর!

- তুমি খুব ভাল।

- কিন্তু তোমার বাগানে এসে পড়লাম যে?

- বুঝলাম। ই টো তুমার বাগান?

- তুমিই তো বললে সগ্যের বাগান। আমি মাঝে মাঝে আসি। তাতে তোমার আপত্তি নেই তো?

- তা কেন থাকব্যে? আস কেনে?

- একলা বসে থাকি...ভাল লাগে।

- বন্ধু নাই তুমার?

- না...বন্ধু তো নেই...একজন বন্ধুও নেই।

- আমারও নাই। তুমি আমার বন্ধু হবে?

হেসে উঠেছিল মানুষটা। নিজেকেই যেন বলেছিল, আশ্চর্য! আশ্চর্য! আমার ভাল লাগছে।

তারপর মানিককে বলেছিল, হব তোমার বন্ধু।

-তুমার নাম?

-কেন বন্ধু? দুজনে দুজনের বন্ধু, কেমন? দুজনে দুজনকে বলব 'বন্ধু'?

-হ্যাঁ...বন্ধু ...আমার এই পায়ে তো জোর নাই..খেলতে নেয় না কেউ...

কান পেতে কী শুনছিল বন্ধু। ভুরু কুঁচকে, মন দিয়ে।

- কী শুন্য?

-কে চেঁচাল, না?

-ধুর! উ তো কুড়াল পাখি। বিলের ধারে উড়াল দিয়ে মাছ ধর‍্যে। কাশঝোপে

বাসা। গভীর মমতায় মানিক বলল, মা পাখিটাক সেদিন বাজে তাড়া করল্য। ধরতে পারে নাই। বলি, কেনে বা তুমি বাসা ছেড়্যে দূরে যাও?

- পাখিটা কী বলল?

- বলল, আর যাব নাই।

- তুমি ওদের কথা বুঝতে পার?

মানিক ঘাড় হেলাল। বন্ধু ওর মাথার চুলে হাত রাখল। বলল, ঠিক এখন আমার দরকার ছিল তোমার মতো একজন বন্ধু। যে পাখির কথা বোঝে। আর স্বর্গের বাগানে বসে থাকতে ভালবাসে। আচ্ছা! আমি চলি, আজকে, কেমন?

- আমিও ঘর যাব। তুমি কি ঢুকলে ই নালাপথে?

- না না, দেখছ না আমি কত বড়সড়? আর তুমিই বা এ পথে ঢুকবে কেন? চল। অন্য পথ দেখাই।

বাগানটা এত বড় যে এদিক থেকে ওদিক অনেকটা পথ।

যেতে যেতে বন্ধু মানিককে আমগাছ চেনাচ্ছিল।

- এই গাছটা জানো তো?

-আম গাছ!

- এ গাছের আম খুব মিষ্টি। এ আমের নাম কোহিতুর।

- কো-হি-তু-র!

-পাঁচশ রকম আমের পাঁচশ গাছ আছে এখানে।

- ও বাবা!

- কতরকম আম! সাদৌলা, কোহিতুর...আর, আর কী কী... হেসে ফেলল বন্ধু। বলল, আমি জানি না।

- কেনে? তুমি তো বড়!

- কিছু না জেনে বড় হয়ে গেছি। স-ব অন্যরা জানে। স-ব সময়ে। এস!

এদিকে মস্ত কাঠের ফটক।

মানিকের বন্ধু টোকা দিল।

ফটক খুলে গেল।

মানিকের বন্ধু বলল, চলি?

- আবার কবে আসবে গ?

সেই তো বলা মুশকিল বন্ধু। আবার এসে যাব। কী যেন জায়গায় থাক?

- ঘোনাপাড়া।

- দেখি, মনে থাকে কি না। আর শোনো। আমার কথা কাউকে বলবে না, কেমন?

- না, না, তাই বলি? বাগানের কথাও তো বলি নাই। কেউ জানব্যে নাই।

- পাখিদের কানে কানে বলতে পার।

গেট বন্ধ হয়ে গেল। মানিক পেছন ফিরল, দু'কানে আঙুল দিয়ে দৌড় লাগাল।

বাড়ির ফেরার পথে মানিক যেন হাওয়ায় ভেসে ভেসে চলল। একটুও অবাক লাগল না ওর। ও তো মানিক! সবাইয়ের মতো তো নয়। কারও সঙ্গে ওর মেলেই না। সেবার পেঁচোদাদা তো শজারুটা মেরেই ফেলত। মানিক হাত চেপে ধরেনি?

- মের্যে না, মের্যে না ছোটদাদা, উ-টো মাদী...পেটে বাচ্চা আছে।

- তোকে বলেছে!

- আমি উয়ার ঘর জানি যে!

- ঘর জানিস?

- হ্যাঁ গ! উই বুড়া তেঁতুল গাছটার পিছনে থাকে, চোখে চোখ পড়ল্যে গায়ের কাঁটা খাড়া! উকী কর্যেছে, যি মারব্যে?

- মাংস কত ভাল। জানিস?

ছোটদাদা নামিয়ে রেখেছিল ধনুক। মাকে বলেছিল, মানিক কি পাগল?

মা নিশ্বাস ফেলে বলেছিল, খড়ারুটা মারবি বা কেনে?

কতটুক মাংস, বল্?

মা মানিককে বলেছিল, পাখপাখালির কথা বুঝিস মানিক?

- বুঝি।

ঠাগ্মা মাথা নেড়েছিল বারবার। এমন ছেলে তো তাদের ঘরে জন্মাবার কথা নয়। কেমন করে জন্মাল?

ঘোনাকর্তা বলত, পাখির ছানা! বড় হল্যে উড়ে যাবে। যতদিন থাক্যে, সযতনে রাখ্য।

মানিক তো সকলের মতো নয়। কোনদিন নয়। সে শুনতে পায় লক্ষ্মীপেচাঁরা অর্জুন গাছের মাথায় বাসার মধ্যে বসে কী ঝগড়া করে। মাছরাঙা কেমন বুড়ো আকন্দ ডালে বসে মাঝে মাঝে বলে, অ জল! মাছ দে!

ও তো গাছপালার কথাও শোনে। গাছে গাছে কি কম কথা হয়? মানিক সব বুঝতে পারে। বুঁচিকে ও যে মাটির পুতুল গড়ে দিয়েছিল বর আর বউ, তাদের মনে কম দুঃখ ছিল? মানিক ওদের খোকাখুকি গড়ে দিল। তখন পুতুলদের কী দুঃখ, খোকাখুকি দুধ খাবে কোথা থেকে? সে জন্যেই একটা দুধেলা গাই গড়ে দিয়েছে মানিক, বুঁচি বলে ও ছোটদাদা, এটা ছাগল বটে।

আর কেউ দেখবে না। মানিক দেখবে সগ্যের বাগান এটাই তো স্বাভাবিক। পেয়ে যাবে একটা অবাক করা বন্ধু, সেও স্বাভাবিক। মানিক কোনও কথাই

কাউকে বলতে যায় না, এসব এথাও বলবে না। কিন্তু বাড়ি ফেরার সময়ে ওর বুক আনন্দে ভরে উঠছিল, আর পা যেন জোরে জোরে চলছিল।

মানিক যখন বাড়ি ফিরল, তখন বেলা গড়িয়ে মা খেতে বসেছে। মাথার ভিজে চুল চুড়ো করে বাঁধা। হেঁসেলের দাওয়ায় বসেছে পা ছড়িয়ে। কাঁসার উঁচু থালায় ভাত, উচ্ছে বেগুন ভাতে আর বোয়াল মাছের ঝুরি। তেল তেল, লাল লাল, সবুজ কাঁচালঙ্কা টিপে খেতে কী ভাল, কী ভাল! মানিক পুকুরে ঝুপঝাপ ডুব দিয়ে মা'র সঙ্গেই খেতে বসে গেল।

তখন ঝিমঝিমে দুপুর। ঠাগ্‌মা তকলি ঘুরিয়ে সুতো কাটছে। বুঁচি হাঁসদের জল-ভাত দিয়েছে ডাবায়, হাঁসেরা খাচ্ছে, বুঁচি দেখছে। দূরে দূরে, কাছে কাছে, ডিম ডিম বাজনা শোনা যায়। চড়ক পুজো আসছে, কালা রুদ্দুর পুজো হবে, মেলা হবে।

- চড়ক পুজা চৈতি সাঁকান্তিতে, মা?

- হ্যাঁ মানিক।

- বোশেখে কী?

- নে, আমাদের আবার চোত-বোশেখ!

চার

গঙ্গারাম কাকা পাতুলের কবিরাজ সেনমশায়ের বাড়ি গিয়েছিল বলে কত কথা যে জানা গেল। তা ঘোন্যাপাড়াতে কেউ জানত না।

পাতুল এখন জাঁকজমক গ্রাম। বামুনপাড়া, কায়েতপাড়া, বৈদ্যপাড়া, গোয়ালপাড়া, এমন এগারটা পাড়া আছে এখানে। বুনোরা ঘর তুলে চলে গেছে। এত লোকজন, হাটবাজার, গরুবাছুর। এত বেচালে তারা থাকতে পারে না। তারা চলে গেছে অনেক দূরে। ভাপতার বিল, বা চোপকামিনীর বিলের কাছে। বনজঙ্গল আছে, শিকার কর, জঙ্গলের কাঠ বেচ, বিলের মাছ ধর, আর ভাপতা জঙ্গল থেকে কবিরাজী ওষুধের গাছপালা শেকড়বাকল, লতাপাতা জোগাড় করে বৈদ্যপাড়ায় বেচে এস।

ধানচালের বদলেই এসব বেচা হয়। বুনোরা টাকাকড়ি তেমন বোঝে না। সারাদিন খাটে-খোটে, সন্ধ্যা হলে মাদল বাজায়, গান গায়।

সেনমশাই তো সে কথাই বলেছিলেন গঙ্গারামকে। -বুনোরা গেল, এখন আমায় গাছগাছড়া কে এনে দেয় বল? ঘনশ্যাম জানত কখন কী লাগে, সব পাঠিয়ে দিত। সেও নেই। আমি কি খোঁড়া পা নিয়ে লাঠি ঠকঠকিয়ে বনেবাদাড়ে ঘুরব?

গঙ্গারাম ভদ্দরলোকদের পাড়ায় এলে অন্যরকম করে কথা বলে। সে বলল, তা কেন মশায়? ঘোনাকাকা তো পবনদাদার বেটা মানিককে সব চিনাত। সে জানবে।

- এই দেখ! সে জানবে কোন গাছটা কী?

- সি ছেলা গাছের সঙ্গে কথা কয়।

- তবে সে পারবে। নিয়ে আয় একদিন।

- তার মা যদি ছাড়ে।

- পুণ্যাটা কেটে যাক, তা বাদে আনিস। এ বছরও পুণ্যা হবে?

- হবে না কি আর? বুড়ো নবাবের সময়ে যেমন জাঁকজমকে হত, তেমন না হলেও সিরাজ নতুন নবাব। পুণ্যা তো করতেই হবে।

চৈত্র সংক্রান্তি থেকে সাতই বৈশাখ পুণ্যাহ উৎসবের সময়। আলিবর্দির সময়ে তো বড় জাঁকজমক হত। নবাব বসতেন খোলা দরবারে। খাজনা সংগ্রহকারী আমলাদার, জমিদার, বণিক, সবাই এসে নবাবের সামনে নামিয়ে রাখতেন খাজনার টাকা এবং নজরানা। নবাবও একে তাকে বকশিশ করতেন। খাওয়া-দাওয়া চলত।

পুণ্যাহ অন্যান্য মহলদার, মৌজামালিক এঁদের ঘরেও হত। সে সময়ে মৌজা থেকে চাল, দুধ, রান্নার কাঠ, এসব তোলা হত। কবিরাজমশাইয়ের কাছে ওষুধ নিতে মুর্শিদাবাদের লোকজনও আসে। ওঁর কাছেই খবর পেল গঙ্গারাম, আর দৌড়ে দৌড়ে গ্রামে ফিরল।

একো বলল, কী দেখল্যো! বাঘ দেখেছ্য?

- বাঘ নয় রে, টাগ।

- সি টো আবার কী?

- নবাব তো এখুন সিরাজ - সে পুণ্যা করবে। তা পাতুল থেকে ঘোনাপাড়া সব মৌজার মহলদার জগৎ দত্ত।

ঢোলসোহর শুনিসনি? আসব্যে আসব্যে। যাতির রান্না হবে দত্ত বাড়ি। কাঠ দাও। খাটবার মানুষ দাও। শাক-কুমড়ো, বেগুন, ঝিঙা, পটল দাও। কাঁচা আম দাও। সব দিল্যে আমরা বেচব কী খাব কী?

- না দিল্যে?

-বিষনজরে পড়ব্যে। লেঠেল বর্শেলের গাঁ। আমরা কি চাষীবাসী?

এবার মা বলল, চাষীবাসী হতে হবে গো ঠাকুরপো। কত্‌কাল আর এমন চলব্যে?

- যখন হতে হব্যে, হব্য।

- চাষেবাসে শান্তি কত!

- খুব শান্তি! বর্গীরা কি শান্তি দিয়ে গেল্য।

- লয় ষষ্টিতলায় ডাক সকলকে। গাঁয়ের মাথা বলতে তুমি।

দত্তকে বল্য, কাঠ দিতে পারব, শাক আনাজ যেমন করি, তেমন খাই। করি বা কই? বন আছে, না মা আছে। বনধুধুল, তিত্‌পটল, কচু-ঘেঁচু-কান্দা-মূল, যা পাই খাই। মেটে আলু থাকতে শাক থাকতে...

- দেব না বললে মানব্যে সে?

- বছরে একবার পুজোর কালে পাঁচসিকা দিই। একটা পাঁঠা, আর দিতে পারি?

- দত্ত যে আমাদের্য শেখওমরা ধর‍্যেছ বৌঠান। হাঁ কুড়ি কি! না তোদের ছেলারা কালীনাচ, রুদ্দুনাচ নেচে অনেক আনছে।

- হ্যাঁ! চাল-গামছা-নারকেল-বড়জোর একটা ধুতি!

- সবে নবাব হল্য। সিরাজ যদি পুণ্যা না করত দত্তের চিড়বিড়ানি বাড়ত? ওঃ! নবাব করবে তো মোরাও করব্য। নিয়ম!

- জানি, নিয়ম তাদের! কিন্তুক শান্তিকালে নিয়ম খাটে, এখানে খাটে? এখনও গ্রামে কামার বসল না এক ঘর, তাঁতিপাড়া বসল না। এ কি সুখবাড়ি?

সেথা স-ব ছিল।

ঠাগ্‌মা হঠাৎ বলল, ঘোনাদাদার কথা কি মিছে হব্যে? সি বল্যে গেল মাহাদুর্দিন আসতেছে, মাহাদুর্দিন! বর্গীরা আসবে!

- যাক! পাঁচজনারে ডাকা করাও।

- তাই ডাকি। তুমি যাব্যে?

- নিশ্চয়। বাড়ির মাথা বলতে মা! তিনি কি সব পারে? আমি যাব্য, রামের পিসি যাব্যে।

- পানচাঁদ মুনসি তো খাতা বগলে ঘুরতেছে। এ গাঁ এই দেব্যে, উ গাঁ দেব্যে।

একো দুকো আর তেনা এ-ওর দিকে চাইল। পেঁচো আকাশপানে চেয়ে বলল, বাড়ি রামহাট, একটা মরকুটে ঘোড়া চেপে তাগদায় বেরায়। পাশে দৌড়ায় বেঙা, সাদা খাতা উয়ার মাথে ধর‍্যে।

একো বলল, যি হাটে যাবে। একটা রুপোর সিকি লিব্যেই লিব্যে।

ওদের মা বলল, কড়ি থাকতে রুপোর টাকা-দুয়ানি, বাপ্ রে বাপ! আমরা জানি কড়ির সওদা!

- দিন কি দাঁড়িয়ে থাক্যে বৌঠান? জগৎ শেঠের টাঁকশাল! টাকা-সিকা-দু'আনি!

- লাও, পুণ্যার হুড়া সামলাও!

পুণ্যার ঢোলসোহরই বাজছিল। দূরে, অনেক দূরে। মানিক উপুড় হয়ে ঘাসে মুখ ডুবিয়ে শুনছিল। আজ কতদিন বন্ধু আসে না; কতদিন কথা হয় না। বন্ধু

যে কোথায় কোথায় চলে যায় থেকে থেকে! যেন বাতাসে মিলিয়ে যায়, আবার হঠাৎ চলে আসে। স্থির হয়ে শুয়ে আছে মানিক , খুব বুঝতে পারছে গায়ের কাছে বসে একটা কাঠবিড়ালি কুটুর কুটুর মুড়ি খাচ্ছে। কাঠবেড়ালির গায়ে নাকি রামচন্দ্রের পাঁচ আঙুলের দাগ। সাগরে সেতু বাঁধার সময়...

- ব্যাপারটা কী? ঝনঝন করে গেট খুলল। আমি চলে এলাম। তুমি শুনতেই পেলে না?

মানিক উঠে পড়ল। তারপর বন্ধুর হাত ধরল।

- কতদিন পরে বল্য ত?

বন্ধুও ঘাসের ওপরেই শুয়ে পড়ল।

- হ্যাঁ, অনেক দিন পরে।

-কোথায় চল্যে যাও?

- আমি কি সাধ করে যাই? আমাকে যে শুধু ছুট করায়...এ দেশে..ও দেশে..' বড্ড ক্লান্ত লাগে আজকাল...

- কারা ছুট করায়?

- নাম বলে কী হবে?

- আমার দাদারা সবাই তীর ছুঁড়তে ওস্তাদ। তারা গিয়ে ওদের জব্দ কর‍্যে দেবে?

- তাই নাকি?

- নিশ্চয়। তীর দিয়্যে হাত পা মাটির সঙ্গে গিঁথে রেখ্যে দিব্যে।

- একটু ধীরে ধীরে বন্ধু, কী বললে?

- মাটির সঙ্গে এই এমুনি করে গিঁথে রেখ্যে দিব্যে। বাস্! আর লড়তে পারব্যে না।

বন্ধুর চোখ হেসে উঠল। মাথার টুপিটা খুলে ঘাড় অব্দি লম্বা সুন্দর চুলে হাত বুলোল বন্ধু।

- তীরের এত ক্ষমতা? বন্দুকের চেয়ে বেশি?

- বন্দুক আমি দেখি নাই।

- বল কী?

- ঘোনাদাদু বল্যে গিছে, তীবের ক্ষ্যামতা অ্যানেক। কেন বল্য দেখি?

বন্ধু আকাশের দিকে চেয়ে বলল, আমি তো জানি না। তুমি বল, আমি শুনি।

মানিক হাত নেড়ে বোঝাল। তীরের ফলা এমন, যে গেঁথে গেলে টেনে তুললে কী সর্বনাশ! পেটে বা বুকে বিঁধল তো টেনে তুললে ভেতরের সব ছিঁড়ে খুঁড়ে বেরিয়ে আসবে।

- বাঃ! তবে বের করবে কী করে?

- আস্তে, ঠেলে ঠেলে।

- আর আমি জানতাম, বন্দুক আর তলোয়ার হচ্ছে মরদের হাতিয়ার! ইস্! বড্ড ভুল হয়ে গেছে তো?

মানিক বলল, আমার বাবা আঁধারে শব্দ শুন্যে তীর চালাত আর মানুষ মর‍্যে যেত।

- আমার কী হবে বন্ধু? আমি তো তীর চালাতে শিখিনি। শুধু বন্দুক আর তরোয়াল...

- তুমি চালাতে পার‍্য?

বন্ধু হাত দুটো মানিকের দু'গালে বোলাল। বলল, নরম, না শক্ত?

- খুব কড়া বট্যে! সি কি বন্দুক...

- হ্যাঁ বন্ধু। তোমার বাবাকে যদি পেতাম....

- বাবা তো নাই। সে-ই সুখবাড়ি...সে-ই দুল্লভ রায়....বাবা তো বর্গী লড়াইয়ে...আমি তখুন খুব ছোট বট্যে....

বন্ধু ওর চুলে আঙুল ছোঁয়াল।

- আমারও বাবা আমার ছোটবেলায়....তোমারও...দেখ, কত মিল!

- হ্যাঁ, মা আছে আমার! ঠাগ্‌মা আছে!

- আমার মা....

- আছে তো!

- আছে, আছে।

- তিনি তোমারে বন্দুক চালাত্যে দেয়?

বন্ধু একটু হাসল। ঠোঁট হাসল, চোখ হাসল না। বলল, আমাকে সব শিখিয়েছে এক সর্বনেশে বুড়ো।

- তিনি কে গো?

- ছিল একজন। সেই তো আমাকে বলত, মন খারাপ হলে তুই...থাকগে সে সব কথা! বন্দুক, লড়াই, বর্গী কিছু ভাল লাগছে না আমার। তাই তো এখানে...

- আস্যই না আখুন!

- সর্বদা আমাকে ঘিরে রাখে যে? সময় পেলে পালিয়ে আসি!

- কারা ঘির‍্যে রাখ্যে?

- সে সব জেনে তোমার দরকার নেই বন্ধু। এখন তোমাদের খবর বল।

- খাটাশ আমাদের হাঁস খেয়্যে ল্যিল! সাদা হাঁসটা গো! কাল বিকালে...

- তোমার দাদারা মারতে পারল না?

- তারা ঘর‍্যে নাই। কালীনাচ নাচ্যে, চাল- নারকেল আন্যে। কিন্তুক...

- কী হল? তোমার মনেও দুঃখ?

মানিক ভাসা ভাসা চোখ কুঁচকে বলল, জগৎ দত্তকে চিন?

- আমি কাউকে চিনি না।

- সি মাহালদার বট্যে!

- জগৎ দত্ত...মহলদার...কি করেছে?

- ঢোলসোহর দিছে! আমরা ডর‍্যে গেলম।

- কেন?

- কুথায় নবাব...কি জানি নাম..সিরাজ..পুণ্যা করব্যে... পুণ্যা বুঝ?

- পুণ্যা...পুণ্যা...তারপর?

- আমরাদের সকল গাঁ-কে কাঠ-কুমড়া-চাল কত কী দিত্যে হবে! আমরা কুথা পাব বল্য? আমরা কি..চাষীবাসী, না বড় মানুষ, না ধানের হামার আছে...

মানিকের গলাটা ক্ষীণ হয়ে গেল।

বন্ধু চোখ বুজে রইল।

- হামার কী... বন্ধু?

-ধান রাখ্যে? কেউ বল্যে গোলা, আমরা বলিয্য হামার!

বন্ধু পকেটে হাত ঢোকাল, বের করল।

- নাও, খাও।

- ই কী বট্যে?

- আখরোট, খোবানি, মেওয়া...

- কী সোন্দর বাস!

- খেতে আরও ভাল।

- তুমিও খাও?

- আর না। সারাদিন তো ওই খাচ্ছি আর...

- বাড়ি যেয়্যে ভাত খাও নাই?

- বাড়ি...বাড়ি...

- মা বস্যে থাকব্যে না?

বন্ধু হাসল না। বলল, তোমাকে বন্ধু না পেলে কত দরকারি কথা যে জানা হত না। না জেনেই..কিচ্ছু জানতাম না জানো? এই বাগানটা তো ছিলই...

- অনেক দিন আগে?

- নইলে এত বড় বড় গাছ হয়?

- তা বট্যে।

- এখানে এসেছি, গেছিং। সে তো আমোদ করতে আসতাম..

- কব্যে গো?

- অনে-ক আগে! তখন তুমি হওইনি! তখন...এসেছি...কিন্তু মাঝে মাঝে..পালিয়ে এলে যে কত শান্তি লাগে...তা জানতাম না...এখন বুঝি ..খুব বুঝি...আমাকে একজন ফকির বলেছিল কী জানো? ....সে অনেকদিন আগে...আমি, তাঁবুতে বসে আছি... সে আছে গাছতলায়...কাটোয়া গেছ তুমি?

- নামই শুনি নাই।

- মেদিনীপুর? পাটনা? বর্ধমান?

মানিক মাথা নাড়ল, বন্ধু চোখে হাত চাপা দিল।

- কী হল্য?

- কিচ্ছু না। সে একটা...হাসির কথা...বর্ষাকাল... অন্ধকার..ফকির আমাকে পৌঁছে দিল তাঁবুতে....

- তাঁবু কেমন হয়্য গো?

- এই...সে আমি বলব একদিন...শোনো না...ফকিরকে বললাম, এই! তাঁবুর মধ্যে এস না! গাছতলায় বসে আছ? আমার যে কী বিচ্ছিরি লাগছিল...আমি তো...খুব খারাপ লোক...গরিব গরিব চেহারার লোক চেটাং চেটাং কথা বললে রেগে যেতাম তো! খুব খুব খারাপ লোক আমি!

- অমুন কথা বল্যে না।

- বলে না? বেশ, তার কথাটাই শোনো তবে। লোকটা খুব হেসে বলল, আমি তো ভালই আছি গো! খোদাতাল্লা এমন ঘর দিয়েছে...ওপরে আকাশ...এমন গাছের আড়াল...আমি খুব ভাল আছি। বলেছিল, শান্তিতে আছি...খুব শান্তি। খুব...

- তোমার দুঃখ হচ্ছে?

- না...দুঃখ তো আমি জানিই না...কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এই বাগানে এলে কেমন শান্তি পাই...এই যে তোমায় বন্ধু পেয়ে গেলাম...আমি...আমাকে তুমি খারাপ লোক মনে কর?

- কখ্খনো না। তুমি ভাল, খুব ভাল।

- এটা খোদাতাল্লার ঘরই বটে! কোন ভয় নেই, একটুও না...

- ভয় ,থাকবে কেন? আমি তো বনেজঙ্গলে ঘুরি...বিলের ধারে আসি...আমার কখ্খোন ভয় করে না।

- আর বাড়ি গিয়ে মা'র কাছে বসে খাও!

- খাই!

- তারপর?

- বোনের সঙ্গে খেলা করি্য, কথা বলি্য, ঘুমাই...

- তোমার কতজন আছে! ঠাকুমা, মা, দাদারা, বোন! তুমি খুব ভাল আছ বন্ধু, এমনই ভাল থাক।

-ইস্! পা খুঁতা, বেড়াতে পারি না দূরে...খানিক এস্যে টুকা বস্যি, টুকা জিরাই...তবে হ্যাঁ! মা মাটির ঘোড়া মানত কর‍্যেছে, আমার পা ভাল হয়্যে যাবে।

- ওই যে অনেক বেরও না, অনেক দেখ না, খুব, খুব ভাল আছ তুমি। আচ্ছা! এবার চলে যাও তুমি...আমিও যাব। বন্ধু উঠে দাঁড়াল, মানিকও।

কীরকম পোশাক! কী সুন্দর বড় বড় চোখ! যেন সত্যিকারের মানুষ নয়।

- ঘরে যাও বন্ধু।

- আবার কব্যে আসব্যে?

- দেখি! তোমার আর আমার...ঠিক দেখা হয়ে যাবে। আমার কথা কাউকে বলনি তো?

- তাই বলি?

মানিক যখন বেরিয়ে এল তখনও বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে।

মানিক চেঁচিয়ে বলল, তুমি কুথা থাক্য গো?

বন্ধু আঙুল তুলে ওপর পানে দেখাল। বলল, আকাশ থেকে উড়ে আসি।

-পাখির মতো?

- তুমি যাও!

- আবার আসব্যে...

ঘরে ফিরতে ফিরতে আজ মানিক সাঁজা ফুল পেয়ে গেল। অনেক, অনেক ফুল তুলে নিল। মা সাঁজা ফুল চচ্চড়ি করে কচু আর চিংড়ি দিয়ে। মা খুব খুশি হবে।

আসলে যেদিন থেকে বন্ধু পেয়েছে, সেদিন থেকেই নীলকণ্ঠ পাখিটা মানিকের সঙ্গে উড়ে উড়ে চলে। নীলকণ্ঠ হল স্বর্গের পাখি। নীলকণ্ঠের সঙ্গে চললে ভয়ভীত থাকে না। স-ব বন্ধুর জন্যে হচ্ছে না তো?

মানিক মনে মনে বলল, হেই নীলকণ্ঠ! আমার বন্ধুরে সুভালাভালি রেখ্য গো! তার মুখ হাসে তো চক্ষু হাসে না। মা। ভাত লয়্যে বস্যে থাকে না, বড় দুঃখ তার!

সাঁজা ফুল দেখে মা হেসে ফেলল।

-কুথা পেলি্য?

-মা ষষ্ঠী দিল্য।

-মানিক! কেমন কথা বলি্যস?

- তুই তো বলি্যস, ঠাকুর না দিল্যে কেও কিছু পায় না! ঠাগ্‌মা বলল, কেমুন কর‍্যে জানলি, মা সাঁজা ফুল, সাঁজা ফুল কত্তেছে?

-আমি স...ব জানতে পারি।

মানিকের মা গালে আঙুল রেখে চেয়ে রইল। কী হয়েছে মানিকের? বুনো ও,

বনবাদাড়ে ঘোরে তো চিরকাল। এখন যেন সদাই ও জ্বলজ্বল করে চাপা আনন্দে। যেন ওর ভেতরে আলো জ্বেলে দিয়েছে কে। মা মনে মনে বলল, মানিক বল্যে বড় টান গো ঠাকুর! ওরে ভাল রেখ্য। পা-খুঁতা ছেলা আমার!

পাঁচ

কত কী যে আশ্চর্য জিনিস ঘটল বাংলা ১১৬৪ সনের বৈশাখে, তা ভারতে পারবে না।

এক সকাল বেলা দৌড়ে দৌড়ে এল গঙ্গারাম কাকা। বলল ব্বাপো রে ব্বাপো! এমুন কাণ্ড জন্মে দেখি নাই, শুনি নাই।

- কী হল্য? ও ঠাকুরপো!

- তোমার বেটারা বলুক!

- বাব্বা! ঢোলডগর বাজে কেনী?

ঢোলডগর বাজাতে বাজাতে একোদের সঙ্গে বিশজন ছেলে ঢুকে পড়ল।

ঢোলে চাঁটি মেরে ঘুরে ঘুরে দুলে দুলে গদন কাওরা গেয়ে উঠল,

আশ্চাজ্জ কথন হে-এ-এ-এ আশ্চাজ্জ কথন!

নবাবি হুকুমতে হে-এ-এ

পুণ্যার লতুন কথন....

মা লাঠি তুলে তেড়ে গেল।

- গলায় সুর বুলে না ছোঁড়ার, গান করে! বল্, কী! বলতেছিস?

গদনকে থামায় কে! সে কাঁঠাল গাছ তরতরিয়ে বেয়ে উঠে গেল। ডালে দাঁড়িয়ে এক হাতে আরেকটা ডাল জড়িয়ে অন্য হাতে লাল গামছা নেড়ে বলল, নবাবের হুকুমত! জগৎ দত্তের নাকে খত! হাঁ গো বজ্যঠী! বড় মুনশি জগৎ দত্তরে খুব হজিমত দিয়া করাছে। পুণ্যার লেগে তুমি পাতুল হতে ঘোনাপাড়া, ও দিগরে কুন্-অ গাঁ হতে কিছু ল্যিবে না।

ল্যিয়েছ কি মহলদারিটি কেড়্যে লিবে, হাঁ!

- বলল?

- আর বলল, টাকা লাও, গাঁ দিগররে পুণ্যাতে পাঁচ তরকারি ভোজন দাও। অ্যানেক ল্যিয়েছ হে, বর্গীর হাংগামাকালে আমার ই গিছে, সি গিছে, বুড়া নবাবরে টাকা দিছি বল্যে।

- জগতের বুক ফাট্যে যাব্যে।

- এখুনি ফাটত্যেছে। বলে, তারা অ্যানেক খায়। মুনশি বল্যেছে, অ্যানেকই খাব্যে।

- ই হল্য কেমুন কর্য়ে?

- সবে বলত্যেছে নবাব সঁপন পেয়্যেছে।

গঙ্গারাম বলল, সাহেবদের সাথ লড়াই করে আল্য, উয়ার মনে ফুত্তি আখুন। বুঝলে বউঠান?

- বুঝলাম। আখুন গাঁ ডাক ঠাকুরপো, ষষ্ঠীথানে পূজা দিক সকল্যে। একোরা ধামা ধামা চাল আর তিনটে গামছা নামিয়ে রাখল, এক গেঁজে কড়ি।

- ওজগার, মা, ওজগার!

মানিক মুখে আলো মেখে চেয়ে থাকল। নীলকণ্ঠ পাখির আশীর্বাদে সব হচ্ছে। বন্ধু, বন্ধু জানলে কত খুশি হবে?

খুব, খুব আশ্চর্য ছিল ১১৬৪ সন। আম বাগানের পর বাগানে গাছে গাছে ধরেছিল রানীপসন্দ, বেগমপসন্দ, আনারসা, চৌরসা, সাদৌলা, শত শত নামের আর জাতের আম। মানিকরা তো ওসব আম কখনও খায় না। গরমকালটা গরিবরা আমকাঁঠাল খেয়েই কাটিয়ে দেয়। মানিকদের জন্যে এখানে সেখানে গাছে গাছে মধুকুলি, জাংদার, আতাবোনা আম ফলে থাকে। এ বছর গাছে পাতা যত, আম তত। কবিরাজ মশাই মাথা নেড়ে বললেন, ভাল নয়, এ ভাল নয়। একটা কিছু হবে।

গঙ্গারাম আর মানিক এক বোঝা আকরকরা, গজপিপুল হিড়িঙ্গী, আঁতমোড়া গাছগাছড়া নিয়ে গিয়েছিল।

কবিরাজমশাই গাছগাছড়া দেখে কেন বললেন, ভাল নয়, ভাল নয়?

গঙ্গারাম ডান কানে কম শোনে, তাই চেঁচিয়ে কথা বলে। সে বলল, কি বল্য কত্তা? ই গাছগাছালি ভাল নয়?

- না রে। আমি লক্ষণ দেখি, দুর্লক্ষণ।

-কিসে?

- আরে মুর্খ! মুর্শিদাবাদে আমের নিয়ম। এ বছর সফল্য ত্যে পরের বছর অফল্য, কম ফলবে।

- তাই তো!

-তেষট্টি সনে কত আম খেয়েছিলি?

- উ বাবা! হাটে গেল্যে বেপারি বল্যে, যা পার দিও। যত পার‍্য লাও। ই মানিকের বুনটা...বুঁচি....উয়ার শ্বশুরঘরে বউঠান আম পাঠাল্য তো শাউড়ির কান্না কী! ঘরে আম, উঠানে আম, ব্যান আমই পাঠাল্য? সি হাসির কথা বেট্যে।

- তা হলে?

- কী হল কত্তা?

- তেষট্টিতেও আম, চৌষট্টিতেও? খুব খাব বলে নাচলে তো হবে না। লক্ষণটি তো দেখতে হবে। এমনটা হলে-একটা কিছু হয়।

-ধুর কত্তা! কী হব্যে? আমি তো দেখি সুদিন আল্য। লইলে পুণ্যার আদায় মুকুব হয়? জগৎ দত্তের উঠানে সাত জাতের ডাক পড়ে?

গঙ্গারাম রে! এমনটি যখনই হয়েছে, তখনই ঘোর সর্বনাশ হয়েছে।

কেমুন?

এমনটিই হয়েছিল এগারশ সাতচল্লিশ সনে। নবাবদের বল্। জগৎ শেঠদের বল্। বড় বড় আমবাগান থেকে আম বিলাতে হয়েছিল। সে সব তো মধুকুলি আম নয়! সাদৌলা কি কোহিতুর, সময়টি হলেই খেতে হবে। সে বছর গাড়ি গাড়ি আম পচ ধরে যায়. ফেলে ঢেলে দিতে হয়। সেই আঁটি হতেই যে গাছ উঠল. .এই যে আমের জঙ্গল সর্বত্তর, তা থেকেই।

- সি মন্যে নাই।

- আবার আটচল্লিশ সনে ফিরে আম হল? আর সে বছরই বর্গীরা এল।

গঙ্গারাম নিশ্বাস ফেলল। বলল, কত্তা! আবার বর্গী আসবে?

- কী করে জানব? একটা কিছু হবে।

মানিকের মনে পড়েছে। ওর চোখ বড় বড় হয়ে গেল। ও বলল, অ কাকা! মনে নাই?

- কী বলিস বাপো?

- ঘোনাদাদু মরণকালে বলে নাই?

- কী বল্যেছিল? আরে, আমি তো ছিলাম সারগাছি-মানকরা। ঘর এলাম তো শুনি বুড়া মরে গিছে।

-দাদু বল্যে গিছে, লতুন বর্গী আসব্যে।

কবিরাজমশাই বালকের কথাকে আমল দিলেন না। মাথা নেড়ে বললেন, আর কখনও আসে? সে সব চুকেবুকে গেছে। গঙ্গারাম বলল, আল্যে আসব্যে, না আল্যে না আসব্যে। উ আমরা ভাবি না। আসে তো ছেলেরা দেখব্যে। তাখুন আমরা দেখ্যেছি, লড়্যেছি। উ তো লবাবে রাজায় যুদ্ধ মাশায়।

মানিক্যের বাপ্! আহা, শূরবীর মানুষ গো! সি মরল্য, তেমন কত মরল্য, উলুখ্যাড়ের জন্ম তো মরতো না কি বল্য? আখুন বল্য, গাছগাছালির দান কি দিব্যে?

-দাঁড়া, দেখি আগে। আহা হা, এ যে খাসা আকরকরা গো! সোমরাজি গোত্তর! কিন্তু গাছ আনলে বাপ, মূলটা যে চাই?

-দিব্য। কত আনব্য?

- অনেক আছে?

- অ্যানে-ক!

- আঁতমোড়া! আহা হা, কবে থেকে খুঁজছি। এ সব গাছ তুই চিনলি কী করে?

গঙ্গারাম বলল, উ চিনব্যে নাই, উ ছেলার পা খুঁড়া...কিন্তু ছেলা সামান্য লয় কত্তা! বনের সকল গাছ উয়ার সাথ কথা কয়! আর চিনার কথা? ঘোনাকত্তা স-ব শিখায়্যে গেছে উয়াক। সি মাহাজ্ঞানী ছিল্য মাশায়! গাছপালা, আকাশ, বাতাস, জল, স-ব জানত্য! সি থাকত্যে আমারদের মাথা ছিল্য।

- কোথায় এ সব গাছ পাস?

মানিক মাথা নাড়ল। বলল, সি বলব্য নাই। যা বলব্যে দিয়্যে যাব্য।

- ভাল! ভাল! আমি গাছগাছলা পেলেই হয়। আমার সঙ্গেই শেষ! তারপরে তো ছেলে পারবে না।

নিশ্বাস ফেলে বললেন, একটা কাজের কথা আছে। জগৎ শেঠের নাম তো জানিস গঙ্গারাম!

- শুনেছি। তিনি সোনার থালে খায়, রূপার ঘটিতে জল খায়।

-না না, শ্বেতপাথরের থালে খায়। যাক গে, তার বুড়ো কাকার চোখে ছানি পড়েছে। আমি সেথা থেকে ওষুধ দিয়ে ছানি কাটাব।

- কবে?

- আষাঢ় মাসের শুক্লা চতুর্থী না হলে সাদা আংড়া, বুঝিস?

মানিক বলল, মোটা পাতা! হলুদ হলুদ ফুল হয়! পাতা দেখত্যে চক্ষুর মত!

- বাঃ! বাঃ বাঃ! তুই যদি দুলের ছেলে না হতিস.....

গঙ্গারাম শুকনো গলায় বলল, পবন দুলের ছেলা মানিক! সি জনা শূরবীর ছিল মাশায়!

- হ্যাঁ....যাক্ গে। শোন বাপ! আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষ পড়ল তো সাদা আংড়ার শিকড়ে রস জমল। তখন আমি মুর্শিদাবাদ যাব। তুই তাজা পাতা নিয়ে আমাকে পৌঁছে দিবি। এ জন্যে....চোখ বুঝে কি ভেবে বললেন, তোকে রূপোর টাকা দেব দুটো!

বেরিয়ে এসে গঙ্গারাম বলল, এখন শুধু এক সিকা! সেও ভাল।

- মা বুঁচির নথ গড়াব্যে।

- তখন তোরে দু'টাকা!

- মা বুঁচির হার গড়াব্যে।

- কত্তা নিজে তো এক গেঁজা মহর লিব্যে। সোনার মহর!

- নিক্ গা। ঘোনাদাদু বঁলত্য, যখুন বড় হব্যি, তাখুন ই গাছগাছালির গুণ শিখাব্য। সি মর‍্যে গেল্য।

- তাতে কী? হোই কাঙ্গাল পালের গাড়ি যায়। হাটে হাঁড়িকলস লয়্যে গিছল্যং। চল! উয়ার গাড়িতে উঠি। এত সামগ্যি!

শুধু সিকে নয়, পাঁচ কাঠা চাল, তিন কাঠা ডাল, একটা গামছা দিয়েছেন কবিরাজমশাই। এক ক্রোশ পথ হেঁটে এনেছে! পা টেনে চলে ছেলেটা!

- নানা সামগ্যি রে মানিক!

মানিক গাড়িতে বসে হেলান দিল। কাকা অবাক হচ্ছে কেন? মানিক তো জানেই এমনটা হবে। আজ ভোরে উঠোনে নেমেই ও নীলকণ্ঠ পাখি দেখেছে যে!

মানিক চোখ বুজল। গরুর গাড়ির চাকা কেমন কাঁদে, ক্যাঁ, কোঁ! ক্যাঁ কোঁ!

গঙ্গারাম বলল, চাকায় তেল দিস না কাঙ্গাল?

সবচেয়ে জমেছিল জগৎ দত্তের বাড়ি পুণ্যার ভোজটা। ঠাগ্‌মা যায়নি। কিন্তু মা সকলকে অবাক করে বলল, কাপড়টা ক্ষারে কেচে দিব্যি তেনো! অমুন ভারি গড়া কাপড় বুঁচি পিটাতে পারব্যে নাই।

- তুই যাব্যি, মা?

- কেনে যাব্য নাই? কাঠ লয়, কুমড়া লয়, কিছু দিত্যে হব্যে লাই। লবাবি হুকুমে মান দিয়্যে ডেক্যেছে। যাব্য নাই? মাশায়রা ডাক্যে কখুনো?

একো বলল, কেনে? বর্গীর হাংগামার কালে? মা সবসময়ে চুলগুলো চুড়ো করে শূন্যে মাথার ওপর একটা বড়সড় তালের মতো জড়িয়ে বেঁধে রাখে। এককালে নাকি মায়ের চুল ছিল মেঘের মতো কালো। মানিক যবে থেকে দেখছে, চুলে রুপোলি সুতোর মতো অনেক রেখা।

এখন মা চুল খুলে আঙুল দিয়ে জট ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, তখুন বর্গীর কাল। মাশায়রাও ধুমেধামে পূজা দেয়, বর্গীরাও দেয়। আর মাশায়রা যত দূলে, বাগ্‌দী, কাওরা ডোম, চাণ্ডিধানুকী, তিওরদের ডাকে। তারা বিনা বর্গী পড়ল্যে লাঠি তীর-বর্শা-টাঙ্গি চালাত্যে কে? বর্গী তো গেল্য। ইয়ারা বছরে চারবার কালী উঠায়, আশ্বিনে দুর্গা, দশহরায় গঙ্গাপূজা, কই আখুন তো ডাক্যে না? যাব্য, যদি দেখ্যি, হেলাচ্ছদ্দা, পাত উলটায়্যে দিয়্যে গ্রাম ডাক্যে উঠায়্যে লিয়ে চল্যে আসব। হাঁ! আমি বটি মাতং দুলের বিটি, পবন দুলের বউ!

ঠাগ্‌মা বলল, মাতুঙ্গী? যাব্যি ত ভাল্য মনে যা!

-মায়ের নাম মাতুঙ্গী?

- হ্যাঁ বাপো!

মা অমনি সামনে থেকে সরে গেল।

একোরা এ-ওর দিকে চাইল সবাই। এই দেখ! এও এক আশ্চর্য! মা তো "একোর

মা", ঠাগ্‌মার "বউ"! মায়ের নাম তো জানা যায়নি আগে? মানিক গিয়ে মায়ের আঁচল ধরল।

-মা, তোর নাম মাতুঙ্গী?

- ছাড় বাপো! লামের সাঁজান কে রাখ্যে বল? ছেলোকালে বাপ মা ডাকত্য। তা বাদে...আমিও ভুল্যে গিছি।

মা তবে ছোট ছিল? রামের ভাইয়ের বিটি চন্নুনীর মত? বুঁচির মতো? পুতুল খেলাত, রান্নাবাড়ি খেলাত, ডুরে শাড়ি পরত, নাকে নোলক দুলত?

এ সব গল্পকথা, গল্পকথা! মা মানে বল ভরসা। মা মানে মাথায় চুড়ো করে চুল বাঁধা। হাঁটু অব্দি তুলে মোটা গড়ে কাপড় পরা। দশজনের খাটনি একলা খাটা, বাজখেঁয়ে গলায় হাঁকুর পাড়া।

অবাক হয়ে মানিক মাথা নাড়ল বার বার।

তা বলে পুণ্যার দিনে ঘোনাপাড়া থেকে পাতুল অব্দি সব গাঁয়ের মানুষরা খালি হাতে গিয়েছিল এ যদি ভাব, তা হলে খুব ভুল করেছ। সবাই যাকে বলে, শূরবীরের জাত। বর্গীদের সঙ্গে লড়তে কে যায়নি? চাঞ্চিধানুকীদের তীর আকাশ ছেয়ে ফেলত। ডোম-বাগ্‌দী-বাউরি-কেওট-কাওরা-তিওর দুলে এমন কত, কত জাতের মানুষ চিরকাল লড়াই করছে। তাদের যাকে বলে আত্মসম্মান নেই? রাবণ তিওর তো তীর ফুরিয়ে যাওয়া অব্দি গিরিয়ার মাঠে লড়েছিল আর ধরা পড়লে বলেছিল, লাঃ! মাথা লামাব নাই! কেট্যে লিব্যি তো কেট্যে লে! মাথা লামাব নাই, মানও দিব্য না তোরাদের!

সে কথা আজও বুড়োরা বলে। রাবণ তিওরের, পবন দুলের, উদ্ধব বাউরির, সূর্য ডোমের বীরত্ব আর সাহসের কথা। সূর্য বলত, কাপড় গেলে কাপড় কিনতে পার‍্য, চাল নাই তো ধান লুট্যে আনতে পার‍্য। কিন্তুক মান গেল্যে আর পাব্যে নাই, বাপ সকল! মান হল্য গঙ্গার উজান সোত! যি জলটো উজানে যায়, সি জল কি আর ফিরে? ফির‍্যে না।

এরাও তো আত্মসম্মানী। তাই জেলেরা ডিঙি নৌকো ধুয়ে মেজে শুকিয়ে মাথায় বয়ে নিয়ে গেল। তাতে ডাল ঢালা হবে, আমের টক। মেয়েরা নিয়ে গেল বড় বড় খেজুর পাতার ঠাসবুনোট চাটি, তাতে ভাত ঢেলে পাহাড় করা হবে।

কুমোররা নিয়ে গেল এই বড় বড় জালা, তাতে বেন্নন রাখা হবে। ছুতোররা দিল কাঠের হাতা, কামাররা গড়ে দিল লোহার ডাবর হাতা, ছেলেরা নিয়ে গেল বোঝা বোঝা কলাপাতা। যে যার জলখাবার পাত্র নিয়ে গিয়েছিল বটে। কুমোররা হাজারটা মাটির ঘটি কেমন করে ঝপ করে গড়াবে? রান্নাও হয়েছিল অমৃত সমান। হবারই কথা। শ্রীধর চটখণ্ডীর মা বসে থেকে নির্দেশ দিয়ে রান্না করিয়েছিলেন।

এই বামুন মা-র রান্নায় এত নাম, যে বড় যজ্ঞি হলে ওঁকে পান, কাপড়, হলুদ, নারকেল প্রণামী দিয়ে পালকি করে আনতে হয়। শ্রীধরেরা চার ভাই। এক ভাইপো দক্ষ রাঁধুনী।

চটখণ্ডীর মা বললেন, ঝাল মরিচ ঢেল্যে রাঁধবি রে! উয়ারা ঝাল ভিন্ন খায় না।

পাঁচখানা ব্যঞ্জন, শুক্তো, বেগুন-কুমড়ো -কচু-পুঁইশাকে মাছের মাথা দিয়ে চচ্চড়ি, নটে শাক আর চিংড়ি ভাজা, চিতল মাছের ঝাল। না, পায়েস টায়েস মিষ্টি জিনিস ওরা তেমন পছন্দ করে না। ওদের পছন্দমত সর্ষেপোস্ত বাটা দিয়ে সবচেয়ে টক আমের ঝাল ঝাল টক হয়েছিল।

খেয়ে সব ধন্য ধন্য। ডিঙিগুলো জেলেরা ধুয়ে নিয়ে গেল।

খেজুরপাতার চাটি, মাটির জালা, কাঠের হাতা, লোহার হাতা, এঁটো পাতা সব পগাড়ে ফেলে দিল।

জগৎ দত্ত ঘুরে ঘুরে "ভাল করে দাও গো! ঘোনাপাড়ার কেউ যেন বাদ না পড়ে" বলছিল।

আর সব শেষে বলল, ঘরের মানুষদের জন্যে নিয়ে যাও বাপসকল! মা জননীরা! সবাই তো আসতে পারে নাই! দেখ ! নিমন্তন্নকালেই বলেছি, খাবে, ঘরে নিয়ে যাবে, বাসন এনো।

মা পেতলের পরাত এনেছিল। ঠাগ্‌মার জন্যে বেন্নন আর টক নিল। খেয়ে দেয়ে, "খুব খেল্যম গো মাশায়! ধন্য ধন্য খেল্যম!" বলে পান-সুপুরি-চুন-দোক্তাপাতা নিয়ে সবাই চলে এল।

বুঁচির শাশুড়ি মানিকের মা'র পাশে বসে খেল। পুকুরে হাত ধুয়ে বলল, অ ব্যান! বউ কিন্তু মাঘ মাসে আনব্য আমি!

- ঘর কত্তে?

- না গো! সাতদিন রাখব্য কাছে! আমার ননদ আসব্যে কাঁদী হত্যে, বউ দেখব্যে।

মা নিশ্বাস ফেলে বলল, উ আখুন তোমরাদের বউ! ই বছর পারব লাই, উ বছরে একোর আর দুকোর বউদেরে আনব্য, বুঁচিরে পাঠাব্য। হাতে হাতে কাজ কর‍্যে, তব্যে হেঁসেলে দিও না ব্যান! পারব্যে নাই।

- ই দেখ্য! কচি বউ কেও হেঁসেলে দেয়? আমরা তিনো জা আছি ক্যানে? ঘর বড় খালি ব্যান! বউ ঘুরব্যে, দেখব্য, বড় সাধ করো গো!

- তব্যে আর কী? পাঠাব্য তারে। বুঁচি কিন্তু ওর বরকে ভেংচি কাটছিল। মানিককে বলছিল, দেখ কেনে ছোটদাদা, খেয়্যে প্যাট ফুল্যেছে কেমুন?

বুঁচির বুদ্ধি হয়নি।

মানিক ভাবতে ভাবতে চলল, এত যে আশ্চর্য সব কাণ্ড হল, স-ব বলতে হবে বন্ধুকে।

গঙ্গারাম কাকা বলল, বউঠান! আমরা তো ই সন ভাল্যই যাব্যে দেখি। কবিরাজ মাশায় ওঠা অলক্ষণ দেখ্যে!

- মানিকরে না কি তিনি মুশ্যিদাবাদ নিব্যে?

- হাঁ গো! দু'টা টাকা দিব্যে!

- আশ্চাজ্জ কথা বট্যে ঠাকুরপো!

সত্যিই অবাক কথা। টাকার সঙ্গে মানিকদের কারবার খুব কম। কড়ি চলে বাজারে, নয় তামা আর লোহা মেশানো ঢ্যাবা পয়সা। রুপোর সিকি বা টাকার দরকার কমই পড়ে। যদি দরকারও হয়, একটা গোটা টাকা রোজগার করা কঠিন। বর্গীরা তো "তঙ্কা দেহ, তঙ্কা দেহ" বলত তরোয়াল তুলে। সব সময়ে তো পেত না। মেদিনীপুরেই এক ছোটখাট রাজা টাকার বদলে কড়ি দিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, পবন যখন বেঁচে ছিল তখন টাকা হাতে পেয়েছে মানিকের মা। সে তো একটা শূরবীর মানুষ। সে টাকা পেতে পারে। কিন্তু-মায়ের কোলপোঁছা ছেলে খুঁতো-পা মানিক পাবে দুটো রুপোর টাকা?

মা আবার বলল, উ গাছবাকলের এত্য দাম?

- হ্যাঁ বউঠান! কবিরাজ মাশায় অষুধপালা কর্যে বড় বড় ঘরে। এত্য এত্য সোনারূপা পায়! তা অষুদ আসে কি বাতাস হতে? উ-ই গাছবাকল ভস্‌সা!

- আশ্চাজ্জ কথা! বনে বনে ফির্যে ঘোনাকত্তা উয়াক গাছ পাতা চিনায়, আমি ভাব্যি ই ছেল্যেখেলা! কিন্তুক...ই একটো...কাম বট্যে? আশ্চাজ্জ!

- উ ছেলাও আশ্চাজ্জ! সিকা ধর্যে বলল্য, মা বুঁচির নথ গড়াব্যে। দু'টা টাকা পাবে শুন্যে বলল্য, মা বুঁচির হার গড়াব্যে! আমারদের ঘরের ছেলা এমুন বুড়ার মত্য চিন্তা কর্যে?

- না, কর্যে না। ই সনে সবই আশ্চাজ্জ!

ছয়

কবিরাজ মশায় মানিককে পেয়ে কী কম খুশি? গিন্নিকে বললেন, এ ছেলে যদি পড়তে জানত সদার মা। তাহলে কাণ্ড করে ফেলতাম।

-দুলে-কেওরা-তিওর-বাগ্‌দী যদি পড়বে, তবে আমাদের ছেলেরা যায় কোথায়?

-সকলকে দিয়ে কি সব কাজ হয়? সদা আর গদা পাঠশালে যায় বটে, কিন্তু অষুদবাকল চিনে না আজও। উপেনটা শিখছিল, সে চলে গেল।

- ওই যে ভুতের দল পুষেছ, কাঠা কাঠা মুড়ি আর হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত খায়, ওরা?

-ওরা খানিক শিখবে তা বাদে গাঁয়ে যেয়ে কবিরাজ হয়ে বসবে। ও কাজগুলোও তো করা দরকার।

সত্যিই কবিরাজ বাড়ি এটা ছেঁচ, ওটা বাট, একটাকে রোদে শুকাও, সেটাকে গুঁড়ো কর, এসব না হলে তো ওষুধ হয় না। শেঠরা যদি সাহায্য করে, তবে মুর্শিদাবাদে গিয়ে বসবেন।

ওষুধ তৈরি করতে প্রবাল-মুক্তা-সোনা-রুপো-গজদন্ত, কত কী লাগে! শহরে অনেক রত্নব্যবসায়ী। তারা দিতে পারে সব। রাজবৈদ্য, নয় শেঠদের খাসবৈদ্য হতে চান কবিরাজ মশাই। কিন্তু দুষ্প্রাপ্য লতাপাতার বড় অকুলান। মানিক যদি থাকে। কবিরাজ মশাই নির্ঘাত ভেষজ উদ্যান করবেন একটা। মানিক গাছ লাগাবে পালবে, দেখবে।

কবিরাজ মশাই ছাত্র জোটাবেন কিছু। শহর ছাড়া তেমন ছাত্র মিলবে না। তাদের শেখাবেন। মানিক কেন দুলের ছেলে? বামুন-কায়েত-বদ্যির ছেলে কেন নয়? ওকে কোনদিন বলতে পারবেন না এটা কর্, ওটা কর্।

তা হলেই সর্বনাশ!

দুলের ছেলে ঘরে তুলেছ? তোমাকে কেউ ডাকবে না। কিন্তু কী বোঝে, কী সুন্দর বোঝে ছেলেটা!

- চাকুল্যার শিকড় যে চাই রে!

- আখুন? ভাদ্দরে আমাবস্যা হবে তবে শিকড়ে রস হবে। ওই রসেই তো গুণাগুণ গো কত্তা!

- বাপ্ রে! সুশ্রুত জানিস না, মহৌষধি রত্নসার পড়িসনি, এত জানিস?

-ঘোনাদাদু সব জানত। সে গাছ লাগাত, আবার বনের গাছগাছলা খুঁজেও বের করত। আমাকে সাথকে লয়্যে ঘুরত্য, সব চিনাত। উনিশ জাতের নাগবলা, তের জাতের বামনহাটি, স-ব, স-ব!

- সে অষুদ করত?

- কিছু কিছু।

- একা?

- আমি ধুয়ে-কুটে-বেছে দিতাম। সে ছেঁচত, জ্বাল দিত, বাটত।

- আজ কী আনলি?

- দুধ আমলার পাতা আর লতাডুমুর।

কবিরাজ মশাই মন ঠিক করে ফেললেন। বললেন, নে, আজও সিকি দেব।

- এক সিকি!

- মুর্শিদাবাদ নিয়ে যাব তোকে। সেখানে মস্ত শেঠ, জগৎ শেঠ, জমি চেয়ে নিব, অষুদপালার বাগান করব।

-অ্যানেক দূর নয়?

- কত আর দূর? আসবি-যাবি, যাবি-আসবি, বাগানটা করলে মানিক! পাঁচ টাকা মাইনা! বেড়ে দশ হবে! তোর মা ইট পুড়িয়ে দালান দেবে দেখে নিস।

- লা কত্তা! মাট্যা ঘরে শান্তি কত! আর! মা অমুন ঘর লিব্যে না। আমাক্ ছেড়ো অ থাকব্যে না কুন্অ দিন।

- নয় আমাকে অষুদপালা জোগালি? মুরশিদাবাদ দেখলে...কত যে আশ্চজ্জ জায়গা... একবারটি চল্ না!

কবিরাজের মন বলল, ভুলে যাবে, ভুলে যাবে। একবার দেখলে গাঁ ভুলে যাবে।

- দাও কী দিব্যে। আমি ঘর যাব।

- রুপোর সিকি নেড়েচেড়ে মানিক বলল, তুমি বড় ভাল গো কত্তা! ই দিয়্যে মা বুনকে গহনা গড়্যে দিবে।

- বাড়ি ফিরতে মা বলল, এমন আশ্চাজ্জ কথা! দাদারা পার্য্যে নাই, ভাই পারল্য।

ঠাগ্মা বলল, মানিকের বাপ থাকত্যে সোনা-উপো হাতে ধরতাম, আখুন মানিক ধরাল্য। বুনো বুনো বল্যেছি তা ঘোনাদাদা বলত্য, উ হীরামানিক চিন্যে, কিন্তুক তার মম্ম বুঝি নাই তখুন।

মানিক হেসে গড়িয়ে গেল। কিসের হীরে, কিসের মানিক, দুপুরে কলমিশাক আর শোলমাছ পোড়া আদা, লঙ্কাবাটা আর তেল দিয়ে মেখে তাই দিয়ে ভাত খেতে খেতে মানিক বলল,আমার পা ভাল্য হব্যে মা?

- লিচ্চয় হব্যে। জম্মকালে উ পা মুড়্যে পেট হতে পড়ল্যি তাথেই অমন! মাটির ঘোড়া মেন্যে এলাম না?

বুঁচি বলল, খুঁতা পা, তাতেই ঘর্য্যে থাকিস না!

মা বলল, না থাকুক। যুজ্যে যাব বল্যে তো দাদাদের মত ঘুরে বুলছে না?

- কুথা যুজ্য, মা?

- আমি জানি? লতুন লবাব খালি যুজ্য কত্তেছে, কুন্ বা ফেরেংগি, না কি সাদা বর্গীদের সঙ্গে! উরা যুজ্যে যাবে!

- সত্যি যাবে?

- কে নিবে উদের? দেওর বল্যে গেল, আখুন যুজ্য করে বন্দুক চাই, এই বড় বড় নাঙ্গা তলোয়ার! সড়কি-বল্লম- ধনুকের দিন নাই! খানিক ঘর্য্যে থাক্, বেরাস না মানিক।!

-হ্যাঁ... ঘর্য্যে আছি তো! মা! কবিরাজ কত্তা কী বলে জানিস?

সব শুনে মেলে মা বলল, দেখা যাব্যে। এত্জনা গাঁয়ে থাকত্যে তুই বা কেন

তার সেথ্যে হল্যি, গাছগাছলা চিনল্যি, কে জানে? কিন্তুক আখুন নয়, কী বা যুজ্য, কী বা বেধ্যেছে, সব ঠান্ডা হোক্!

ঠাগ্মা পান-তামাকের টোপলা গালে দিয়ে বলল, সকল কি শেতল হয় বউ? ঘোনাদাদা ছিল ঠাউরদেবতা মানুষ! গাঁ-খান যেমুন মাথায় নে' চলত। মরণকালে বল্যে গেল আবার বর্গী আসব্যে, সব লতুন বর্গী, সে জনা মনে মনে বুঝ্যেছিল।

- মা! যুজ্য কেন কর্যে গো?

-যা, দাদাদেরে শুধা।

মা খেজুরপাতা নিয়ে চিরতে বসল। আর মানিক খেজুরপাতা গুছিয়ে রাখতে রাখতে ভাবল, ঐ কথাটাই ভাব্যি নাই?

বন্ধু কত্ কি দিছে আমাক, আমি একটো চাটি নিজে বানাব্য সি বস্যে কথা বলব্যে।

চাটিটা মানিক বানিয়েছিল, আর দেখে মা গালে হাত দিল। এমন চিকন করে পাতা চিরে এমন চাটি বানাতে তো সে পারে না? মানিক! সব আশ্চর্য তোর? বনে বনে ফিরিস, অষুদপালা তোর মতো কেউ চিনল না? চাটিটা বুনলি, এমন চাটি কেউ বুনল না? তবে তোর ঠাকুমা ঠিকই বলে? তোর কোন্ ঘরে জন্মাবার কথা ছিল, কোন্ ঘরে জন্মালি? কোন্ দেবতা ঠিক করে দেয় এসব? মা ষষ্ঠী?

বেঁচে জীয়ে থাক মানিক, আর কিছু চাই না।

কিন্তু মানিক চাটি নিয়ে যায় আর ফিরে আসে। আসার সময় অষুধপালা জোগাড় করে।

দিতে যায় কবিরাজমশাইকে।

সব কথা যাকে বললে সে মানুষ শুনে খুশি হত, সে মানুষ গেল কোথা? আসে না, সে আসে না।

এর মধ্যে আষাঢ় না আসতে আকাশ থেকে ইঁদ রাজার ঐরাবত সাতসমুদ্দুরের জল ঢালতে থাকল নীচে। দিনেমানে আকাশ কালো, পাখপাখালি গাছের ডালে বসে ভেজে. গর্তের সাপ শুকনো জায়গা খোঁজে, মানিক ওর স্বর্গের বাগানে যায় কি করে?

নদী-নালা খাল-বিল ভাসাভাসি, উঠোনে কইমাছ কানে হেঁটে যায়, ঠাগ্মা বলল, শনিতে লাগল্য, মঙ্গলে ছাড়ব্যে, তার আগে আকাশ ফার্সা হব্যে নাই। আর বউ! রীতকরণও ভুল্যে বসলি?

- কী রীতকরণ ঠাগ্মা?

- ইঁদরাজা বসব্যে.....

মা মাথায় টোকা দিয়ে উঠোনে পিঁড়ি রেখে এল। ওই পিঁড়িতে বসবে ইঁদরাজা।

একগাছা সুতো ঢিলে জড়িয়ে রেখে এল, মেঘের ছ্যাঁদাগুলো সেলাই করবে। তারপর শাশুড়িকে বলল, আর কী?

- আর আবার কী? আখুন ইঁদআজা চিঁয়ে দেখল্যে হয়। আশ্চর্য, আশ্চর্য, পরম আশ্চর্য! রাত থেকেই বিষ্টি কম, সকালে আরও কম। মেঘগুলো ধীরে ভেসে চলে যাচ্ছে অন্য দেশে, বেলার দিকে সূর্য অপ্রস্তুত হেসে নরম রোদ নিয়ে দেখা দিলেন।

আর পরদিন ভোরে মানিক ভাতপান্তা খেয়েই দৌড়ল। হাতে হেঁতালের লাঠি, দেখলে সাপ সরে যায়, মা বলেছে।

কিন্তু কোথায় কী?

মানিক থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বোবা যেন। কোন গাছে আম নেই, কে পাড়ল?

ঝরাপাতায় পথ ঢেকে গেছে, ঘাসগুলো এত বড় বড়, বন্ধুর বড় সাধের বকুল গাছের ডাল ভেঙে পড়েছে, একটা শালিকছানা ঘাটলায় পড়ে আছে; মরে কাঠ! কেউ এসেছিল? আম পাড়ল কে? বন্ধু বলেছিল আষাঢ়ের জল পেলে এ আম মিষ্টি হয়। কিন্তু ঝাঁটপাট দেয়নি কেউ, ঘাস কাটেনি, এ কেমন কথা? বাগানটার চেহারা এমন একলা-একলা কেন?

মানিক ঠিক বুঝল, বাগানটা একলা হয়ে গাছে। মানিক নিজেও তো মনে মনে একলা ছেলে! বন-জঙ্গল, খালবিল, পাখপাখালি, আকাশ, মেঘ, রোদ, এদের সঙ্গেই ওর ভাব। শুধু একজন মানুষ বন্ধু হয়ে এসেছিল।

মানিক কিছু বোঝে না জগৎ সংসারের। ওর পৃথিবীটা ওর নিজের মনের মধ্যে। কিন্তু শালিক ছানাটাকে ভিজে পাতা দিয়ে জড়িয়ে ঘাসের ওপর রাখতে রাখতে ও বুঝল, স্বর্গের বাগান নয়! মানুষ আসত, পয়পরিষ্কার রাখত, এখন তারা আসে না।

বন্ধু যেমন আসে না।

বেরিয়ে এল মানিক। হাঁটতে হাঁটতে, হাঁটতে হাঁটতে বাগানের পাঁচিল পেরিয়ে এল, তারপর থমকে দাঁড়ায়। বাগানের সীমানা শেষ? এটা তো উত্তর দিক। এখানে এমন কাঁকর বিছানো পথ? সে পথ এসে থেমেছে পাঁচিলের গায়ে এতবড় একটা ফটকের গায়ে? ফটকের গায়ে কত বড় তালা। তালার গায়ে কত নকশা।

মন বলল, এ পথেই তোর বন্ধু আসত। তুই বুঝিসনি। কিন্তু এই লাল কাঁকরের রাস্তাটা যাচ্ছে কোথায়? মানিককে কেন বলছে এস, এস?

এই পথেই তবে বন্ধুকে নিয়ে গেছে। পায়ে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মানিক পৌঁছল বড় একটা রাস্তায়। ঘোনাদাদু বলত, 'আস্তা নয় রে, উটি হল্যে সড়ক।' আর মানিকের ঘোনাপাড়ায় আর সবাই বলে সোড়াং।

সোড়াংটা যাচ্ছে কোথায়? পাতুল যায় মানিক যে পথে, এ তোঁ সে পথ নয়?

আর দেখ! পথ দিয়ে কত লোক না যাচ্ছে! কত না গরুর গাড়ি, পালকি, ডুলি! কোথায় যাচ্ছে?

কত লোকের দেখ, কোথাও না কোথাও যাবার আছে। মানিকের তো ছিল একটা বাগান, আর একটা বন্ধু। দুটোই হারিয়ে গেছে বলে মানিকের ছোট্ট বুকটা চৌচির হয়ে ভেঙে যাচ্ছে। কে যেন চালাচ্ছে ওকে, ও নিজের বশে নেই। ও গিয়ে পথের পাশে দাঁড়াল।

বড় সড়কে যারা চলে তাদের নিয়ম বুঝি অন্যরকম।

ঘোনাপাড়ার সব পথ পায়েহাঁটা পথ। সে পথে যারা চলে, সবাই সবাইকে চেনে, দুটো কথা বলে, এ পথে কি কেউ কাউকে চেনে না?

মানিক বাড়ি যাবে কী করে? গরুর গাড়ি যাচ্ছে, তাতে মানুষ নেই, জন নেই, গাদা গাদা বল্লম- বর্শা, লম্বা লম্বা নল বাগানো কী যেন!

- কী লিয়্যে যেছ কাকা?

- কে রে তুই?

- ঘোনাপাড়ার মানিক বট্যে।

- তা হেথাক কেন? যা, সরে যা!

মানিকের বুক ধুকুপুকু। না, ও দক্ষিণ দিকেই যাবে। গেলে কোনও না কোনও সময়ে কি বাড়ি পৌঁছবে না। কিন্তু মন যে বলছে, চল, চল, আমার সঙ্গে চল?

- তুমি কে ভাই?

মানিক চমকে তাকাল। দাড়ি, গোঁফ, আলখাল্লা, মাথায় টুপি, ভুরুর পাশে আঁচিল।

- আপনি...তুমি...মুশকিল আসান লয়?

- আমায় চেনো?

- তুমি পাতুলে যাও, আমি তোমায় দেখ্যেছি। আর, আর, সবুটিতে বিশালাক্ষী থানের পথেও যেতে দেখেছি...

- ঠিক বলেছ। বলবেই তো। ছোটরা তো ঠিক কথাই বলে! তা তুমি এখানে?

- পথ ভুল্যে গিছি। মাথা দুখাইছে, পা বেথা....

-বাড়ি কোথায়? দেখি? কপালটা দেখি?

- ঘোনাপাড়া।

- সে তো দক্ষিণে যেযে পুবে ঘুরে...জ্বর গায়ে চলে এসেছ?

- হাঁ গো। জ্বর নয়, হেঁটে হেঁটে....

- এখন তো যেতে পারব্যে না। আজ ওদিকে কোন গাড়ি যাবে না।

- তুমি তো মুশকিল আসান কর, আমাক্ ঘরে লিয়্যে যাবে?

- আর পারলাম কই! যে মুশকিল হয়ে গেল, তার আসান হয় না।

- আমার ডর লাগ্যে গ!

- চল, আমার সঙ্গে চল।

- কুথাক্?

- আজ যাব মুর্শিদাবাদ। আর কাল, নিশ্চয় তোমায় পৌছে দেব।

- পাতুল যেল্যেই ঘর যেত্যে পারব।

- ভয়ডর নাই তোমার?

- আছে। কিন্তুক বিশালাক্ষীর থানের ধুলা মাদুলিতে আছে না? আমার কুন্-অ বিপদ হবে নাই।

- বুঝলাম, চল, গাড়িতে চাপ।

গাড়িতে খড়ের গাদা, মানিক শুয়ে পড়ল। গাড়ি চলেছে ক্যাঁচ কোঁচ, ক্যাঁচ-কোঁচ। মাঝে মাঝে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাচ্ছে কারা।

- উ কারা যায় গো?

- সব নবাবের ফৌজ।

- লবাব মুর্শিদাবাদে থাকে, লয়?

- থাকত। এখন তুই ঘুম যা।

বাস। আর তো কোথাও যাবে না মানিক। কিন্তু বাড়ির কথা মনকে টানছে কই? মন কেন বলছে, চল, চল, চল?

কত কথা বলার ছিল বন্ধুকে, বলা হল না। খেজুরপাতার অমন চাটিটা দেয়া হল না। মা জানল না মানিক কোথায়, না জানি কত আতিপিতি ঘর-উঠান করছে, না জানি মাটির দেলকোয় পিদিম বসিয়ে দেখতে যাচ্ছে পথে। ডর নাই রে আমি আস্যে যাব্য বিহান না হত্যে। আখুন আমি নিজের নাই মা! মন আমার টানছ্যে।

আর জোনাক পোকা দেখ ঝাঁক বেঁধে সঙ্গে সঙ্গে যায়। মানিকের মায়া হল। অ জোনাক! তোর কত আলো আছে এমন আঁধারে পথ দেখাবি? এতটুকু নরম আলোয় কি আঁধার কাটে? মানিক ঘুমিয়ে গেল।

গাড়োয়ান বলল, ই কি হইছে গো? সব গাড়ি ঘুর্যে দিতেছ্যে? কাল ফিরতে পারব্য?

মুশকিল আসান বলল, নিশ্চয়। আমিও তো যাচ্ছিলাম বেনপুর। তা নবাব হেরে গেছে বলছে সবাই।

- অত সড়কি বন্দুক?

- এক নবাব যায়, আর নবাব আসে, যুদ্ধ না কি হলই না তা! জিতবে যে, সে তো নবাবের ফৌজের হাতিয়ার কেড়ে নেবেই।

- আজ্রায় আজায় যুজ্য! তা আমাদের এমুন ছিটাভিটা করে কেন?

- আর কেন! এখন রাত পোহালে বাঁচি।

- ছেলাকালই ভাল গো! উ ছেলাটো ঘুমালছে কেমুন! কুন্-অ চিন্তা নাই!

- আছে, আছে। ওর চোখ বলছে ও বড় দুঃখ পেয়েছে। গরুর গাড়ি ক্যাঁচর-কোঁচর যেতে থাকল। গাড়োয়ান ঘুমঘুম গলায় বলল, সকাল হতেই মুশ্যিদাবাদ!

- কালই ফিরবে তো?

- লিচ্চয়।

- ছেলেটাকে পাতুলে নামিয়ে দিয়ে যাব!

- ভোর ভোর ওরা পৌঁছে গেল।

মানিকের চোখে রোদ পড়তে তবে ঘুম ভাঙল। এ কী? এ কোন্ জায়গা? চোখ কচলে তড়াক করে নামল ও। কোথায় এসেছে ও? এত বড় বড় ঘরবাড়ি, এমন পথ, এত লোকজন! এটা মুর্শিদাবাদ?

মুশকিল আসান কোথায়? শুধু তো ওদের গরুর গাড়ি নয়, কতগুলো গাড়ি দেখ! বাপ্ রে, একসঙ্গে এত গাড়ি তো মানিক দেখেনি?

আর কত লোক, কত লোক দেখ! সব দু'পাশে বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কী দেখবে বলে? কিসের ঘন্টা শোনা যাচ্ছে। ঢং ঢং ঢং? মানুষ কেন একবার পথের দিকে চাইছে, একবার মাথা নামাচ্ছে?

হাতি! হাতি আসছে? কে বলল!

সিরাজের হাতি! পিঠে বসে কত বেড়াত সিরাজ!

দু'বছরও টিকল না গো! যবে থেকে নবাব, তবে থেকে সিরাজ যুজ্য করে করে...

পলাশীতে তো যুজ্য হলই না। হলে কি সিরাজ হারত?

— হা রে সিরাজের নবাবি! হা রে আল্লার বিচার! কী বা বয়স!

কার কথা বলছে ওরা? মানিক কাকে শুধোবে?

হাতির গলায় ঘন্টা ঢং ঢং ঢং!

আস্যে গেল!

কোথায় হাতি? মানিক হাঁচড়ে পাঁচড়ে ছইয়ের ওপর উঠল। হ্যাঁ, হাতি আসছে। দুপাশে দুজন লোক হাঁটছে। হাতির ওপর বসে আছে মাহুত!

আর হাতির পিঠে ওটা কী? মানিক মুখ বাড়াল। ও তো একা নয়, অনেকেই ছইয়ে উঠে পড়ছে, গরুর গাড়িতে উঠছে। কী দেখবে বলে?

হাতিটা চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেল। শুঁড় দোলাল,পা ঠুকল একটা।

মানিকের বুকের ভেতর হঠাৎ যেন পিদিম নিভে গেল। পথ যেন ফুরিয়ে গেল। সব অন্ধকার; অন্ধকার, অন্ধকার।

অন্ধকার, অন্ধকার।

মাথা আর দু'হাত ঝুলছে বুক চিতিয়ে। সেই ভীষণ চেনা বড় বড় চোখ নিষ্পলক, উদাসীন। হাতের আঙুল ছড়ানো। আর রক্ত, রক্ত,! এত রক্ত, এত রক্ত!

-না - আ - আ - আ।

মানিকের রিনরিনে গলায় তীব্র কান্নায় সবাই চমকিত।

- কে, কে, কে চেচাঁল?

মানিক ঢলে পড়ল, পড়ে গেল মাটিতে।

গরুর গাড়ি চলছিল। মুশকিল আসান মানিককে ধরে বসে ছিল ছইয়ে হেলান দিয়ে। কেউ কোন কথা বলছে না। মানিক তাকিয়ে আছে পথের দিকে, নিষ্পলক।

গাড়োয়ানই যা কথা বলছে।

-ই দিশ্য কি দেখতে আছ্যে?

মানিক চুপ।

—অক্ত দেখ্যে আমারই দেহ যেমন...

মানিক চুপ।

মুশকিল আসান বলল, শো খানিক ।

মানিক মাথা নাড়ল। এখনও ওর মন বলছে, না! না! না!

কিন্তু এটা তো হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ!

এখন ও বুঝতে পারছে একটু একটু, কেমন করে? আজ সকালের পর মানিক বড় হয়ে গেছে বলে? মানিক যেমন পালিয়ে যেত বাগানে, বন্ধুও বুঝি সব ভুলে থাকতে দু'দন্ড যেত গাছ, ঘাস, জলের কাছে।

পালিয়ে যেত, পালিয়ে যেত, পালিয়ে যেত!

কারা বন্ধুকে পালিয়ে যেতে দিল না?

ক্রমে চেনাচেনা জায়গা এল। মানিক শুকনো গলায় বলল, রাখ্য খানিক! আমি লেম্যে যাই।

— পাতুল তো আরও সামনে।

— না গো! আমি বনের পথ্যে চল্যে যাব!

গাড়োয়ান গাড়ি থামাল, মানিক নেমে পড়ল।

— সাবধানে যাবি! আবার দেখা হবে কোথাও। ঘাড় হেলাল মানিক!

— তোর হেঁতালের লাঠি?

মানিক লাঠিটা নিল।

বাগানের পাঁচিলকে বাঁয়ে রেখে এগোতে এগোতে কানায়ের বিল! সব দেখ, যেমনকে তেমন আছে। বিলের জলে ঢেউ খেলছে পুবে বাতাসে। নীলকণ্ঠ পাখির কী ওড়াউড়ি! তেলশেঁওটা ঝোপে সাদা ফুল ফুটে আলো করেছে। স—ব যেমনকে তেমন আছে।

শুধু মানিক দুলে মনে মনে খুব বড় হয়ে গেছে। অনেক বুঝতে পারছে এখন।

হঠাৎ মেঘ থমকে দাঁড়িয়ে গেল, মাথার 'পরে নেমে এল।

বাতাসে বৃষ্টির খবর। মানিক একটা বুনো মানের পাতা ছিঁড়ে নিল, মাথায় ধরে চলতে থাকল।

আর চড়বড়িয়ে জল নামল।

মা দাওয়ায় হেলান দিয়ে বসে ছিল।

—মা!

— মানিক? তুই আসছিস বাপ? কুথাক্ হারায়্যে গিছিল্যে বাপ? আমি কেন্দ্যে কেন্দ্যে...

তারপর মা চুপ করে গেল। অবাক চোখে চাইল। এ কি তার মানিক? নতুন নতুন লাগে কেন?

— মানিক আস্তে বলল, কান্‌লি কেন্যে? কানবি না মা...আমি, আমি, বড় হয়্যে গেছি আখুন। আমি তো কান্দি নাই?

কান্দি নাই তো!

বলতে বলতে মানিকের চোখের জলে ধারা নামল। মানিক বলল, আমি কান্দি নাই মা।

মা ওকে কাছে টেনে নিল ।

তারপর সব চুপ।

শুধু আকাশ কেঁদে চলল।

ঘন্টা বাবা

চলো নইপুর যাই।

ট্রেনে উঠি। খড়গপুরে নামি। তারপর কেশিয়াড়ির বাস ধরি! বাসে উঠে যেতে যেতে হাতিগেড়িয়ায় নামব। তারপর ডানদিকে হাঁটতে হাঁটতে দেখব চায়ের দোকান, মুদির দোকান। মুদির দোকানে দেখব টর্চের আর রেডিওর ব্যাটারি, জামা কাপড়, গামছা লুঙ্গি।

সনাতনের দোকান যেমন বড় সড়, সনাতনের মনটি তেমন কৃপণ। পাড়ার পুজোয় চাঁদা? পাঁচটি টাকা। পাড়ায় যাত্রা উৎসবে চাঁদা? পাঁচটি টাকা।

পাঁচ টাকার ওপরে ও উঠতে জানে না। পাড়ায় যেসব ছেলেদের বয়স দশ থেকে পনেরো, তারা ওর ওপর বেজায় চটা। দোকানের পেছনে বাড়ি। বাড়ির সঙ্গে বাগান। বাগানে পেয়ারা, পেঁপে, আতা, জাম। কি নেই!

একটা ফল কাউকে দেয়? মোটেই না। সব রিকশাভ্যানে চালান যায় দিকে দিকে।

ছেলেদের ক্লাবে একটা ফুটবল কিনে দিল? মার্বেলের মতো একটা রবারের বল কিনে দিয়ে বলল, এই নিয়ে খেল্‌গা তোরা। খেলতে শেখ্‌ ঠিক বড় বল কিনে দেব।

সনাতনের ছেলে রজত যেন লজ্জায় মরে যায়। রজত অবশ্য ফল চুরি করে বন্ধুদের খাওয়ায়। কি করবে বলো? ওর একটা আত্মসম্মান আছে না?

ওর বন্ধু গোপাল বেশরা, নান্টু দীন্দা, মোহন বেরা। বন্ধুরা বলে, বাড়িতে তোর বাবা চাল-ডাল-তেল-কাপড় চিনির গুদাম করেছে, একদিন ডাকাত পড়বে ঠিক।

তা পড়তেই পারে। মুখে কাপড় বেঁধে ডাকাতও আসে গ্রামে গ্রামে। গ্রামের লোকজন পারলে ধরে, নইলে চুপ করে থাকে। ডাকাতরা তো বন্দুকও আনে সঙ্গে। সাহস দেখাতে গেলে গুলি ছোঁড়ে যদি?

গোপাল বলে, কেউ বাঁচাতেও যাবে না।

নান্টু একটু তোতলা। ও বলে— ঘ-ঘ-ঘন্টা বাবা বাঁচাবে। তোর বাবা রোজ ঘন্টা বাবাকে ফুল জল দেয় তো!

হ্যাঁ, সনাতনের দোকান ছেড়ে গ্রামে ঢোকার মুখেই দেখতে পাবে একটা দীঘি। মজে গিয়েছিল, পঞ্চায়েত থেকে সেরে দিয়েছে। বাপ্‌রে কত পুরনো দীঘি! ঘাট বাটলা পাথরের। ওই দীঘির পাড়েই একটা পাথরের খিলান। তাতে ঝুলছে একটা ঘন্টা।

অনেকদিন আগে নাকি বর্গীরা এসেছিল হানা দিতে। তারা ঘোড়ায় চেপে লড়াই করত আর লুটপাট করত। নইপুর—তকিগড়—সান্ধারী, তিনটে গ্রামের লোক এইখানে দমাদম তীর মেরে বর্গীদের হারিয়ে দেয়। তারপর তকিগড়ের তখনকার রাজা এখানে ঘন্টা ফটক বানিয়ে দেয়। একটা শিবমন্দিরও বানিয়েছিল, তার চিহ্ন নেই। বিপদ দেখলেই ঘন্টা বাজাবে, মানুষ জেগে যাবে।

দীঘি করে দিয়েছিল, মানুষ জল পাবে।

স-ব ক্রমে জঙ্গলে ঢেকে যায়। তখনকার মানুষজন সব চলে যায়। তকিগড় গ্রামের নামই নেই। সান্ধারী মুণ্ডা সাঁওতালের গ্রাম ছিল, তাই আছে। নইপুরও ওদেরই গ্রাম ছিল। এখন নানাজাতের বসতি। আর সেদিন যাদের তকিগড়ের রাজা বলা হত, সেই রাজরায়রা কোথায় চলে গেছে, কেউ জানে না। বর্গীদের সঙ্গে তারা লড়াই জিততে পেরেছিল, ইংরেজদের সঙ্গে পারেনি।

ঘন্টা কেন ঘন্টা বাবা হল?

তা কেউ জানে না।

সবাই বলে, একেকজনের হাতে একেক আওয়াজে ঘন্টা বাজে। মন্দ লোক, ভালো লোক, কে কেমন লোক, ঘন্টা বাজাও, টের পাবে।

এখন যারা বুড়ো-বুড়ি, তাদের বাপদাদারাও ঘন্টাবাবাকে মানত করে ফলজল দিয়ে যেত। গোপালরা সাঁওতাল। গোপালের ঠাক্‌মা বলে, ঘন্টাবাবাকে মনের কথা জানিয়ে চলে যেতাম। পরদিন দীঘির জলে ডুব দিলেই যা চেয়েছি পেয়ে যেতাম।

—কি পেতিস?

—খন্তা, কোদাল, কুড়াল।

নান্টু দীন্দার জ্যেঠা বলে, —ঘন্টা বাবাকে মানত করে চলে যেতাম। পরদিন ডুব দিলে বাসন কোসন পেতাম।

রজতরা এসব কথা বিশ্বাস করে না।

দীঘি যখন সংস্কার হয়, তখন পাওয়া গিয়েছিল লোহার শিকল, একটা পাথরের পাটা, আর একজোড়া পেতলের মল। বান মাছ, পাঁকাল মাছ আর কাঁকড়া অনেক উঠেছিল। সবাই ভাগ করে খেয়েছিল। পুকুর কাটা পচা পাঁক যে যার জমিতে ফেলে ছিল। ভালো সার হবে। ছেলেদের খুব ইচ্ছে ছিল গুপ্তধন বোঝাই ঘড়া ওঠে।

কিচ্ছু না। কিচ্ছু না।

অঞ্চলের নামকরা বাসনচোর নটবর খুব আপত্তি জানিয়েছিল। পুকুর পরিষ্কার করলে চোরাই বাসন লুকোই কোথায়? আমার কাজই হল বাসন চুরি, সে কথা ভাববে তো?

পুকুর কাটার পর নটবরও লক্ষ্মী ছেলে হয়ে গেছে। সে এখন হাটে হাটে চানাচুর বেচে।

সনাতন মুদি সবচেয়ে ভক্তিভরে ঘন্টা বাবাকে পুজো করে। ঘন্টা বাবাই না কি ওকে চোর ডাকাতের হাত থেকে বাঁচাবে। ও যখন ঘন্টা বাজায়, ঘন্টা বাজে আস্তে।

সবাই বলে, —কে বাজাচ্ছে দেখ্।

গোপাল ভেবে পায় না ব্যাপারটা কি! ইস্কুলের পর ঘন্টাদেউড়ির কাছে এসে ছাগলের জন্যে ঘাসপাতা নেয়া ওর নিত্য কাজ । লোহার থালা ঝুলছে লোহার শেকলে। শেকলের আরেক মুড়োয় লোহার ডান্ডা। গোপাল ঘন্টা বাজায়, ঘন্টা বাজে মিষ্টি সুরে।

বিপদের সময়ে ঘন্টা না কি গর্জে গর্জে বাজে।

এসব কি রূপকথা না সত্যি? গ্রামের উৎসব অনুষ্ঠানে ওরা যখন বাজায়, ঘন্টা যেন আনন্দে তালে তালে বাজে।

ঘন্টাদেউড়ির থাম বেয়ে উঠে যায় গোপাল। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে চওড়া খিলানে। কালো পাথরের সঙ্গে ওর কালোবর্ণ শরীর যেন মিশে যায়।

সেদিন আর নেই এখন। গোপালকে দেখে যে কেউ বলে বসবে —সাপ-ব্যাঙ ইঁদুর খাওয়া সাঁওতাল ঘন্টাদেউড়ির খিলানে শুয়ে থাকে কেন?

বলে দেখুক না একবার কেউ। গোপালদের পাড়া সে লোককে দিয়ে মাপ চাইয়ে ছাড়বে।

যাক গে, পুরনো কালের বাসি কথা। এখন ক্লাবঘরটা না বানালে গোপালদের চলছে না। নইপুর ক্লাবের ইজ্জতটা বাড়ছে না নিজস্ব ঘর নেই বলে।

ঘর বানাতে হলে, এখন চাই চার পাঁচ হাজার টাকা।

—রজত রে। তোর বাবা তো হাসতে হাসতে দিতে পারে। কত টাকা তোর বাবার।

—বাবা কি দেবে?

—চাঁদাই বা দেয় কে?

—সেই তো কথা।

নান্টু, মোহন আর গোপাল বলে —কোনোমতে ওই সনাতন মুদিকে যদি প্যাঁচে ফেলা যেত!

এ সব কি আর চাইলেই হয়?

গোপাল আজ খুব ভক্তিভরে ঘন্টা বাজাতে বাজাতে বলতে থাকল মনে মনে একটা সুযোগ এনে দে বাবা সনাতন মুদিকে জব্দ করে টাকা আদায় করি। ক্লাব ঘর হোক। ফুটবল একটা। তারপর নইপুরের তরুণ ক্লাব দেখিয়ে দেবে খেলাধুলো নাটক, আবৃত্তি, গান, ভালো ভালো কাজ কাকে বলে। গাছ লাগাব আমরা। নইপুরকে ঢেকে দেব গাছে।

ঘন্টা মৃদু মৃদু মধুর বাজতে থাকল।

কান পেতে গোপালের মনে হল, ঘন্টা বলছে, —হবে! হবে! হবে!

গোপাল মনে মনে বলল, যদি হয়! তা হলে ক্লাবের নাম দেব ঘন্টা বাবা ক্লাব!

ঘন্টা যেন বলল, মনে থাকে যেন!

তারপরই লেগে গেল শীতলা পূজার উৎসব।

শীতলা পূজা লোধাদের সব চেয়ে বড় পুজো। বড় আর আদিবাসী, মাহাতো, লোধা. সবার বড় পরব উধনা। হিন্দুদের যেমন বড় পুজো, দুর্গা পুজো।

নইপুরে কেন, গ্রামে গ্রামে এখন সবাই সব উৎসবেই মেতে ওঠে, যোগ দেয়। শীতলা পুজোয় খুব গান নাচ হয়, মানুষ রাত জেগে আনন্দ করে।

এবার তো শীতলা পুজোয় মহা ধুমধাম! পঞ্চায়েত প্রধান সাধুচরণ মাহাতো শীতলা ভক্ত লোক। ও বলল, "শীতলা মা" যাত্রাদলটা মোহন পুরের। কম টাকাতেই আসবে। এবারে যাত্রা হোক।

গ্রামের লোকজন খুবই খুশি। গোপালরাও মেতে উঠল। একদিকে শীতলা পুজো, অন্যদিকে যাত্রা।

পাঁচ গ্রামের মানুষ এসে গ্রামে ভিড় জমাল। এ রকম ভিড়ের মধ্যেই গোপালের চোখে পড়ল, চারটে লোক আসর ছেড়ে বাইরে বসে আছে। ওদের চেহারাও কেমন যেন। এমন অজগ্রামে শীতলা পালা শুনতে এসেছে দুটো মোটর বাইক চেপে। খুব শহুরে পোশাক আশাক, কাঁধে ব্যাগ।

গোপালরা, ক্লাবের ছেলেরা চায়ের দোকান দিয়েছিল। ওরা চা খাচ্ছে, সিগারেট খাচ্ছে।

—আপনারা যাত্রা দেখবেন না?

—দেখছি তো?

—অনেক দূর থেকে আসছেন?

—তা বলতে পারো।

নান্টু বলল, গোপাল! নজর রাখ তো।

—কেন রে?

—এর রকম উটকো লোক, শীতলা পালা শুনতে এল কেন? পালা হবে বলে মানুষ মুখে মুখে জানে। ওরা জানল কোত্থেকে? মোটর বাইক চেপে...ডাকাত নয় তো?

—ডাকাত!

—কেন, এখন তো মোটর বাইক চেপেও...

—নজর রাখব?

—রাখ্। তুই ওদিকে, আমরা এদিকে।

যাত্রা যখন বেশ জমেছে, তখন নান্টু বলল, —দেখ্।

ওরা উঠে, বাইক ঠেলতে ঠেলতে দীঘির ধারে নিয়ে যাচ্ছে। একজন ঘড়ি দেখে নিল।

রজত কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমাদের বাড়ির দিকে যাচ্ছে বলে মনে হয় রে।

গোপাল বলল, তাতে কি? শোন্, তুই যেয়ে মাইক বন্ধ কর। ডাকাত। ডাকাত বলবি, যখন ঘন্টা শুনবি।

রজত ছুটে চলে গেল।

—নান্টু! মোহন! যে করে হোক বাইক দুটো জলে ফেলি। তারপর দেখছি।

—ওরা পাঁচিল বেয়ে উঠেছে।

—রজতের ঠাকুমা বদ্ধ কালা।

—বাগান পেরোলেই তো বাড়ি।

—আরে, খবর নিয়ে এসেছে!

—একটা লোক যে নিচে দাঁড়িয়ে রইল?

—ঠেল্ না বাইক। জলে ঝাঁপিয়ে পালাবি সাঁতার কেটে। জয় ঘন্টা বাবা!

—তুই?

— দেখবি ঘন্টা কেমন বাজে।

গোপাল বেশরার হাতে ঘন্টা যেন গর্জন করে করে বেজেছিল। ঘন্টা বাজছে, বাজছে, আর মাইক হঠাৎ বন্ধ, সবাই শুনতে পেল তিনটে ছেলে চেঁচাচ্ছে, ডাকাত! ডাকাত!

মোহন নান্টু আর গোপাল।

ঘন্টা শুনেই সকলে দৌড়ে আসছিল। যে লোকটা বাইরে, সে বাইক নিয়ে পালাতে এসে ধরা পড়ল।

অন্য লোকগুলো ধরা পড়ল বাড়ির বাগানে।

ওরা বোমা এনেছিল, রিভলভারও ছিল সঙ্গে। কিন্তু কয়েকশো লোক যে ওদের ওপর হঠাৎ ঝাঁপ দেবে তা তো ভাবেনি।

আর পালাবে যে, মোটর সাইকেলই তো নেই।

সনাতন কাঁপতে কাঁপতে বলল, —কেমন করে খবর পেল, মাল কিনব বলে আড়াই হাজার টাকা...আর আগেকার তিন হাজার...বাবা গো।

ডাকাতদের উপর চলল প্রথমে বেশ ধোলাই, তারপর কেশিয়াড়ি থানায় খবর গেল।

থানার লোকরা বেজায় খুশী।

ময়ূরভঞ্জ থেকে এসে চার মূর্তি চোরাই মোটর বাইক চেপে সাতটা ডাকাতি করেছে। বাড়ি ওদের ধানবাদ।

নইপুরের চার বন্ধুর নামে ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

অঞ্চল প্রধান সাধুচরণ মাহাতোর নাকি সর্ব দেহে চক্ষু? আর মাথায় বেজায় বুদ্ধি। ডাকাত ধরার খবরটি ও জেলার কাগজে ছাপিয়ে দিল।

তারপর সে নইপুরে একটা সভা ডাকল! কত ভালো ভালো কথাই যে বলল। ছোট ছোট চারটি ছেলে বুঝিয়ে দিয়েছে গ্রামে গ্রামে এ রকম গ্রাম রক্ষী তরুণ বাহিনী কত দরকার। আর দরকার।

—তা সনাতন! তুমি এদের কি পুরস্কার দিচ্ছ?

—দেব দেব, খাইয়ে দেব ওদের।

—কি রে! তোরা কি খেতে চাস?

রজত চুপ। তিনটে ছেলে চেঁচিয়ে বলল, —না!

—তবে কি চাস?

—রজতের বাবা আমাদের ক্লাব ঘরটা করে দিক। ছেলে আমরা অনেক। একটা ক্লাবঘর নেই।

—সনাতন! তুমি ওদের ক্লাবঘরটাই করে দাও।

—আজ্ঞে, সে যে...

—বটে। গ্রামের কোন কাজে হাত খুলে চাঁদা দাও না। ওরা না বাঁচালে সেদিন বাঁচতে? তুমি ক্লাবঘর আর পাইপ দেবে। দীঘি আছে, আগুন লাগলে জল দিয়ে নেভাবে। আর কথা বোল না। এবার যদি 'না না' বলো, পরে ডাকাত এলে তোমাকে গ্রামের কেউ বাঁচাবে না।

গ্রামের সবাইও চেপে ধরল রাম কৃপণ সনাতন মুদিকে! তার ঘাড় ভেঙে একটা ক্লাবঘর হলে তাই হোক।

সনাতন প্রায় কেঁদে বলল, —তাই হবে।

ছেলেদের কি আনন্দ, কি আনন্দ!

সাধুচরণ বলল, ঘন্টা বাজিয়েছিল কে?

—আমি। গোপাল বেশরা।

—তোর হাতে অমন বাজল! তুই তো খুব ভালো ছেলে।

গোপাল দৌড়ে গিয়ে ঘন্টাদেউড়িতে উঠে আবার ঘন্টা বাজিয়ে দিল। ঘন্টা যেন বলছিল, হল তো, হল তো?

গোপাল হেঁকে বলল, —ক্লাবের নামে কিন্তু ঘন্টা বাবার নামও থাকতে হবে। ঘন্টা বাবার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

সে কথা শুনে সবাই হেসে আকুল। অ্যাঁ, ঘন্টা বাবার সঙ্গে কথা!

গোপালের ঠাকুমা কিন্তু মাথা নেড়ে বলল, —হাসির কথা নয় এটা, ঘন্টা বাবা কথা কয়, কথা কয়, সবাই শুনতে পায় না!

—আমরা যে শুনি না?

—শোনার মত সাহস চাই, তবে তো শুনবে!

জাদু পাথর

অনেক অনেক কাল আগে ফারাতায়া নামে একটি বাপ-মরা ছেলে ছিল। বিধবা মা আর ছেলে, খুবই গরিব তারা। ওদের ঘর নদীর ধারে। একদিন এল একদল বিদেশী জেলে, তাদের নৌকো পাড়ে আটকে গেছে, আর চলছে না।

ওই জেলেদের ধর্মবিশ্বাস হল, নৌকোকে চালাতে হলে অশুভ আত্মাদের খুশি করতে হবে নরবলি দিয়ে। ফারাতায়াদের বাড়ি এসে ওরা তার মাকে বলল—নরবলি দেব, এমন মানুষ কোথায় কিনতে পাব বলতে পার?

ফারাতায়ার মা তো খুবই গরিব। সে বলল,—আমার ছেলেকেই কিনে নাও!

এ সব কথাবার্তা যখন চলছে, ফারাতায়া তখন জঙ্গলে চাষীদের ধান পাহারা দিচ্ছিল। এদিকে একটা বিশাল ড্রাগন একটা জাদু পাথর গিলে ফেলেছে। যাদের জাদু পাথর তারা তো ড্রাগনকে মারবে বলে করেছে তাড়া। ড্রাগনটি ফারাতায়াকে বলছে— প্রাণটা বাঁচাও ভাই।

—আমার মতো মানুষ তোমাকে বাঁচাবে কি করে? তুমি পাহাড়ের মতো বড়ো, তোমাকে লুকোবই বা কোথায়?

—আমি ভাই ভীতু ড্রাগন, বড় ভয় পাই। এই দেখ, আমি সূচের মতো ছোট হয়ে যাচ্ছি, এবার আমাকে বাঁচাও।

ছোট্ট ড্রাগনকে মাথার চুলে লুকিয়ে রেখে ফারাতায়া জঙ্গলে বসে আছে, এমন সময় ড্রাগনশিকারীরা এসে হাজির।

—ওহে ছেলে! রুলহ্রিউডা নামের ড্রাগনটা এ পথে এসেছে?

—আরে, সে মস্তো ড্রাগন এলে তো আমাকে খেয়ে নিতো, আমি কি বেঁচে থাকতাম?

ওরা চলে যেতেই সেই ড্রাগন বেরিয়ে এল নিজের আকার ধরে।

— ফারাতায়া! ফারাতায়া! আমার জীবন রক্ষক! বলো কি দেব তোমাকে?

—দিতে হলে জাদু পাথরটি দাও।

—নাও নাও। ওটা গিলে ফেলেই তো আমার যত বিপদ সব শুরু হলো।

ড্রাগনও চলে গেল। আর ওই বিদেশী জেলের দল এসে ধরে ফেলল ফারাতায়াকে।

—নৌকো আমাদের চলছে না, কোন অপদেবতার কোপে পড়েছি। তোমার মা তোমাকে বেচে দিয়েছে। কাল সকালে পুজো দেব তোমাকে বলি দিয়ে।

ওরা ফারাতায়াকে তুলে নিয়ে গেল নৌকোয়।

রাতে ফারাতায়া বলছে—জাদু পাথর যদি শক্তি ধরো, পিশু পোকা পাঠাও এক ঝাঁক। যারা নরবলি দিতে চায়, তাদের কামড়ে অতিষ্ঠ করুক।

অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে পিশু পোকা জেলেদের কামড়ে উদ্ব্যস্ত করল।

ফারাতায়া বলল—এখন এরা ঘুমোক। যেই ঘুমোবে, তেমনি যেন এই নৌকো সাঁ সাঁ করে চলে যায় ওদের গ্রামের ঘাটে।

ফারাতায়া যেমন বলল, তেমনি সব ঘটে গেল।

সকালে জেলেরা বলল, —এ ছেলেটা খুবই সুলক্ষণ, ওকে বলি দেব না।

সর্দার জেলে ভাবল, ছেলেটা বোধ হয় জাদুবিদ্যা জানে। সে বলল, —ছেলেটা আমার সঙ্গে চলুক। ওকে তো কিনেই নিয়েছি। আমার ঘরে থাকবে, কাজ করবে, খাবে।

ফারাতায়াকে ও নিয়েই চলে গেল।

একদিন সর্দার জেলে বলছে—এমন ছেলে তুমি। যাই, ত্রিপুরার রাজকন্যের সঙ্গে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করি।

কিন্তু রাজপ্রাসাদ পাহারা দিচ্ছে সেপাই শান্ত্রী। সর্দার জেলে গিয়েই বলছে, --সরো সরো। রাজার কাছে যেতে দাও। আমার ঘরে আছে ফারাতায়া, তার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হবে।

যেমন বলা, সেই সেপাইরা ওকে কেটে ফেলেছে। ঘরে বসে ফারাতায়া সব জানতে পারছে আর জাদু পাথরকে বলছে, —দাও, ওকে বাঁচিয়ে দাও।

মরা মানুষ নিমেষে জ্যান্ত হয়ে আবার বলছে, —আমাকে রাজার কাছে যেতে দাও।

সেপাইরা আবার তাকে কেটেছে। আর ফারাতায়া আবার তাকে জ্যান্ত করেছে।

এরকম তিনবার হবার পর রাজা ভাবলেন, এ লোক নিশ্চয়ই জাদুবিদ্যা জানে। তিনি বললেন, —ওহে! ফারাতায়ার সঙ্গে আমার বড়ো মেয়ের বিয়ে দিতে পারি। যদি তোমরা আমার প্রাসাদটি সোনার পাতে মুড়ে দাও।

সর্দার জেলের কাছে এ কথা শুনে ফারাতায়া বলল, —বেশ! তাই হবে।

সকালে উঠে রাজা দেখেন প্রাসাদ, দুর্গ, পাঁচিল, প্রতি ঘরের ভিতরটা, সব সোনার পাতে ঢাকা। রোদে সব ঝলমল করছে।

রাজা বললেন, —বেশ! এবার তোমরা এসো। আমি বিয়ে দেবার জন্যে তৈরি আছি।

ফারাতায়ার প্রাণের বন্ধু তিনজন। একটি ইঁদুর, একটি ভোঁদড়, একটি কাক। ফারাতায়া ওদের বলল,— রাজকন্যা যখন ঘুমোবে, তখন গিয়ে দেখে এসো মেয়েটি কিরকম।

তিন বন্ধু রাতের অন্ধকারে দেখতে এল রাজকন্যাকে। রাজকন্যা তার দাসীকে বলছে, —জেলের ঘরের অনাথ ছেলে! বিয়ে হচ্ছে হোক। বিয়ের পরেই আমি পালিয়ে যাব। ওর কাছে থাকবোই না।

বন্ধুরা গিয়ে ফারাতায়াকে বলল সব কথা। কিন্তু তখন তো বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে।

বিয়ে হল। ফারাতায়া জাদুপাথরের সাহায্যে চমৎকার এক নতুন বাড়ি করে বউকে নিয়ে এল। রাজকন্যা জেনে গেল জাদুপাথর আছে বলেই ফারাতায়ার এত ক্ষমতা!

একদিন হঠাৎ রাজকন্যা জাদুপাথরটি চুরি করে পালাল কোন্ দূর পাহাড়ে। পাথরটি গালে রেখে সে পাথরে ঘুমোয়। পাথর তাকে এনে দেয় খাবার দাবার।

জাদুপাথর নেই, রাজপ্রাসাদের সোনাও আর নেই। বেজায় রেগে রাজা বললেন, -ধরে আনো ফারাতায়াকে। কাটো ওর মাথা।

ফারাতায়া বলল, —মহারাজ! কয়েকটা দিন সময় দিন। তারপর যা হয় তা করবেন।

ওর বন্ধুদের বলল, —ভাই। পাহাড় বন খুঁজে ফিরিয়ে আনো জাদুপাথর। নইলে আমার প্রাণটি এবার যাবেই যাবে।

বন্ধু বলে কথা! ইঁদুর আর ভোঁদড় আর কাক সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। চলেছে আর চলেছে। যেতে, যেতে, দেখে এক সুন্দর উপত্যকা। সেখানে সোনার গাছে সবুজ পান্নার পাতা। লাল চুনির ফল। নদীর জলে যেন চন্দনের সুগন্ধ। বাতাসে বাজছে বাঁশি। সেখানে পাথরে গালিচা পেতে রাজকন্যা পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।

রাজকন্যা তো ঘুমোলে একেবারে অচেতন। ইঁদুর তার নাকে লেজ ঢুকিয়ে সুড়-সুড়ি দিতেই রাজকন্যা হাঁ করেছে! অমনি কাক তুলে নিয়েছে জাদুপাথরটি।

এখন জাদুপাথর নিয়ে ফারাতায়ার কাছে কে যাবে?

ইঁদুর আর ভোঁদড় বলল, —আমরা যাচ্ছি, কিন্তু তোমার শক্তি বেশি। জাদুপাথরটি মুখে নিয়ে চলে যাও।

ভাই! যেতে আমি পারি। কিন্তু পথে যদি শুনি কা-কা-কা। আমাকেও তো ডাকতে হবে কা-কা-কা। তখন জাদুপাথর পড়ে যায় যদি, তাই ভাবছি।

—ফারাতায়ার জীবন বিপন্ন। তুমি কষ্ট করেই মুখ বন্ধ রেখো।

—নাও, চলো, রওনা হই।

কাক যত জোরে ওড়ে। এরাও তত জোরে ছোটে। পথে সমুদ্রের ধারে কাকদের--কা-কা, শুনে এই কাকও—কা-কা-কা, বলে ডেকেছে, আর জাদুপাথর পড়েছে জলে।

আর অমনি মস্ত এক মাছ সে পাথর গিলে নিয়েছে টপ করে। সমুদ্রের ওপর

আলোর জ্যোতি দেখেই ভোঁদড় মেরেছে ঝাঁপ। জাদুপাথর যেখানেই থাকুক, তার জ্যোতি আছে।

মাছকে মেরে তার পেট থেকে জাদুপাথর নিয়ে ভোঁদড় উঠে এল। তারপর একটি পাথরের ওপর সেটি শুকোতে দিল।

জাদু পাথরে শত সূর্যের জ্যোতি। তা দেখে এক শঙ্খচিল সেটি ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে উড়ে গেল।

তিন বন্ধু কান্না জুড়ে দিল। হায় ফারাতায়া!

সে পথে আসছিল তিন জাদুকর।

—কি হয়েছে তোমাদের? কাঁদছ কেন?

—বলে কি লাভ?

—বলেই দেখ। আমাদের অনেক ক্ষমতা। ইচ্ছে করলে কি না করতে পারি।

—ভোঁদড় বলল—কি পারো?

—এই পাথরটা কচ্ছপ বানাতে পারি, এই গাছটাকে নৌকা বানাতে পারি...

—ওই যে শঙ্খচিলটা ঘুরপাক খাচ্ছে ওটাকে মারতে পারো?

—এই দেখ!

মুখের কথা শেষ হতে না হতে শঙ্খচিল ওদের সামনে আছড়ে পড়লো। আর তিন বন্ধু শঙ্খচিলের পেটটি চিরে জাদুপাথরটি বের করে নিয়ে বলে, —জাদুপাথর! জাদুপাথর! আমাদের পৌছে দাও ফারাতায়ার বাড়ি।

ফারাতায়ার বাড়িতে যেমনি জাদুপাথর পৌছে গেল, ত্রিপুরার রাজ বাড়ি ঝলমলিয়ে উঠল সোনায়।

রাজামশাই এবার নিজেই এলেন ফারাতায়ার কাছে।

—ফারাতায়া! ফারাতায়া ক্ষমা করো আমাকে। আর কখনো তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে যাব না আমি। আমার ছোট মেয়েটিকে বিয়ে করো। সে শান্ত; পরিশ্রমী, লক্ষ্মী মেয়ে। তোমার আরো সুখ আরো ঐশ্বর্য হোক।

ছোট রাজকন্যেকে বিয়ে করে ফারাতায়া খুবই সুখী হল। গ্রাম থেকে আনিয়ে নিল ওর দুঃখিনী মাকে। মার ওপর একটুও রাগ নেই ওর। বড্ড গরিব ছিল ওরা। তাই তো মা ওকে বেচে দেয়। বেচে দিয়েছিল বলেই তো ফারাতায়ার জীবনে এতরকম সব ঘটনা ঘটলো।

* লুসাই রূপকথা

নয়নচাঁদের স্বপ্ন দেখা

নয়নচাঁদ স্বপ্ন দেখে না। দেখলে পরে সে স্বপ্ন ফলে যায়। এ রকম একটা কথা গ্রামে চালু আছে।

এ কথা আর কে জানে না যে গ্রামে চুরি খুব বেড়েছে। পাকা রাস্তা সামনে এখন। একটু দূরেই শহর। চুরি কর, মাল সরাও, বেচে দাও। চুরির হিড়িক খুব।

চোরের ভয় তার, ঘরে আছে যার। তারাই চোরের ভয়ে মরে। সুখী পিসির ঘরে দেখ, বাসনের গাদা। সবাই জানে যে গ্রামে এখনো লোকজন ডেকে নেমন্তন্ন খাওয়াতে হলে চারশো লোককে রেঁধে দেবার, বেড়ে দেবার বাসন সুখী পিসির আছে।

সে সব বাসন রাখা হয় বাড়ির মাঝখানের ঘরে। এ ঘর ঘিরে আবার চারটে ঘর। প্রতি ঘরে ভেতর থেকে তালা দিয়ে তবে পিসি ঘুমোয়।

পিসির বাসন চুরি যায় না। কেন বল তো?

পিসির ভাইপো রুবি হল এ অঞ্চলে ডাকসাইটে মস্তান। রীতিমত দলবল আছে তার। মাঝে মাঝেই সে গ্রাম ছেড়ে উধাও হয়। আবার ফিরে আসে।

সুখী পিসির বাড়ি চুরি হয় না, চোররা বোধহয় রবিকে ভয় পায়। গ্রামে দুষ্টু লোকরা অবশ্য বলে, রবি নিজেই অন্যত্র ডাকাতি আর বাটপাড়ি করে। সে কথা সত্যি না মিথ্যে কে জানে! লোকে এমন কথাও বলে, যে রবি কি আর নিজের পিসির বাড়িতে চুরি করবে?

এ সব কথা বলে রবির আড়ালে।

রবি যখন আসে তখন সবাই অন্য সুরে কথা বলে। যেন সবাই রবির জন্যে কতই হেসেছিল।

--এই যে রবি, চেহারাটা যেন রোগা রোগা দেখছি?

--অ রবি, ছিলে কোথায়?

এমনি সব কথা।

নয়নচাঁদ অবশ্য রবিকে বেজায় ভয় পায়। ওর বাবা বলে, রবির অসাধ্য কাজ নেই।

নয়নচাঁদের বাবা এ কথাও শুনেছে যে থানার দারোগাবাবুর রবির ওপর খুব

রাগ আছে। তিনি সর্বদা বলেন, বেটা কাজ সারে কৌশলে। নিজে থাকে আড়ালে। অসৎদের দিয়ে কাজ সারায়। একবার বাগে পেলে ওকে সর্ষেফুল দেখাব।

অবশ্যই গ্রামের বেকার ছোকরাদের মধ্যে রবির সমর্থক অনেক। মাঝে মাঝেই যে দরাজ হাতে চাঁদা দেয় ক্লাবে। যাত্রাপালা আনতে টাকা দেয়, তাকে সবার পছন্দ।

রবির পিসি সুখীঠাকরুণ হলেন হাড়কিপটে লোক। মস্ত বাগান তাঁর, তা দেখতে লোক রাখবেন না। নিজে ঘুরে ঘুরে কাঠপাতা এনে রাঁধবেন, কলাটা-মোচাটা ডুমুর পাড়িয়ে বেচতে পাঠাবেন। আর যে পয়সা পাবেন, সব জমাবেন।

রবি বলে, কার জন্যে জমাচ্ছ?

--তোর জন্যে।

--জমাও, জমাও, আমি সব উড়িয়ে দেব।

—দিলে পরে পেতনি হয়ে তোর ঘাড় মটকাব।

--দেখা যাবে।

পিসির বাগানের কোলে নয়নচাঁদদের ঘর। নয়নচাঁদের বাবা ছাড়া পিসির চলে না। ফলতরকারি পেড়ে দেয়, বাজারে বেচে আসে, পাই পয়সা বুঝিয়ে দেয়, তারপর চারটি চাল ভাজা বা মুড়ি নিয়ে চলে আসে।

নয়নের মা বলে, তোর বাবা মস্ত বোকা।

পাড়ার লোকরাও বলে, বুড়ির পয়সার পাহাড় জমছে। তা তোমাকে খাটিয়ে নেয়। কিছু দেয় না কেন?

নয়নের বাবা বলে, ও বাবা! অধর্ম হবে।

—তা বলে এমন করে ঠকবে?

—নয়ন যেদিন স্বপন দেখবে যে আমি রাজা হইছি, সেদিন আমার দুঃখু যাবে।

নয়নচাঁদ স্বপ্ন দেখলে সে স্বপ্ন ফলে যায়। কবে যে মতিবাবুর নতুন কেনা গরু হারিয়েছিল আর ছোট্ট নয়ন সকালে বলেছিল, সে গাই তো বসিরকাকা গোহাটে নিয়ে যাচ্ছে, আমি স্বপ্ন দেখিছি।

স্বপ্ন দেখেছিল, না ভোরে ধানক্ষেতে গিয়ে বসিরকে দেখেছিল তা কেউ ভেবে দেখেনি। বসিরের খোঁজ করতে গরুও মিলেছিল। মতিবাবু, 'মুড়ি কিনে খাস' বলে নয়নকে দুটো টাকা দিয়েছিল।

সেই থেকে রটে গেল যে নয়নচাঁদের স্বপ্ন বড়ই সত্যি হয়। শুনতে শুনতে নয়নচাঁদও সে কথা বিশ্বাস করে।

ইশ্! এমন স্বপ্ন কেন যে দেখে না নয়ন, যেমন স্বপনে ওর মা আর বোন গুগলি ঝিনুক আনার জন্যে আর কোমর জলে কাদা সেঁচে না? যেমন স্বপনে ওর মা একটা গোটা শাড়ি পরে উঠোনে ধান শুকোয়? বোনটা ইস্কুল যাবার পথে পথের ধুলোয় আঁক কেটে এক্কা দোক্কা খেলতে খেলতে ইস্কুল পৌছে যায়?

যেমন স্বপনে ওদের ঘরটা হয় নতুন ঝকঝকে। ওর বাবা নয়নকে নিয়ে বলদ হাঁকিয়ে নিজের জমি চষতে যায়?

. যেমন স্বপনে সকালে পান্তা ভাত, দুপুর আর বিকেলে গরম ভাত জোটে থালা থালা?

তেমন স্বপন নয়ন কখনো দেখে না। দেখে না বলেই তো ওদের কষ্ট ঘোচে না। ধর্মপথে থাকবি বাপ!--বলে ওর বাবা বেরিয়ে যায় কাজের খোঁজে। আর ছোট বোনটা বলে, রোজ রোজ জল ঘাঁটব, তা পা যে হাজা হয়ে গেল। এক বোতল কেরোসিন পেলে গরম করে পায়ে মাখতাম।

ধর্মপথেই তো থাকে নয়ন। সুখী পিসির বাগানের ঝোপ থেকে দেখে দেখে তাক করে মেটে আলু খুঁড়ে তোলে, তেলাকুচো ফল পেড়ে আনে। যে লোক তুলে কিছু দেবে না, তারটা চুরি করেই নিতে হয়। বাবা জানলে অনর্থ করে। নয়ন সব কোঁচড়ে নিয়ে দৌড়য় খেড়োখালের ওপারে চাঁদ মাঝির বাড়ি। চাঁদ মাঝি সব কিনে নেয় আর নয়নকে দেয় চাল।

চাঁদের একটা সাইকেলের পিছনে মাচায় বাঁধা গাড়ি আছে। যেখানে যা পায় সব কিনে নেয় চাঁদ, সব বেচে আসে রাণীতলার বাজারে। নয়নকে ও খুব বিশ্বাস করে। নয়ন জানে যে চাঁদ মাঝি পয়সা জমাচ্ছে, তিন চাকার ভ্যান গাড়ি কিনবে।

তেমন গাড়ি কিনলে চাঁদ ওকে এই সাইকেলটা দেবে। নয়ন তখন কেনাবেচা ব্যবসা করবে। ব্যবসার টাকা থেকে ধীরে ধীরে চাঁদকে সাইকেলের দাম দেবে।

কেন দেবে বল তো?

নয়নের ইস্কুলে যাওয়াটা চার ক্লাসের পর আর হয়নি। কিন্তু অঙ্ক হিসেবে ওর মাথা খুব সাফ।

চাঁদ হিসেব করতে পারে না, লেখাপড়াও জানে না। ওকে হিসেব করে দেয় নয়ন। নয়ন সঙ্গে থাকে, যেদিন চাঁদ অনেক জিনিস নেয়। গ্রামের মেয়েরাও নিজেরা বাজারে যাবার চেয়ে চাঁদের কাছে কলাটা-থোড়মোচাটা কলাপাতা-ডুমুর-থানকুনি শাক — এ সব দিয়ে পছন্দ করে।

বাঙালী হয়ে গেছে একদম, তবু ও মাঝি, যাকে বলে সাঁওতাল! না, ঠকাতে ও জানে না।

চাঁদ বলে রেখেছে, বুড়িটা মরলে ওর শয়তান ভাইপোটা, যার নাম রবি, যে কান ঢেকে চুল আঁচড়ায় আর চোখে কালো চশমা এঁটে গ্যাটম্যাট করে ঘোরে, সে তোদের তাড়িয়ে দেবে। তখন তোরা আমাদের পাড়ায় চলে আসবি।

সুখী পিসি মরে যাবার কোনো লক্ষণ নেই বটে এখনো। এখনো পিসি এক বাটি মুড়ি খায় কাঁঠাল মেখে, নারকোল পাতা চেঁছে কাঠি বের করে সারা দুপুর।

পিসির বাড়িতেই গিয়েছিল নয়ন। বাবার জ্বর।

--পিসি! বাবার বড্ড জ্বর, আসতে পারবে না।

--বটে! তা আমার আমড়াগুলো বেচবে কে, শুনি!

--আমি চাঁদ মাঝিকে দিয়ে আসব?

--না না, তুই যা।

--বাবার যে বড্ড জ্বর!

--তোর তো জ্বর হয়নি।

--বাবাকে দেখাতে নিয়ে যাব।

--কে রে ছোঁড়াটা? বকরবকর করে কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিল?

রবি বেরিয়ে এল, বিরক্ত মুখ। চোখ দুটো লাল। ভুরু কুঁচকে বলল, অ! নয়নচাঁদ! তা তুই যাবি না কেন? অ্যাঁ? যার বাড়িতে থাকিস, তার কথা শুনবি না?

--বাবার জ্বর যে!

--জ্বর যে! ছোটলোকের মরণ! কোথায় কি নেশা করে রাত করেছে, জ্বর হয়েছে।

নয়ন এ কথা শুনে রবি যে কত ভয়াবহ, তা ভুলে গেল। সদর্পে বলল, মিথ্যেকথা! আমার বাবা কখনো নেশা করে না। কাল জল ঘেঁটে গুগলি তুলেছে বলে জ্বর হয়েছে। বাবার শরীর তো অসুস্থ ছিলই।

--কি আমার কথার ওপর কথা?

পিসি দেখ্ দেখ্ করতে করতে রবি নয়নের গালে একটা প্রচণ্ড চড় মারল। নয়ন ছিটকে পড়ল উঠোনে। রবি বলল, তোদের গুষ্টিকে তাড়াচ্ছি কালই।

নয়নের কপালটা কেটেছে, গাল ফুলে উঠেছে। পিসি বিরস গলায় বলল, জানিস তো ওর মেজাজ কেমন! একটু রয়েসয়ে কথা বলতে পারিস না? ফট করে মিথ্যেবাদী বলে বসলি?

যা বাড়ি যা।

নয়ন আগে আস্তে আস্তে পুকুরে গেল। খুব করে জল দিল কপালে, গালে। তারপর বাড়ি গেল। ওকে দেখে মা মুখে আঁচল চাপা দিল। নয়ন খেঁকিয়ে বলল, কাঁদবে না তো, মোটে কাঁদবে না। --বাবাকে বল, চলো। ধরে ধরে নিয়ে যাই।

বাবাকে ডাক্তার দেখাতে, ওষুধ নিতে বেলা গড়াল। ডাক্তার বলল, টাকা কালই দিয়ে যান।

--দেব।

বাবা বলল, পাবি কোথা?

--তুমি বোকো না তো?

বাবাকে শুইয়ে রেখে নয়ন বলল। আমি যাচ্ছি। আসতে অনেক দেরি হবে বলে গেলাম।

--কোথায় যাবি?

--মাঝিপাড়া। এখানে থাকব না আর। ঘর তুলে নিয়ে চলে যাব। আর তুমি ও বাড়ির কোন কাজে যাবে না।

--বুঝেছি।

--কি বুঝলে?

--বুঝেছি যা বুঝবার।

নয়ন বেরোল। রাগে গা জ্বলছে, খিদেয় পেট। রবিকে ঠিক ওইরকম একটা চড় মারতে পারলে আশ মিটত। কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব?

এখন নয়ন খেড়োখালের ধারে যাবে। চাঁদ তখন মনে নেই, মাঝিপাড়া যাবে না। খেড়োখালের ধারে খেয়া মাঝির ঘরটা আছে। খালের ওপর সাঁকো হবার ফলে খেয়া পারাপার বন্ধ হয়ে গেছে। সাঁকো ওইদিকে। ঘরটা এদিকে। ওই ঘরে শুয়ে শুয়ে নয়ন একটা জুতসই স্বপন দেখবে। যে স্বপনের জোরে ওই রবিকে কষে জব্দ করা যায়।

ঘরটা পোড়ো হয়ে এসেছে, তবে মেঝেটা সাফ। নয়নরা, সমবয়সী ছেলেরা, এ ঘরে মাঝে মাঝে গুলতুনি করে। ওরাই সাফ রাখে। চরের চালে ঘরমোনা সাপ আছে বটে, তবে ও সাপ তো ঘর আগলে রাখে. কামড়ায় না।

ঘরের মেঝেতে শুয়ে শুয়ে নয়ন চোখ দুটি বুজে খুব ডাকতে লাগল, ঠাকুর! ঘুম দাও, স্বপন দাও!

কে জানে কোন্ ঠাকুর কোন্ দেবতা খেড়োখালের জলধোয়া বাতাসের সঙ্গে নয়নের চোখে ঘুম ঢেলে দিল। খুব ঘুম. খুব গাঢ় ঘুম। ওর ঘুমের মধ্যেই কখন যেন সূর্য ডুবল। আঁধার নামল।

একসময়ে ঘুম ভাঙল নয়নের। ওঃ, গায়ে বৃষ্টি লাগছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি। গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি আর খুব বাতাস। এখন জলবাতাসে ছাইকোন হয়। তাই হোক. ছাইকোন হোক। খুব ছাইকোন হলে বাবুরা শহর থেকে আসবে খিচুড়ি খেতে দেবে। নাঃ। কোনো স্বপ্ন দেখেনি নয়ন। কি দুঃখ! কি দুঃখ!

নয়ন বেরোল। তারপরেই চমকে উঠল! দুটো লোক কথা বলছে। কে? কে ওরা? আরে! এতো রবির গলা। আরেকজন কে? রবির চেলা বেল্না।

--পিসি টের পাবে না তো?

--না না, ভীমের মত ঘুমুচ্ছে।

--তুমি সরালে কি করে অত বাসন?

--আসছি, যাচ্ছি। ছাঁচ তুলে চাবি করেছি।

--ওঃ, কি ভারি বস্তা!

থাকল বস্তা খালে পোঁতা, ভাঙা নৌকার নিচে।

--সরাবে কবে?

ট্রাক আনবে তো সরল। ইট আসবে না? সেই ট্রাকে সিধে রাণীতলা। তারপর পালাব।

--চাবিটা?

--সে তুই ভাবিস না বেলুন। সর্বদা কোমরে দড়ি বেঁধে রাখি।

--পিসি টের পেলে...

--আমি এখন বিপাকে পড়েছি তো। শহরে যেতে পারছি না, খগেন, রাজা, সব ধরা পড়েছে তো! কে জানে তারা পুলিসকে কি বলবে।

--এখানে কেউ ওগুলো...

--কাল হেথা ছিপ নিয়ে বসতে হবে, যেন মাছ ধরছি। ওঃ, সেকেলে বাসন সব!

--দুজনে নইলে আসতে হত না।

--সে তো বটেই।

--আমাকে দেবে তো?

--দেব দেব, নিশ্চয় দেব। টাকাপয়সা হাতে নেই, নইলে কি আর...

কথা বলতে বলতে ওরা চলে যায়। নয়নচাঁদ আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে। ওরা চলে গেলে ও বাড়ি যাবে। খাবে, ঘুমোবে, রাত পোহাতে দেরি কত?

সকালে সুখী পিসির কান্না শুনে গ্রামের লোকজন এসে পড়ে। পিসি পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেছে, ওগো আমার ঠাকুর্দার ঘড়া গো! ওগো আমার দিদির তামার ঘটি গো! ওগো আমার খাগড়াই কাঁসার থালা গেলাস গো।

রবি যত বলে, চুপ করো! --পিসি তত চেঁচায়। ক্রমে ক্রমে ভিড় জমল। সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে। তালার মত তালা বন্ধ। চুরি হল কেমন করে?

অবশেষে চৌকি থেকে পুলিস এল। রবি বলল, ওই নয়ন! তার বাপ পিসির কাছে আসে যায়। আমি তো মোটে থাকি না। এ নিশ্চয় তারই কীর্তি। পিসি আমার মত সোনার চাঁদকে বিশ্বাস করে না। ওদের ঘরে ঢোকায়।

রবি মনে মনে তখন হাত কামড়াচ্ছে। সে কেন তালা বন্ধ করল আবার? তালা খুলে রাখলেই পারত?

আসলে রবি ভেবেছিল চুরির ব্যাপারটা বুঝতে পিসির দু' চারদিন যাবে। পিসি দোর খুলেই যে চেঁচাবে তা সে মোটেই বোঝেনি। ইশ্! তালা খোলা রাখলে বাইরের চোরের ঘাড়ে চাপানো যেত।

দারোগা মুচকি হেসে বলল, এই যে রবি বাবু! আপনি থাকতে এমন কাণ্ড হল।

--মানে...মানে...

এমন সময়ে নয়নের বাবা আর মা নয়নকে টানতে টানতে এনে হাজির করল।

--নয়ন কি স্বপন দেখেছে শুনে নিন হুজুর।

----অ্যাঁ, স্বপন?

গ্রামের লোকরা বলল, ও স্বপন দেখলে তা সত্যি হয় বটে। এ এক আশ্চর্য ক্ষমতা।

নয়ন আঙুল তুলে রবিকে দেখিয়ে বলল। ও চুরি করেছে। স্বপন দেখলাম ও আর বেলুন...ওব কোমরে দড়ির সঙ্গে চাবি বাঁধা আছে।

--বটে? মাল কোথায়?

--খেড়োখালের জলে। ভাঙা নৌকোর নিচে কাদায় পোঁতা আছে।

রবি পালাবার চেষ্টা করছিল। দারোগাবাবু তাকে ধবে ফেলল। ছি রবিবাবু, পালায় না।

বাসনের বস্তা বেরোল। রবি আর বেলুনকে নিয়ে দারোগা রওনা হল। রবি বলল, ফিরে আসি। তারপর তোকে দেখে নেব।

সুখী পিসির মাথায় হাত। শেষ অবধি ঘরেই চোব। গ্রামের লোকজনও কিপটে বুড়ির ওপর হাড়ে চটা, তারা বলল, যার জন্যে সব ফেরত পেলে ওকে কিছু? হাজার হাজার টাকার বাসন তোমার? একশোটা টাকা দাও?

টাকাটা হাতে নিয়ে নয়ন বাবা মার সঙ্গে বাড়ি এল। আজকের দিনটা কাটলে কালই মাঝিপাড়া পালাব বা ওদের কাছে চেয়েচিন্তে ঘর তুলে নেব। জমিতো ওদেরও নেই, আমাদেরও থাকবে না। তবু ওখানে যাব। রবিদের সংস্পর্শে আর নয়। ওদের কাছে থাকলে রবিও খানিক ভয় পাবে হামলা করতে। মাঝিরা ওকে ঢুকতে দেয় না পাড়ায়।

বাবা বলল, একশো টাকা কখনো হাতে ধরিনি. তুই ধরলি।

--তুমি আর আমি শাকসবজি কেনাবেচা ব্যবসা করব, কেমন বাবা?

বাবা বলল, তাই হবে। সার্থক তোর স্বপন দেখা।

একলা

সন্ধে বেলা টেলিভিশন দেখছিল তিলক, মা বাবা গেছেন বাজারে। শনিবার বাজার করার দিন। বাজার করে বাবার প্রাণের বন্ধু বিশু কাকার বাড়ি ঘুরে আসতে আসতে সাতটা বাজবে।

তিলককে বারবার বলে গেছেন, দরজা খুলবে না, বেল বাজলে দেখে নেবে আমরা কি না, হেন তেন কত কথা!

টেলিভিশনে যে ছবিটা হচ্ছিল, সেটা মোটেই ভালো লাগছিল না তিলকের, তবু ও দেখছিল। একটা গোঁপঅলা লোক ধান কাটছে আর গান গাইছে তো গাইছেই। এর চেয়ে অ্যাডভেঞ্চারের ছবি কত ভালো!

হঠাৎ অবাক কাণ্ড। গোঁপ নেই, গান নেই, ধান নেই, তিলকের বয়সী একটা ফচকে মতো ছেলে টেলিভিশনে দাঁড়িয়ে।

এই তিলক!

তিলক তাজ্জব। এটা কি সিনেমার একটা অংশ, না অন্য কিছু?

বাড়িতে কেউ আছে?

তিলক কিছু না ভেবেই বলল, কেউ নেই। আমি আর আমার বেড়াল মৌরি আছি।

তাই বলো!

ছেলেটা টেলিভিশন থেকে লাফিয়ে নেমে এল। তারপরই ও তিলকের মতো লম্বা হয়ে গেল। খালি গা, পরনে হাফপ্যান্ট, চুল ঝাঁকড়া, মুখে হাসি। বলল, ভয় পেলে না তো?

তিলক বলল, সিনেমাটা কোথায় গেল?

গোঁপঅলা লোকটাকে সত্যিকারের ধান ক্ষেতে পাঠিয়ে দিলাম। এখনো গাঁক গাঁক করে গান গাইছে অবশ্য, তবে গ্রামের লোকরা এখনি বেরিয়ে এসে ওকে ওষুধ দেবে।

ওষুধ?

আহা ওই আর কি! সন্ধে বেলা 'ওরে আমার ধান রে' বলে গান গাইলে ছেড়ে দেবে?

ওরা কি করছে দেখবে?

অ্যাডভেঞ্চার! অ্যাডভেঞ্চার। কিন্তু তিলক বলল, তোমার নাম কি? ব্যাপারটাই বা কি?

আমার নাম একলা।

একলা?

হ্যাঁ, একলা। তোমাদের অ্যান্টেনায় বসেছিলাম। যেই বুঝলাম তুমিও একলা, সেই নেমে এলাম। একলা থাকতে কার ভালো লাগে বলো?

তার মানে, তুমি কি অন্য গ্রহ থেকে...

ছেলেটা যেন সে কথা শুনতেই পেল না। খুব চিন্তিত মুখে বলল, গোঁপকে তো পাঠালাম। এখন বেচারা কি করছে দেখা যাক।

কেমন করে দেখবে?

বা, টেলিভিশন রয়েছে না?

তিলকের পাশেই বসে পড়ল ছেলেটা। আর কি আশ্চর্য, কি আশ্চর্য ! টেলিভিশনে এখন একেবারে অন্য দৃশ্য। একটা মুদিখানার সামনে অনেক লোকের ভিড়। একজন গম্ভীর চেহারার লোক লুঙ্গি পরে দাড়িতে হাত বোলাচ্ছেন, গোঁপবাবু কাঁদ কাঁদ মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

আপনি এলেন কোথা থেকে, অ্যাঁ?

বিশ্বাস করুন, আমি আসিনি।

তার মানে?

আমি যে সিনেমাটায় চাষী সেজে ধান কাটছি, গান গাইছি, সেটা টেলিভিশনে চলছিল.. বলতে কি, আসল আমি তো এখন কলকাতায় তাস খেলছি।

পাগল না কি?

বিশ্বাস করুন! আমার নাম বিজয়েন্দু মিত্র। সব ছবিতে আমি চাষী সাজি আর ধান কাটি আর গান গাই।

গাঁ গাঁ করে গান গাইছিলেন কেন?

ধান কাটছিলাম যে।

একটা ষণ্ডা মতো ছেলে বলল, বটে! ধান আমরা কাটি না? তখন গান গায় কে?

সবাই বলল, গান কে গায়? অ্যাঁ?

সাদা জাঙিয়ার ওপর গামছা পরে ধান কাটা আর গান গাওয়া?

আমাকে আপনারা যেতে দিন।

লুঙ্গিঅলা বললেন, কাস্তেটাও তো টিনের। ধান চোর?

না, ক্ষেতে তো ধান নেই। বুঝলেন, আপনি পাগলই হবেন।

তবে তাই। আমাকে যেতে দিন।

কোথায় যাবেন?

কেন, কলকাতা?

কলকাতা!

সবাই গড়িয়ে গড়িয়ে হাসল। লুঙ্গিঅলা বললেন, কোথায় এসেছেন, জানেন?

না, সার। আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে।

এটা মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমার গোপালপুর গ্রাম। ষোল মাইল বাসে গেলে কাঁথি, সেখান থেকে বাসে চাপলে কলকাতা, আর বর্ষা পড়েছে, কাঁথির বাসও পাবেন না।

গোঁপবাবু কাঁদতে থাকল।

তিলক বলল, এই! এটা কি হচ্ছে?

থাকুক না। আবার ঢুকিয়ে দেব ছবিতে। ওটা বন্ধ থাকুক, এসো গল্প করি। এটাই তোমার বেড়াল? বাঃ বাঃ! মৌরি নাম কেন রেখেছ?

নামের আবার কেন কি? তোমার নাম একলা কেন?

একলা মুচকি হেসে বলল, একলা নাম বলেই তো যারা একলা থাকে তাদের কাছে যাই।

বাঃ, যেখানে ইচ্ছে যেতে পার?

নিশ্চয়।

আমার ঠাকুমার কাছেও?

অবশ্যই। দাঁড়াও, ঠাকুমা...বারুইপুর...একতলা বাড়ি...সুপুরি কাটছেন...একটা কালো সিড়িঙ্গে লোক উঠোনে খড় কুঁচোচ্ছে।

হ্যাঁ, চিতুদা। ঠাকুমার তিনটে গরু, তাই ঠাকুমা কলকাতা আসতে চান না।

যাব, উনি একলা থাকলে যাব। মৌরি! মৌরি!

ওঃ, কি ঘুম ঘুমোচ্ছে।

মৌরি আড়ামোড়া ভেঙে উঠে বসল। তারপর হাই তুলে পরিষ্কার বেড়াল বেড়াল গলায় বলল, ঘুমোতে আর দিলে কই? সেদিন ছাতেও ঘুমোতে দাওনি। তুমি একটা যাচ্ছেতাই!

তার মানে? মৌরি কথা বলল?

শুনলেই তো।

আমার সঙ্গে কথা বলবে?

মৌরি বলল, কি কথা বলব? তোমাদের বুদ্ধি এত কম, তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে আমার হাসি পাবে।

এই না বলে মুচকি হেসে মৌরি বেরিয়ে গেল।

তিলক বলল, তুমি তো বেজায় বাঁদর।

বোলো না, বাঁদর বোলো না, দেখতে পাচ্ছ, অমনি আমার লোম গজাচ্ছে, লেজ গজাচ্ছে....

কি সর্বনাশ! না না, বাঁদর নও। লোম গজিয়ে বাঁদর হয়ে যেওনা। মৌরি কথা বলছে... সিনেমার সব ভণ্ডুল তাতে তুমি বাঁদর হয়ে গেলে...মা বাবাকে আমি বলব কি?

বলবেই বা কেন? মা বাবাকে কি তুমি সব কথা বলো?

নিশ্চয়!

বটে! গুলতি মেবে সামনের বাড়ির জানলার কাচ ভেঙেছ, বলেছিলে? স্কুলে তো রোজ ফুচকা খাও, সে কথা বলো? আর খেলতে নামলে বন্ধুদের পায়ে ল্যাং মারে কে? কায়দা মেরে মেরামত করতে গিয়ে ঘড়ির অ্যালার্ম কে নষ্ট করেছে?

আশ্চর্য, আশ্চর্য! তুমি সব জানো?

একলা বলল, স--ব। তোমার মতো কতো একলা ছেলের হাঁড়ির খবর রাখি।

আচ্ছা...তুমি সত্যি তো?

তবে কি ভূত ভাবলে না কি?

অ্যান্টেনা দিয়ে ঢুকে পড়া...

ভূতদের কি এ রকম হাত থাকে? পানজা লড়ো, দেখো।

না, রীতিমতো মানুষের হাত। পানজা লড়ে একলা তিলককে হারিয়েই দিল।

অ্যান্টেনায় বসে থাকো কি করে?

আহা, অ্যান্টেনা থেকে অ্যান্টেনাতে...

থাকো কোথায়?

একলা বলল, যখন যেখানে ইচ্ছে। চিড়িয়াখানায় পাণ্ডাটা একলা মন খারাপ করছিল, ওর কাছে ক'দিন ছিলাম। তবে রাতে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পরীটার কাছেই যাই। সেও তো একলা!

বেচারা!

মোটেই বেচারা নয়। সায়েবদের বসানো, এখনো সাহেবী মেজাজ কি! কেন কলকাতা নোংরা হয়ে যাচ্ছে, কেন ময়দানকে ছোট করে ফেলা হচ্ছে, কেন গাছ কাটছ তোমরা, একশো রকম বায়নাক্কা।

আমাকে একদিন নিয়ে যাবে?

মোটেই না।

তবে, তবে তুমি এখানেই থাক না?

একলা হেসে বাঁচে না।

বাবা মাকে কি বলবে? টেলিভিশন থেকে বেরিয়ে এসেছে, এ আমার বন্ধু?

কেন, বানিয়ে বলব কিছু?

তুমি না বাড়িতে মিথ্যে কথা বল না?

বেশ, সত্যি কথাই বলব।

বিশ্বাস করাতে পারবে? ভাবতে পারো, বড়দের এ সব কথা বলছ, বড়রা বিশ্বাস করছে?

না, বড়দের বিশ্বাস করানো অসম্ভব। বড়রা কোনো কথাই বিশ্বাস করতে চায় না। এই যে তিলক বাবাকে বলল, 'টেরোড্যাকটিল কাকের চেয়ে বড় ছিল না,' —সে তো বই পড়ে তবে বলেছিল? বাবা অমনি বলল, 'বাজে কথা বোল না।'

তিলকের হাত পা একটু বেশি কাটে। খেলতে গিয়ে পড়ে গেলাম,' নয়তো 'টিকলু ধাক্কা দিল' বললেই মা বলেন, 'বাজে কথা বোল না। নিশ্চয় নিজের দোষেই হাত পা কেটেছ!'

বিশুকাকার কথা শুনলে তো গা জ্বলে যায়। 'তিলক! তোর নাম কাগজে উঠবে। দশ বছর হতে না হতে এতবার হাত পা কাটলি, পা ভাঙলি, মাথা ফাটালি, ওঃ, যেন যুদ্ধের সোলজার।'

বুঝতে পারছ তো? বাবা, মা, বিশুকাকা, কেউ তোমার কথা বিশ্বাস করবে না। মৌরি কথা বলছিল, তা বলেই দেখো।

আমি কি ভাবছি তা বুঝতে পারছ কেমন করে? বল না, কেমন করে বুঝলে?

একলা যেন সে কথা শুনতেই পেল না।

যাক গে, তোমার বাবা মা এখনি এসে পড়বেন। ততক্ষণে তোমার স্কুলের কথা শোনা যাক।

স্কুল! স্কুলের কথা শুনে কি হবে?

অঙ্ক স্যারের জন্যে স্কুলের ওপর রাগ?

আর বোল না। যা গাঁট্টা মারেন!

ওঁকে একটু মজা দেখানো যাক!

কেমন করে?

দেখই না।

একলা টেলিভিশনে কি খুটখাট করল। তারপরেই এ কি দৃশ্য! সেই একটু টাক ঘিরে খানিক চুল, সেই ভুরুর ওপর আঁচিল, সেই ঢোলা প্যান্ট আর বুশ শার্ট, অঙ্ক স্যার, অঙ্ক স্যার, সন্দেহ নেই কোনো। কিন্তু হুগলীর ইমামবাড়ার ঘাটে বসে উনি কাঁদছেন কেন?

বলো, ওঁর সঙ্গে কথা বলো।

শুনতে পাবেন?

বলেই দেখ।

ভয় করছে।

ভয় পাচ্ছ?

তুমি বলো না।

তোমাকে দেখতে পেলে ভালই হত। ব্যাপারটা কি জানো। যে কথা বলবে তাকেই উনি দেখতে পাবেন।

তারপর স্কুলে গেলে?

কি হবে! আচ্ছা আমিই দেখছি। এই যে, গোপেশ সাব! অঙ্ক সার?

অঙ্ক সার তাজ্জব।

কে হে তুমি?

আপনি কি করছেন ওখানে?

তুমি কি আমার ছাত্র?

না না। আমি হলাম শ্রীমান একলা। এখন আমার জিজ্ঞাস্য টেলিভিশনে আপনাকে দেখতে পাচ্ছি কেন? আপনার জ্বালায় কি ছবি দেখাও যাবে না? এই জন্যে পাড়ায় আপনাকে বলে গোপেশ চটপটি। চটপটির মতোই ছিটকে বেড়ান তো!

টেলিভিশন! আমি! এ সব ভূতুড়ে কাণ্ড, ভূতুড়ে কাণ্ড। আমি সবে চা কিনতে বেরোচ্ছিলাম.....

চা কিনতে চুঁচড়ো?

হঠাৎ কেমন মাথা ঘুরে গেল, তারপর দেখি আমি এখানে! ও বাবা! ভবানীপুর থেকে চুঁচড়ো কেমন করে এলাম!

কেন আসবেন না? এটা আপনার শাস্তি।

কেন বাবা, শাস্তি কেন?

গত সাতদিনে আপনি উনিশটা ছেলেকে টকাটক গাঁট্টা মেরেছেন, তিনজনের অঙ্ক খাতায় নস্যি ফেলেছেন,আর সাতদিনে চারবার বাসের ভাড়া ফাঁকি দিয়েছেন, আর কলা খেয়ে রাস্তায় খোসা ফেলে নিজের ছেলের ঠ্যাং ভেঙেছেন বলতে গেলে স্বহস্তে।

তুমি কে বাবা! দেবতা?

আমি একলা।

আমাকে বাড়ি ফিরিয়ে দাও বাবা!

চুঁচড়ো থেকে কলকাতা, যান, চলে যান। পকেটে চা কেনার টাকা তো আছেই। মনে রাখবেন, গাঁট্টা যত মারবেন, শাস্তি তত জবর হবে। এরপর লাদাকে পাঠিয়ে দেব।

দিও না বাবা, একে ঠান্ডা, তায় ফিরতে পারব না। ভয়ে মরে যাব।

এবারকার মতো ছেড়ে দিতে পারি, তবে, যেদিন ক্লাসের সকলকে অন্তত মিষ্টি খাওয়াবেন, সেদিন জানব আপনি সত্যি ভালো হয়ে গেছেন।

ফিরিয়ে দাও বাবা!

ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করছেন কেন? পকেটে পয়সা আছে, চলে যান!

টেলিভিশন বন্ধ করল একলা। তারপর দারুণ একটা পোজে দাঁড়িয়ে বলল, দেখলে?

তিলক উত্তেজনায় তোতলা হয়ে গেল।

সত্যি, সত্যি উনি আমাকে দেখতে পাননি? একলা তোমায় দেখেছেন?

একলা একলাকেই দেখেছেন। কিন্তু তুমি এত ভিতু কেন? যে সব ছেলে খানিক খানিক একলা থাকে, তাদের কি ভিতু হলে চলে? আমি এলাম বলে তাই! চোর ঢুকলে কি করতে?

চেঁচাতাম।

সাহস চাই, সাহস, বুঝলে?

তোমার মতো যদি হতে পারতাম!

বাড়ির জন্যে কাঁদতে।

একলা!

বলো।

তুমি কে, একবারটি বলে যাও।

পরের দিন হবে। এখন আমার যাওয়া দরকার, বুঝেছ?

একলা ওর মাথায় গায়ে আঙুল বোলাতে থাকল। ওর আঙুলের ছোঁয়াতে তিলকের শরীর ঢেলে যেন আরাম নেমে এল। চোখ বুজে এল ওর।

ঘুম ঘুম গলায় ও বলল, একলা!

বলো?

তুমি কি আমাকে হিপনোটা...

কথাটা শেষই করতে পারল না তিলক। একলা যেন কত দূর থেকে বলল, হিপনোটাইজ করছি না, ঘুম পাড়িয়ে রেখে যাচ্ছি। বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময়ে আমারো তো মন খারাপ হয়, তোমার যেমন হচ্ছে!

তুমি কোথায় যাচ্ছ?

আর কথা নয়।

তিলক ঘুমিয়ে পড়ে। মৌরি ওর কাছে এসে শুয়ে পড়ে, তিলক তা জানতেও পারে না।

বেল বাজিয়ে বাজিয়ে শেষে দরজা ধাক্কা দিয়ে হাঁকডাক করে তিলকের বাবা মা ভিড় জমিয়ে ফেললেন বলতে গেলে। এপাশ ওপাশের ফ্ল্যাটের সবাই বেরিয়ে এল।

তিলক আছে, সাড়া দিচ্ছে না কেন?

তিলকের মা তো কেঁদেই ফেললেন। আর সামনের বাড়ির অরুণবাবু বললেন, সবাই চুপ করুন তো! বিকাশ, তুমি আর আমি একসঙ্গে ডাকি। ঘুমোয় যদি, জাগবে। তাতেও দরজা না খুললে দরজা ভাঙতে হবে।

তাই ভাঙা হোক। নিশ্চয় ওর কোনো...

সেই বিকট গর্জনে 'তি-ল--ক' শুনে তিলক যদি দরজা না খুলত, তাহলে দরজা ভাঙতেই হত। দরজা খুলতেই সকলের কি হাঁউমাউ। বড়রা একেবারে যাচ্ছেতাই। দরজা না খুলতে সবাই নাকি তিলকের কি হয়েছে ভেবে মরে যাচ্ছিল।

দরজা খোলার পর?

কি হয়েছিল? দরজা কেন খুলছিলি না?

তিলকের বাবা যেন চোঙা হেঁকে বলেন।

ঘুমোচ্ছিলাম।

ঘুমোচ্ছিলি? এ কি ঘুম!

অরুণবাবু হাত জোড় করে বলেন, ধন্য ধন্য কুম্ভকর্ণ! বাপ রে বাপ! কলিকালে এমন ঘুম কেউ দেখেনি। যাকগে মজুমদার, তোমার দরজা ভাঙতে হয়নি।

মিসেস শিবপুরী ডাক্তার। তিনি মিহি গলায় বলেন, লেড়কা যদি সিরিফ ভাত খায়, ঘুম তো হবেই।

তিলকের মা ভাবছিলেন তাঁর প্রাণের ছেলেটির কি না কি হয়েছে। কিছু হয় নি দেখে খুশি হও। না, তিনিও চেঁচাতে থাকলেন, ঘুম? এর নাম ঘুম?

জনগণের মুখ দেখেই তিলক বুঝল যে একলার কথা এদেরকে বলাই যাবে না।

ঘরে ঢুকেই মা টেলিভিশন খুললেন।

আবার সেই হতচ্ছাড়া ছবি। কিন্তু অবাক, অবাক কাণ্ড, গোঁপ এখনো ধান কাটছে, কিন্তু মুখে গান নেই তো বটেই, বিড়বিড় করে বলে চলেছে।

গান নয়, গান নয়। আর গান নয়।

তিলকের মা বললেন, এ আবার কি? শেষ দৃশ্যে 'ও আমার ধান রে' গানটা আবার গাইবে...

বাবা বললেন, থামো তো! যেমন মিউজিক, তেমনি তোমাদের ঝন্টু গাঙুলির গান!

তিলক বলতে পারত যে যারা ধান কাটে তারা কখনোই ও রকম গান গায় না, কিন্তু বলল না।

একলা কি এসেছিল? একলা কি আসেনি? তিলক কি ঘুমের ঘোরে স্বপ্নই দেখেছিল?

স্বপ্নই হবে, স্বপ্নই হবে, কিন্তু স্বপ্ন কি?

এ কথা অস্বীকার করা যাচ্ছে না, যে পরদিন অঙ্ক সার স্কুলে আসেননি।

তার পরদিন এলেন যখন, কি পরিবর্তন! কি পরিবর্তন! গাঁট্টা নেই, নস্যি ঝাড়া নেই, মুখে শুধু 'বুঝেছ বাবা? এই দেখ, এমনি করে অঙ্ক করো', এমনি সব মধুর মধুর বুলি।

আর মাইনে পাবার পরদিনই বললেন, স্কুল বন্ধ হবার দিন তোদের রসগোল্লা খাওয়াব।

তাহলে তো একলা মিথ্যে নয়?

ছাতে গিয়ে অ্যান্টেনাগুলো অনেকবার দেখে তিলক, মনে মনে বলে, একলা, একলা, একলা!

কয়েক শনিবার তো একা একাই থাকল ঘরে, একলা কোথায়?

নিশ্চয় চলে আসবে কোনোদিন। মৌরি কান খাড়া করে লোম ফুলিয়ে বসে থাকে তিলকের পাশে। দুজনেই জানে যে একলা সত্যি, ভীষণ সত্যি।

সম্ভবত একলা এখন অন্য একলা ছেলেদের কাছে ঘুরছে। আবার একদিন হঠাৎ এসে হাজির হবে।

এবার তিলক ওর হাত চেপে ধরে থাকবে, আর পালিয়ে যেতে দেবে না।

একলা এবং ইমন

ইমন এখানে থাকেই না, ওর বাড়ি বাংলাদেশে। ঘুষঘুষে জ্বর আর চিনচিনে মাথাব্যথা নিয়ে ভুগছে তো ভুগছেই, সে জন্যেই ওর চাচার সঙ্গে কলকাতায় আসা। একলাকে নিয়ে আমি যে সব গল্প লিখেছি, তার একটাও ও বিশ্বাস করেনি নিশ্চয়। এবার কিন্তু ইমন আর সে কথা বলতে পারবে না। এবার ও একলার সঙ্গে অনেকক্ষণ কাটিয়েছে।

ওর ঘরটা বেশ ভালো। বিছানায় পাশ ফিরলেই ট্রেন দেখতে পারো। এ বাড়িটা ক্রিস্টোফার রোডে সি, আই, টি-র ফ্ল্যাটে। এখানে থাকেন চাচার নীলুদা আর টুলুদি, দুই ভাইবোন। চাচাকে ওঁরা ভীষণ ভালোবাসেন। ইমনকে তাই ওঁদের কাছেই রেখেছে চাচা। টুলুদি খুব ভালোবাসেন, কত রকম রেঁধে খাওয়ান।

কিন্তু চাচা তো আসে রাত করে, ঘুরে ফিরে। ইমনের অসুখটাও এমন যে নড়াচড়া করা বারণ। বই পড়ে কতটা সময় কাটানো যায়? সাতক্ষীরার কথা শুধুই মনে হয়। এখন আব্বার চেম্বারে রোগীর ভিড়, আর আম্মা ছোট বোন পিয়ালকে এখন ভাত খাওয়াচ্ছে। ইমন বাড়িতে থাকলে এতক্ষণে খেয়েদেয়ে শুয়ে থাকত। বিচ্ছিরি অসুখ, বিচ্ছিরি অসুখ। সব চেয়ে আগে খাও, খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ো।

আর ডাক্তার কি সাংঘাতিক লোক!

সব কিছু বারণ।

—ফুটবল খেলবে না।

—দৌড়দৌড়ি, লাফ ঝাঁপ করবে না।

—আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, ইলিশ মাছ তোমার যা যা ভালো লাগে কিছুই খাবে না।

—হালকা গরম জলে স্নান করবে।

—বেশিক্ষণ টি. ভি. দেখবে না।

সব যদি 'না' হয়, তাহলে ইমন করবেটা কি? শুয়ে শুয়ে পেঁপের ঝোল খাবে?

ইমনই আমাকে বলেছিল, একলা তো নেই পিসি। একলা থাকলে আমার ভালই হত। একলাকে তুমি বানিয়েছ।

শোনো কথা। সত্যি কথা তো কতই লিখেছি। আমাদের গরু ন্যাদোশের কথা,

সে মাছ খেত আর খুব শিক্ষিত ছিল, কেন না ইস্কুলের বই সব ক্লাসেরই চিবিয়ে খেত। আমার ভাইবোনরা নানান ক্লাসে পড়ত। ন্যাদোশও ক্লাস ফোর থেকে তখনকার ক্লাস টেন-এর সব বই খেত। ন্যাদোশকে তো আমি বানাইনি।

আমার দুই ভাই বোন, কঞ্চি আর ফল্গু বৈশাখের ভর দুপুরে রাস্তা সারাইয়ের পিচের ড্রামে ঢুকেছিল কি আছে তা দেখতে। ফল্গু তো একবার কঞ্চির কথায় এক ঝুড়ি ডিমে তা দিতে গিয়েছিল। এসব তো সত্যি কথা।

আমি বললাম, একলা আগে বানানো ছেলেই ছিল। এখন সে ভীষণ রকম সত্যি। তোমরা তো ঘরে ঘরে একলা ছেলে, একলা মেয়ে। আমাদের মতো তো নয় ভাইবোন মিলে আনন্দ করে বড় হওনি। আমরা একলা থাকতাম না, একলাকে পেতাম না।

ইমনের কাছেই একলা এল। তারপর যে কি হল, তা ওর কাছেই শোনা।

ভর দুপুরে ইমন শুয়ে শুয়ে জানলার দিকে চেয়ে ভাবছিল কবে ভাল হবো, কবে বাড়ি যাবো, দুপুরে কি করব, হের্ন তেন কত কি! ঠিক সেই সময় একলা হাজির।

তেতলার জানলার শিক বেয়ে একলা কেমন করে ঢুকল কে জানে। ঢুকেই সে কি কাঁইমাই।

—জানো আমি কোথায় ছিলাম? কতদূর থেকে তোমার জন্য ছুটতে ছুটতে এলাম!

—তুমি কে?

—ভাল করেই জানো যে আমি একলা।

ইমন খুব খুশি হয়েছিল, বলাই বাহুল্য। একলা তা হলে বানানো ব্যাপার নয়, একলা তা হলে আছে।

মনের কথা বুঝতে একলা তো ওস্তাদ।

—থাকব না কেন? বানাতে থাকো, বানাতে থাকো। খুব মন দিয়ে যদি কিছু ভাবো, সেটা সত্য হবেই হবে।

তুমি ওই জানলা দিয়ে এলে কি করে?

—ভাবলাম জানলাটা দরজা, আর দরজার পাশে সিঁড়ি। এদিকে তাকাবার দরকার নেই। আমার টুলুদি এখন ঘুমোচ্ছেন।

—ভাববো জানলাটা দরজা?

—চেয়েই দেখো।

—মাথা তোলাই তো মুশকিল।

—ভাবো তোমার কিছু হয়নি।

যেই ভেবেছে কিচ্ছু হয়নি, অমনি ইমন মাথা তুলেছে। আর যেই ইমন মাথা তুলেছে, অমনি দেখে জানলা উধাও, চমৎকার সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে।

—নিচে কি আছে?

—নেমেই দেখ।

—সে আমি পারবই না। শুধু পেঁপের ঝোল, আর হরলিক্স, আর ঘোল খেয়ে গায়ে জোরই নেই।

—এ সব খেতে বলল কে?

—ডাক্তারবাবু, আবার কে?

—ঠিক আছে। ডাক্তারবাবুকে জব্দ করা যাবে।

—কেমন করে?

—আজ থেকে তিনদিন ওঁর সব খাওয়াদাওয়া বন্ধ।

—তাই কি হয়?

—হতেই হবে। ওঃ কি গরম!

—গরম কোথায়?

—আমি তো ছিলাম সেই সেরেংসিঘাটিতে। সেখানে এখনো ভীষণ জঙ্গল। সেখানে মস্ত বটগাছের মাচা বাঁধা থাকে। সেখানে বসে বসে তোমার মতোই একটা ছেলে, দিমাগ তার নাম, ধান পাহারা দেয়। তার কাছেই ছিলাম।

—কেন গাছের ওপর ধান পাহারা দেয়?

একলার চোখ স্বপ্ন স্বপ্ন হয়ে গেল।

—হাতি আসছে যে? দলে দলে হাতি আসে। পাকা ধান খেয়ে নেয়। ওরা এ সময়টা ধান পাহারা দেয়, গাছের ওপর থাকে।

—তা কি সত্যি?

—নিশ্চয়।

—ওদের কথা তো আমি কোথাও পড়িনি।

—কেউ যে লেখেনি।

—দিমাগ লেখে না কেন?

—ও তো ইস্কুলে যাচ্ছে এই সবে।

—তুমি চলে এলে, ওকে যদি...

একলা হাত নেড়ে দিল।

—গাছটাকে বেজায় লম্বা করে দিলাম। আর হাতিগুলোকে ভুলিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে গেলাম নদীতে। ওখানে পাহাড় বনের মধ্যিখানে একটা চমৎকার নদী আছে।

—দিমাগের ভয় করে না?

—ভয় কেন করবে? ওখানে ওর বাড়ি, না?

—অমন জায়গায় থাকেই বা কেন?

—কত ছেলে কত জায়গায় থাকছে? সবাই তো শহরেও থাকে না। গ্রামও কত রকম! পাহাড়ে, জঙ্গলে...

—দিমাগের খুব সাহস, তাই না?

—নিশ্চয়। ওখানে এক সময়ে ভীষণ যুদ্ধও হয়েছিল। দিমাগদের পূর্বপুরুষরা ইংরেজদের সঙ্গে ভীষণ লড়াই করেছিল। সে সব কথা কে জানে বলো? কেউ তো লেখেনি।

—আমি কি ভিতু, কি ভিতু!

ইমনের মন খারাপ হয়ে গেল।

—কিসে কিসে ভয়, শুনি?

—অন্ধকারে ভয়। কেন্নো-কেঁচো-জোঁকে ভয়, আরসোলা আর মাকড়সা মোটে পছন্দ নয়, ইনজেকশনে ভয়, কত বলব!

দিমাগকে দেখলে তোমার ভয় কেটে যেত।

—সে তো কোনোদিন দেখতে পাব না।

—দেখতে চাও?

—খুব চাই।

—চলো, দেখে আসি।

—কেমন করে যাব?

—চলোই না। সিঁড়িটা কি এমনি বানিয়েছি?

—ওটা ম্যাজিক সিঁড়ি বুঝি?

—ইচ্ছে সিঁড়ি, ইচ্ছে সিঁড়ি! ওই সিঁড়ি ধরে নেমে তুমি যেখানে ইচ্ছে যেতে পারো, তবে হ্যাঁ, ইচ্ছের জোর থাকা চাই। খুব জোর দিয়ে ইচ্ছে করো, বাস!

—আমি নামতে পারব?

—নিশ্চয়। মনে করো 'পারব', তা হলেই পারবে।

ইমন চোখ বুজে বলল, আমার কোনো অসুখ নেই। ইচ্ছে হলেই আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে পারি। ইচ্ছে হলেই যেতে পারি, সেই পাহাড় আর জঙ্গলে।

—এবার আমার হাতটা ধরো একলা।

একলার হাত ধরে ইমন দরজা পেরিয়ে সিঁড়ি ধরে দে-দৌড়। সিঁড়ি ধরে নামার পর রেল লাইন, কোথায় কি, নামার পরেই যে জঙ্গল তা কি ইমন জানত? বাপরে বাপরে জঙ্গল। আর কান পাতলে নদীর শব্দ ঠিকই শোনা যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে কয়েকটা ঘর।

—এটা ওদের গ্রাম?

—হ্যাঁ, ছোট ছোট গ্রাম। কত পাকা কুল দেখেছ, কুল খেতেও হাতি আসে।

—কি মিষ্টি গন্ধ।

—খাবে, খাও না। কুল খাও; আমলকী খাও, দিমাগরা তো ঝুড়ি ঝুড়ি নিয়ে যায়।

—তখন ওদের বাড়িতে হাতি আসে না?

—আসে না আবার।

—তখন ওরা কি করে?

—টিন বাজায়, মশাল নাচায়।

—হাতিদের মারে না কেন?

—সে দিমাগ বলবে তোমাকে।

—সে কোথায়?

—চলো না।

তারপর ওরা সেই পাহাড়ী নদী পেরিয়ে গিয়েছিল। এরকম দুর্গমেও টিউবওয়েলের ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ। একটা দশ বছরের মেয়ে জল ভরছে। বাবা, কি সাহস! এমন বন-জঙ্গলে একলাটি জল ভরছে, যদি হাতি এসে পড়ে, কিংবা ভালুক?

একলা বলল, ভয় করলে ওদের চলে না কি!

—আমার এখন কোন ভয় করছে না।

—তুমি যদি এখানকার ছেলে হতে, তা হলে তোমারও ভয় করত না। এ জায়গাটা তোমার নিজের জায়গা হয়ে যেত।

—কি ভালোই হত তা'হলে!

—তীর ছুঁড়তে, জঙ্গলের কাঠ পাতা আনতে কুল, আমলকী, কেন্দু ফল আনতে, ধান পাহারা দিতে...

ইস্কুলে যেতে হত না।

—সেটি হত না। দিমাগরা ইস্কুলে ঠিকই যেত।

—ভাগ্যে তুমি এসেছিলে, তাই তো আমার মনে হল।

মনে মনে ইচ্ছে করলে সব সময় আসতে পারি।

—তাই কি হয়?

—স-ব হয়। ইচ্ছেটা জোরদার হওয়া চাই।

—আমায় অবাক লাগছে না কেন?

—অবাক লাগার কিছু নেই।

—খালি পায়ে চলে এসেছি, পায়েও ব্যথা লাগছে না। আর ভুলেই গেছি যে আমার জ্বর কমে না, মাথাব্যথা ছাড়ে না। দেখ দেখ, কিরকম বড় বড় পাথর।

—সেই আদ্যিকালের যুদ্ধে যারা মারা গিয়েছিল, তাদের সমাধি ওখানে। পাথর দিয়ে চিহ্ন করা।

কিরকম সুন্দর আর গম্ভীর গম্ভীর জায়গাটা। টিলার ওপর একটা মস্ত গাছ, তার নিচে বড়বড় পাথর সাজানো। পাথরের ফাঁক দিয়ে যে কত বুনো ফুলের গাছ। ছোট ছোট হালকা বেগনি রঙা ফুলে আলো হয়ে আছে। একটা কাঠবিড়ালি খুব ব্যস্ত সমস্ত ভাবে কি যেন খুঁজছে।

—এবার দেখ কোথায় এলাম।

বট গাছের ঝুরি ধরে ওরা বেয়ে বেয়ে উঠে পড়েছিল। বটগাছের ঝুরি ধরে ওপরে ওঠা এতই সোজা? ইমন কেন ওঠেনি কখনো? আব্বার সঙ্গে তো গিয়েছিল গ্রামে। সেখানে একটা বটগাছও ছিল। এবার গেলে নিশ্চয় ও ঝুরি ধরে দোল খেয়ে উঠে যাবে গাছে। সেখানে লুকিয়ে থাকবে পাতার আড়ালে। এরকম যে ওঠা যায় তাই তো ও জানত না।

মাচানে দিমাগ বসেছিল। একলার চেয়ে একটু বড় একটা কালো ছেলে। পরনে কালো হাফপ্যান্ট। বেশ বড় মাচান। মাচানে খেজুরপাতা না ঘাসের চাটাই পাতা। সে রকম বড় বড় চাটাইয়ে ধান জড়িয়ে দু'মুখ ঘাসের দড়িতে বাঁধা।

ওদের দেখেই দিমাগ ঠোঁটে আঙুল রাখল। তারপর ঝুলে পড়া ডালপালার জানলা দিয়ে আঙুল দেখাল।

মা হাতি আর বাচ্চা হাতি। আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে।

ফিশফিশ করে ইমন বলল, ওরা তো আসছে না?

ফিশফিশ করে একলা বলল, আমি ওদের পথ ভুলিয়ে দিয়েছি। এখন ওরা ঘাটি পেরোবে, আরেকটা জঙ্গলে ঢুকবে, সেখানে পাকা কুল খাবে মজা করে।

ফিশফিশ করে দিমাগ বলল, আসবে না তো?

—এখন তো আসবে না।

—ওঃ, ধান খেয়ে খেয়ে শেষ করেছে।

—দিমাগ, এর নাম ইমন।

—ইমন মানে কি?

—একটা সুরের নাম। দিমাগ মানে কি?

দিমাগ ফচ ফচ করে হেসে বলল, নাম ছিল ছটরাই। কিন্তু ছোটবেলা সব না কি ছিঁড়ে কুচি কুচি করতাম। হিন্দিতে দিমাগ মানে উইপোকা। মাস্টারজী বলল, এ ছেলেটা দিমাগ। সেই থেকে দিমাগ হয়ে আছি।

—একলা ধান পাহারা দিতে ভয় করে না?

—ভয়ও করে, পাহারাও দিতে হয়।

—এখানেই ঘুমোও?

—আর কোথায় ঘুমোব?

—ও বাবা, রাতে ভয় করে না?

—রাত তো ঘুমেই কেটে যায়।

—একলা আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।

—বেশ তো, এখানেই শুয়ে পড়ো।

দিমাগ বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ।

তারপর গানের মতো সুর করে দুলে দুলে দিমাগ বলল, এখন তুমি ঘুমিয়ে পড়ো, ঘুমিয়ে পড়ো। কালকে যখন সকাল হবে, সকাল হবে, তখন দেখো শিকার করব কত পাখি, কত পাখি। আমার সঙ্গে আমার ঘরে যাবে, পাখির মাংস আর ভাত খাবে।

—আমাকে একটা ধনুক দেবে?

—দেখা যাবে, দেখা যাবে।

—আমরা এখন বন্ধু তো?

একলা বলল, বন্ধু হবার নিয়ম আছে।

দিমাগ বলল, এসো আমরা নাম বদল করি। আমার নাম তোমায় দিলাম, তোমার নাম আমাকে দাও?

—কি মজা! বেশ তো, তুমি ইমন।

—আর তুমি দিমাগ।

একলা বলল, খুব হয়েছে। দুজনেই চোখ বোজো।

—আর তুমি?

—এই তো আমি।

একলা একটা পালক তুলে ওদের চোখে বুলিয়ে দিল। বলল, দিমাগ ইমন, দিমাগ ইমন, ঘুমোও এখন. ঘুমোও এখন। হাতিরা গেছে পুরানো ঘাটি, এখন দেখ, আকাশ রাঙা।

শুনতে শুনতে, পাকা ধানের মৌ মৌ গন্ধ বুক ভরে নিশ্বাস নিতে দুই ছেলের চোখে কি ঘুম, কি ঘুম। একলার কথা যদি আগে বিশ্বাস হত, কবেই তো চলে আসা যেত এখানে।

একলা যেন অনেক দূর থেকে বলল, বিশ্বাস করার জোর থাকা চাই, ইচ্ছের জোর থাকা চাই। মনে মনে তুমি যাও না কেন কানহা ফরেস্ট, কোনো অসুবিধে আছে? খুব জোর দিয়ে ইচ্ছে করো।

—করব, ঠিক করব।

—আমার অসুখ, আমার অসুখ, শুধু তাই, ভেবো না। জানো তো অসুখগুলো বেজায় পাজি।

—আর ভাবব না।

তারপর কি ঘুম, কি ঘুম। এমন ঘুমে নদীর জল কথা বলে, বাচ্চা হাতির ডাক শোনা যায়, কাঠবিড়ালি লেজ বুলিয়ে যায় মুখে, আর অনেক দূরে ঘরের পানে ফেরা মোষের গলার কাঠ আর পিতলের থবুকি বাজছে, তাও শোনা যায়।

নিশ্বাসে ধানের গন্ধে মিশে যায় পাকা কুলের গন্ধ, আর পাকা কুলের গন্ধে মিশে যায় হালকা বেগনি বুনো ফুলের গন্ধ। যেন বুকের মধ্যে বসে একলা বলে, আঁধার নামলে ওই সব পাথর বুনো ফুলের গন্ধে খবর পাঠায় জানতে চায়, তোমরা আমাদের ভুলে গেছ, না মনে রেখেছ?

মনে রেখেছি, মনে রেখেছি, নদী বলে।

মনে রেখেছি, মনে রেখেছি, ঘাটি বলে।

মনে রেখেছি, মনে রেখেছি, ইমনও তো বলতে চায়। কিন্তু চোখে যে বড় ঘুম গো!

ঘুম, ঘুম, বেজায় ঘুম।

টুলুদি তো ওকে অত ঘুমোতে দেখে প্রথমে খুশি হন। তারপর ঘন্টা দুই বাদে বেশ ভয় পেয়ে যান।

তখন নীলুদাকে টেলিফোন।

নীলুদা কোথা থেকে চাচাকে ধরে আনল।

আর চাচা আনল ডাক্তার বাবুকে।

আর ইমন সকলকে চমকে দিয়ে গড়াগড়ি খেয়ে জেগে উঠল। জেগে উঠে চোখ কচলে কি করল জানো?

তড়াক করে বিছানা থেকে নেমেই জানলার কাছে। ইচ্ছের জোর থাকা চাই, একলা বলেছিল।

সেই জন্যেই ইমন দেখতে থাকল, রেল লাইন, বাড়ির পর বাড়ি, তার ওপারে একটা গহীন বন আর পাহাড়, আর বাচ্চা হাতির থপস থপস চলা, আর একটা ঝুরি নামা বুড়ো বটগাছ। আর বড় বড় পাথরের ফাঁকে বেগনি ফুল, আর ডাউন বজবজ লোকালের চাকায় চাকায় শুনতে পেল, ইচ্ছের জোর থাকা চাই। মনের জোর থাকা চাই।

ইমন বড় বড় নিশ্বাস টানল।

তারপর এসে চেয়ারে বসল।

ডাক্তারবাবু গলা ঝেড়ে কাসলেন।

—জ্বরটা দেখি ইমন।

ইমন নয়, দিমাগ, কিন্তু সে কথা ইমন এদের বলবেই না। সে সব কথা এরা বুঝবে না।

—জ্বর নেই!

ইমন চুপচাপ।

—মাথার ব্যথাটা?

—নেই।

ইমনকে কেমন যেন অচেনা লাগছে। টুলুদি বললেন, এবার তবে হরলিক্সটা আনি?

—মচমচে মুড়ি আর বাদাম ভাজা খাব।

—কিন্তু ইমন...

—রাতে গরম ভাত, পাতলা ডাল, আলুভাজা। আমার জ্বর নেই, জ্বর হবেও না, ও সব বি   চ্ছিরি জিনিস খেলে আবার জ্বর হবে, আমি জানি।

ডাক্তারবাবু ঢোক গিলে বললেন, তা ও যেমন বলে। ...যাই হোক, দেখা যেতে পারে, দেখা যেতে পারে। আর, নিজেও তো পেটের অসুখে ভুগলাম ক'দিন। ও সব পেঁপে সেদ্ধ খেয়ে থাকা খুবই....যাকে বলে মানে দুরূহ।

ইমন কি তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাচ্ছে তোমরা ভাবতে পারবে না। সব ইচ্ছের জোরে। এরপর দেশে ফিরে গেলেও ওর চিন্তা নেই। ইচ্ছের জোর থাকলে সেখানেও একলা চলে যাবে। আর ইচ্ছের জোর পেয়ে গেছে বলে ইমন মনে মনে কতবার যেতে পারবে দিমাগের কাছে।

গিয়ে বলতে পারবে, এই ইমন!

—এই দিমাগ।

ভাগ্যে একলা এসেছিল।

দাদু তাড়ুয়া

“কাকতাড়ুয়া” বলে একটা কথা তোমরা শুনেছ। ব্যাপারটা যে আসলে কি, গ্রামের ছেলেরা জানো, শহরের ছেলেমেয়েরা জানো কি?

কাক বা অন্য পাখি এসে পাকা ধান খাবে বা উঠোনের মাচা থেকে পাকা কুমড়োটা ঠোকরাবে। এ রকম হয়েই থাকে। তাই গ্রামের লোকজন একটা মাটির হাঁড়ির পেছনে ভূষো কালি মাখায়। তারও চোখ মুখ আঁকে। সেটা বাঁশে ঢুকিয়ে একটা ছেঁড়া জামা বাঁশে গলিয়ে হাঁড়ির মুখে বেঁধে ধান ক্ষেতে, ঘরের চালে বা উঠোনে বাঁশটা পুঁতে রাখে। পাখি দেখলে ভাববে, ও বাবা! এ আবার কে!

“দাদু তাড়ুয়া” বলে কোনো শব্দ তোমরা কেউ শোননি। এটা দাদু তাড়ুয়ার গল্প।

গরমের ছুটি হয়েছে। রাজাদের বাড়িতে একটা পোস্টকার্ড পৌছল। রাজার বাবাকে লেখা। গোপাল দাদু লিখছেন ঃ এ বছর কিছু আগেই যাব মনে করছি। তেসরা পৌছে যাব। মজঃফরপুরে গরমটা খুব বেশি পড়েছে। পুরো গরমটা আরামে কাটিয়ে একেবারে আষাঢ়ে পুরীতে রথ দেখে ফেরার ইচ্ছে।

চিঠিটা দেখেই রাজার হাড়পিত্তি জ্বলে গেল। একে তো দার্জিলিং যেতে পারেনি বলে ওর মেজাজ বেশ খারাপ। মা আর বাবা ছোট বোন পাখিকে নিয়ে গেছেন। কি ব্যাপার? না, জামাইবাবু বদলি হয়ে যাচ্ছেন। রাজাকে কেন নিয়ে যাননি? না, ছেলের যে স্কুল খুললে পরীক্ষা। এমন যাচ্ছেতাই স্কুলে একমাত্র ছেলেকে ভর্তি করো কেন বাপু, যেখানে সপ্তাহে সপ্তাহে পরীক্ষা?

বেশ! রেখে গেছ তো দীনুদার জিম্মায়। রাজাকে দিয়ে গেছ পনেরো দিনে হাত খরচ সাকুল্যে দশটা টাকা! দীনুদাকে তো ভালোই ক্যাশ দিয়ে গেছ। সে সব সময়ে রাজাকে দুধ নিয়ে তাড়া করছে। তা ছাড়া সকালে মাস্টার, দুপুরে মাস্টার!

রাজা নিরুদ্দেশ হবে বলেই ভাবছিল। প্রাণের বন্ধু রাণাও রাজী। বিশেষ করে ওদের গুরু ভীমেশ্বরদা যখন নিরুদ্দেশ হবে বলে সবই ঠিক করেছে। ভীমদা অবশ্য ওদের বোঝাচ্ছে অনেক।

—আমার মনে ব্যথা লেগেছে, আমি যাচ্ছি, তোরা যাবি কোন্ দুঃখে?

—এত ব্যথা লাগল যে নিরুদ্দেশ হবে?

· —ওরে! গাধার দল! থিয়েটার নামার আগে নিরুদ্দেশ না হলে এই হতভাগা ক্লাব আমার মর্যাদা বুঝবে না। শুধু নিরুদ্দেশ হব না, গ্যাং ফিট করে দিয়ে যাব। চারটে করে ছেলে প্রতি সীনে বেড়াল ডাকবে।

—বের করে দেবে।

—আরো চারটে ঢুকবে।

—বের করে দেবে।

—বাইরে দাঁড়িয়ে হল্লা করবে। তারা বাবা ওপাড়ার ছেলে। এই পাড়ার ন্যাকা ভদ্দর-ভদ্দর ছেলে নয়।

—থিয়েটারটা পণ্ড করবে?

—করব না? কথা বললে তিনটে সুর বেরোয়, মানছি। তা আমার তো ছিল বৃদ্ধ অশরীরী মহিমবাবুর পার্ট। স্টেজে ঘুরব। এক ক্রিমিনাল দেখতে পাবে। আর কেউ দেখতে পাবে না। শেষে ভয়ের চোটে বাপধনকে "খুন করেছি" বলতেই হবে।

—হ্যাঁ, চমৎকার পার্ট ছিল।

—আমার কিরকম একটা সুযোগ গেল বলতে পারিস? ওঃ, ফিলমে ফিট্ হয়ে যেত।

—সিনেমায়?

—নয়তো কি? রাজুদা, সুভাষদা, তোরা অবশ্য নাম শুনিসনি। সবে পরিচালক হচ্ছে। ওদের ডেকেছিলাম...ওরা দেখলে...ছিঃ ছিঃ আমার ইজ্জত গেল! কেন? না, ওই যে পলাশের দাদু, কবে যাত্রা করত না কি করত যেহেতু সে হাজার টাকা চাঁদা দিচ্ছে, ওকেই ওই পার্ট দিতে হবে। অবিচার! অবিচার!

—তুমি না থাকলে আমরা কি দুঃখ পাব না?

—মানে এত দুঃখ পাবি, যে নিরুদ্দেশও হবি?

—নিশ্চয়ই।

—ওঃ। তোদের মতো ছেলে...

—কোথায় যাবে?

—সব ফিট্ করে রেখেছি। মেসোর ভেড়ি আছে রাজাতলায়। সাতদিন থাকব। সেঁটে মাছ খাব। তারপর কাগজে "বাবা ফিরে আয়" দেখে তবে ফিরব।

মেসোর ভেড়ির বড় বড় মাছ, আর মাসির হাতের খাসা রান্নার কথা রাজারা অনেক শুনেছে। ভীমদা বলেছে, ওই চাকরির পরীক্ষা দিয়ে ফেল করে করে বাবার বিষ চোখে পড়েছি। আর দিচ্ছি না। এবার ভেড়িতেই লেগে যাব। নাঃ, বাবা দোকানে বসতে দেবে না, বলে তোর মাথায় চর্বি। আমার দুঃখ কি একটা রে?

—তোমার মাসি জানিয়ে দেবে না?

—না, না, সেসব আমি দেখব। তা, চল্‌ তোরাও যখন চাইছিস।

এর মধ্যে গোপাল দাদুর চিঠি!

মায়ের জ্যাঠাইমার মাসতুতো কাকা কেমন করে রাজার দাদু হবেন, তা রাজা বোঝেই না "দাদু" তো সম্পর্কে হয় না। ব্যবহারে হয়। মায়ের সম্পর্কে এমন দাদু রাজার আরো কয়েকজন আছেন। তাঁরা কি ভালো, কি ভালো, এসে থাকলেও ভালো লাগে।

তাঁদের এমন "গুল্পো সাগর" নেই। গোপাল দাদু আসবেন শুধু হাতে।

যদ্দিন থাকবেন নো টেলিভিশন, যখন তখন প্রত্যয়-সমাস অব্যয় জিজ্ঞেস করবেন, খেলার সময় বেঁধে দেবেন, আর কি গুল্‌পো, কি গুল্‌পো!

যেমন, ইস্‌! ট্রেনে উঠে মনে হল, বাগানের খাসা ল্যাংড়া আম এক ঝুড়ি আনবো।

বা—নাঃ, পরের বার পুকুরের মাছ তোদের খাওয়াবই। একেবারে টাটকা, তরতাজা, স্বাদই আলাদা।

আনো না যখন, গুলপো কেন বাপু? দিব্যি তো বাগানের ফল, পুকুরের মাছ বিক্রি করো। মস্ত বাড়িও বানিয়েছ। স—ব শুনেছে রাজা। গোপাল দাদুর আরেক ভাইয়েরই কাছে।

এতেও কি নিস্তার আছে। বলবেন, আমরা, বুঝলে রাজা! আজ হয়তো ছড়িয়ে আছি, কিন্তু গ্রামের সূত্রে টান আমাদের শিকড়ে!

সুতরাং প্রতিটি রবিবার নষ্ট। আজ ওঁর সঙ্গে যাও বাদুড়বাগানের ভাইয়ের কাছে। অন্যদিন যাও চন্দননগরে কাকার কাছে!

রাজা একদিন বলেছিল, মা! তোমাদের গ্রামের লোকরা সবাই এত দূরে দূরে থাকেন কেন?

—যার যেখানে বাড়ি!

গোপাল দাদু অমনি ফ্যাচর ফ্যাচর হেসে বললেন, —বুঝলি খুকি! আমাকে নিয়ে যেতে হয় তো! বিরক্ত হয়। গ্রামের টান ও কি বুঝবে?

গ্রামের কথা বললেই রাজার মা মুচ্ছো যান। আহা, সেই পুজোপার্বণ। আহা, সেই পায়েস পিঠে।

গোপাল দাদু বলেন, আমি তো জানি, কলকাতায় থেকে থেকে ওর চরিত্রই গড়ে উঠছে না! আমি সেই জন্যেই ওকে নিয়ে...আমাদের মতো হতে হবে, বুঝলে রাজা? সেই মজঃফরপুরে...সেই আমি আর ক্ষুদিরাম..:ওঃ। ওর যখন ফাঁসি হল, গানটা বেঁধেছিল কে, জানো? দিস ওল্‌ড গোপাল দত্ত!

বাবা গোপাল দাদুকে অত পছন্দ করেন বলে রাজার মনে হয় না। কিন্তু তা নিয়ে কিছু বলার উপায় নেই মায়ের কাছে।

—কি আর জ্বালাতন করেন বাপু? তুমি যখন আপিসে যাও উনি পার্কে হাঁটেন।

—হ্যাঁ। অতগুলো লুচির পর না হাঁটলে...

—যাও! তুমি যখন ফেরো, তখন উনি রাজাকে পড়াতে বসেন।

—যাকগে! ছেলেমেয়েদের পড়া নষ্ট না হলেই আমি বাঁচি।

রাজার মা সহাস্য মুখে বলেন, —ভাগ্যে দুটো ঘর আরো করেছিলে। রাজার ঠাকুর্দা ঠাকুমা মারা যাবার পর আমার তো...আমি বাপু লোকজন ভালবাসি।

—ওঁর কি আর কেউ নেই?

—ও মা! জানো না? ওঁর সব অঙ্ক কষা থাকে। পাঁচ বছর এর কাছে যাব, পাঁচ বছর ওর কাছে, ...আমার তো ভাবলেই কান্না পায় যে দু বছর বাদে উনি আর আসবেন না, খবর যা পাব, একেবারে শেষ খবর!...

—না না, ভেব না। তোমাদের আত্মীয়স্বজন কম তো না। সব জায়গায় পাঁচ বছর করে ঘোরা হয়ে গেলে আবার উনি আসবেন। উনি ক্ষুদিরামের সময়ের লোক, প্রায় একশো বছর বেঁচেছেন। আর একশো বছর নির্ঘাত—

রাজার মা খুবই সহজ সরল। রাজার মা সহাস্য বদনে বললেন, —ওঁর যখন একশো বছর সত্যিই হবে, তখন একটা ফাংশান করবে?

—ওরে বাব্বা! যাই, যাই আপিসের গাড়ি আসছে।...

দীনুদাও মহাখাপ্পা। থাকবে কয়েক মাস, নিত্যি খেতে বসে বলবে এ মাছটা বাসি, ও রান্নাটা বাজে, আজ পাটপাতা ভাজা খাব, কাল নিম ঝোল, এ কি বাপু?

তা নিরুদ্দেশ যাত্রার সব ঠিক ঠাক। এর মধ্যে গোপাল দাদুর চিঠি! রাজা ভীমের কাছে দৌড়ল, —কেস খুব খারাপ হয়ে গেছে ভীমদা! আবার সেই ণিচ্ প্রত্যয় আসছে!

ভীম বলল—হুম্!

—এখন?

—উপায় হবে। ভাবতে হবে। বিকেলে দীনুদাকে মাংসের কাবাব বানাতে বলিস। তোদের বাড়িতে বসেই প্ল্যানটা বলব।

রাজা দীনুদার পায়ে পড়ে গেল, — বাবার বন্ধুরা এলে হরদম ভাজো। আমি একটা দিন বলছি—।

দীনুদা বলল, —ঠিক আছে।

—ভয়ানক বিপদ যে।

—কি বিপদ।

—গোপাল দাদু আসছেন। রথ অব্দি থাকবেন।

—অ্যাঁ?

দীনুদা কি বুঝল সেই জানে, কিন্তু বিকেলে কাবাব, ঘুগনি, কফি সব ঠিক ঠাক সাজিয়ে দিয়ে বলল, —আমি গিয়ে একটা পুজো দিয়ে আসি। হে মা শেতলা! বুড়োর মন থেকে এ বাড়ির ঠিকানাটা ভুলিয়ে দাও।

ভীম বলল, —হ্যাঁ, হ্যাঁ যাও! ঠাকুর দেবতার ইচ্ছেতেও অনেক সময়ে কাজ হয়।

রাজাকে বলল, —এখন প্ল্যাম যা করেছি, মাষ্টার প্ল্যান। দীনুদাকেও দলে নিতে হবে।

—কি প্ল্যান?

ভীম মুচকি হেসে বলল, বলবো রে, বলবো। ওঃ, মনে খুব বল পাচ্ছি, জানিস? রবীন্দ্রনাথই তো বলেছেন, সৎ কাজ করে যেই, মনে তার ভয় নেই!

—কোন্ কবিতায় বলেছেন?

—সে বলা সম্ভব নয়। একটা লোক যদি কয়েক হাজার পদ্য লেখে, তা হলে...এই যে গোয়ালারা দুধে জল মেশায়, ওরা কি ভয় পায়? পায় না। কেন না ওরা জানে, খাঁটি দুধ যত জনকে দিতে পারত, জল মিশিয়ে তার ডবল লোককে দিতে পারছে।

রানা বলল, —আচ্ছা রাজা, মজঃফরপুরে সত্যিই কি ওঁর...?

রাজা বলল, —সব সত্যি। অন্য দাদুরাও বলেছেন, আর বাবার আপিসের কে যেন বলছিল, গোপাল দত্ত নাম করা কৃপণ আর বেজায় ধনী।

—নেভার আম কিংবা লিচু?

—নেভার।

—নাঃ, এ রকম লোককে টাইট দেয়া খুব সৎ কাজ। তাইতো রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

যখনি দেখিবে অতীব কিপটে দাদু।
নির্ভয়ে তাঁরে টাইটটি দিবে চাঁদু।

ওঃ, এ রকম কত ভাল পদ্য যে লিখে গেছেন...হায়রে কেউ খবরই রাখে না।

—তুমি জানলে কি করে?

—পরীক্ষায় পাশ করার জন্যে "সাফল্যের হাজার উপায়" কিনেছিলাম না? কী মেমারি! কোনো পদ্য ভুলিনি। যাক গে। তা হলে সব কথা পাকা?

—নিশ্চয়ই।

পরদিনই গোপাল দাদু তাঁর পেল্লায় ট্রাঙ্ক আর বিছানা, থলি, দাঁতন, জলের সোরাই, সব নিয়ে এসে পড়লেন। বললেন, —খুকিরা নেই?

—দার্জিলিং গেছে।

—গেছে নয়, গেছেন। নাঃ, বছর খানেক টানা না থাকলে তোমার চরিত্র...

—আপনার বেলের পানা।

—এই যে দীনু। দাঁড়াও বিছানাটা পেতে ফেলি।

সদাই করিবে নিজের কাজ!
জীবনে কখনো পাবে না লাজ!

কার লেখা পদ্য তা জানো?

—না, বাবু।

—আমার! রবীন্দ্রনাথ পিঠ চাপড়ে বলতেন, রাইট, গোপাল রাইট! আমার তখন স্বাধীনতার স্বপ্ন। বাঙালীর ছেলে গাছপালা চাষবাস গরু গোয়াল করে পায়ে দাঁড়াব, পথ দেখাব।

ঘর তো ওঁর চেনা। বিছানা পাতলেন, দাঁতন করে স্নান করলেন। চৌদ্দটা লুচি খেলেন। পার্কে চলে গেলেন।

এসে দেখেন রাজা ওঁর জুতো পালিশ করছে, দীনু ওঁর পছন্দমতো সব রান্না করছে। দেখে খুব খুশি হলেন। না এ, কথাটা খুকিকে লিখতে হচ্ছে! তোমার ছেলের মধ্যে অনেক সদগুণ দিস টাইম দেখতে পাচ্ছি। এর কারণ, প্রতি বছর নিয়মিত আমার সাহচর্য লাভ!

খেতে বসে অবশ্য বললেন, —আমি ডায়েট বদলেছি। কাল থেকে আমাকে দুবেলাই হালকা করে মুরগির ঝোল দেবে। আর বিকেলে ল্যাংড়া আম...তা আমার বাগানের মতো আম আর কোথায় পাব?

দীনুদা বলল, —আমের সময়টা চলে এলেন?

—হুঁ হুঁ বাবা, বাড়িতে কাউকে খেতে হচ্ছে না। পাঁচশো গাছ। সব ফল বিক্রি করে এসেছি। আম, লিচু, জাম, কাঁঠাল, মাছ, স—ব বিক্রি।

সন্ধেবেলা ল্যাংড়া আম খেয়ে, পার্কে ঘুরে এসে গোপাল দাদু চিঠি লিখতে বসলেন। তাড়া তাড়া পোস্টকার্ড ওঁর সঙ্গেই থাকে।

রাজা বলল, —আমি অঙ্ক কষছি দাদু।

—খুব ভালো।

কিছুক্ষণ বাদেই ওঁর গলা শোনা গেল, —কে, কে ওখানে? কে তুমি?

রাজা আর দীনু দৌড়ে গেল।

—ওকে?

—কোথায় কে?

—ওই যে! লম্বা পানা বুড়োটা, জানলা দিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে?

—কোথায় কে দাদু?

—সে কি! তোমরা দেখতে পাচ্ছ না?

—না তো!

—ওই যে হাসছে! এ কি শব্দ হচ্ছে না কেন?

দীনু বলল, —ওই গুরুপাক আহার। তাতে ল্যাংড়া আম...

—আরে! চলে যাচ্ছে যে? দেখি...

রাজা আর দীনু ওঁকে চেপে বসাল। রাজা বলল, —কোথায় কে? আপনি ভুল দেখেছেন।

—ভুল দেখলাম?

—তা ছাড়া কি হবে?

—তা হলে ...চলো নিচের ঘরেই বসি। ঠিক সন্ধেবেলা ভুল দেখলাম?

গোপাল দাদু নিচে গিয়ে বসলেন। রীতিমত বিচলিত। কি যেন ভাবছেন আর ভাবছেন। রাত্রে তেমন মন দিয়েও খেলেন না। বললেন, —ভাবছি, রাতে আলো জ্বেলে শোব।

—তাই শোবেন।

পরদিন উনি বাদুড়বাগানে গেলেন। বললেন, —রাজা! যাবে না কি?

দীনুদা বলল, —এবারে আর ওকে পাচ্ছেন না বাবু। সকালে একজন মাস্টার, দুপুরে একজন, সন্ধেবেলা বন্ধু আসবে, আঁক করবে, এবারে ওর বড় কড়াকড়ি।

রাতে দীনুদা বলল, —বাবু। দরজা বন্ধ করে শোবেন কিন্তু। বড্ড চুরিচামারি হচ্ছে।

—তুমি সব দরজা জানলা ভাল করে—

হ্যাঁ হ্যাঁ, একেবারে।

রাত এগারোটা নাগাদ ভীম ঢুকল পেছনের দরজা দিয়ে।

রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ গোপাল দাদুর সে কি চিৎকার, —কে? কে তুমি?

দীনু দৌড়ে এল, রাজাও।

—কি হল?

—ও কে? আমার মশারির পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আমাকে আঙুল তুলে ডাকছে?

—কোথায় কে?

—ওই তো! ওঃ, কি ভয়ংকর চাহনি। আমি...আমি একা দেখছি কেন? ওঃ, ওঃ, ওই যে চলে যাচ্ছে।

—কোথা দিয়ে?

—ইডিয়ট! ...দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

দীনু ঘন ঘন মাথা নাড়ল, —বাবু! বিশ্বাস না করেন তো দেখে যান। নিচে প্রতিটি ঘরে তালা, কোলাপসিবল গেট প্রতি দরজায়। গ্রীলের জানলা তাও বন্ধ।

গোপাল দাদু কেঁদে ফেললেন, —বিশ্বাস করো তোমরা। আমি না দেখলে...

দীনু চটে গেল, —নতুন বাড়ি। বিশ বছরও হয়নি। বাবু মা বাস করলেন। মারা গেলেন। রাজার দিদির বিয়ে হল। কত সময়ে আমরা একলা থাকি, কেউ কিছু দেখল না। আপনি এবারে...নিশ্চয় কিছু পাপ করেছেন...নইলে ভূতপ্রেত পাছু ধরবে কেন?

—ভূ...ত!

—নইলে কি? আপনার সঙ্গেই এসেছে মনে হচ্ছে। চলো রাজা, আজ তোমার ঘরে শুই। ছোট ছেলেটা! আহা, ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে।

—না না, দীনু তুমি আমার ঘরে শোও।

রাজা বলল, —ন্-না! আমি একা শোব না।

দীনু বলল, —তাহলে নিচ তলাটা একবার দেখে আসি। মাঝের দরজা খোলা রেখে তুমি আমি পাশের ঘরে শুই।

—হ্যাঁ দীনুদা!

গোপাল দাদু আলো জ্বেলেও ঘুমোতে পারলেন না। ঘুমোলেন সকালের দিকে, উঠলেন বেলায়।

দীনুদা গম্ভীর মুখে বলল, —হাত বাড়ান।

—কেন?

—আপনার জন্যে সাতসকালে মন্দিরে গেলাম। জাগ্রত ঠাকুর! পুরুত মশাই বলল, বাড়িতে মেলেচ্ছ খাবার ঢোকাবে না। সেদ্ধ ভাত খাবে, আর তোমরা তিনজনেই হাতে এই লাল সুতো বেঁধে রাখবে।

—যাক্। তবু রক্ষে! তবে রান্না বান্না...

—ওসব মুরগি পেঁয়াজ চলবে না।

—রাজা খেতে পারবে?

—পারতেই হবে। আজ আবার শনিবার। শনিবারটা—

—তা দীনু! আজ না হয় আমিও সিনেমা দেখব তোমাদের সঙ্গে টেলিভিশনে।

গোপাল দাদুর মুখে টেলিভিশনের কথা!

পার্কে গিয়ে গোপাল দাদু খুব বেইজ্জত হলেন। দীনু সকলকে বলেছে, আমি বা রাজা কিছু দেখছি না, উনি শুধু পিশাচ দেখছেন! এ কিরকম একটা বদনাম নয় বাড়ির ওপর? এতকাল ধরে বাড়ি হয়েছে, ভিতপুজো থেকে কোন্‌টা হয়নি?

গোপাল দাদুকে তো সবাই চেনে। পলাশের দাদু বললেন, —এ মশাই পাড়ার বদনাম। নতুন কলোনি, বিশ বছর হয়েছে, আমাদের পাড়ায় ভূত?

—স্বচক্ষে দেখলাম!

—অথচ ওরা দেখছে না?

—না মশাই।

—আমার মনে হয়, ...আচ্ছা, কোনো দৈবাদেশ লঙ্ঘন করেছেন কি?

—দৈবাদেশ!

সন্ধেবেলা হঠাৎ মনে পড়ল, কি যেন এক মাতার আদেশ লেখা পোস্ট কার্ড এসেছিল বটে। তাতে পরিষ্কার লেখা ছিল—একশো আটটা পোস্ট কার্ড...কাকে লিখতে হবে?...যারা লেখেনি তাদের যেন কি হয়েছে...? এঃ, কিছুই মনে আনতে পারছেন না কেন? ইস্, সে চিঠিটাও তো মজঃফরপুরে পড়ে আছে। একবার ফিরতে পারলে...

ওঃ, অন্ধকার মানে আতঙ্ক, অন্ধকার মানে....

আজ অবশ্য টেলিভিশন দেখবেন। ওঃ, কপাল বটে! সিনেমার নাম "কঙ্কালের প্রতিহিংসা"। এ কি ষড়যন্ত্র রে বাবা! উঠে যাবেন? যাবেনই বা কোথায়? রাজা, রাণা, দীনু, সবকটা একেবারে সেঁটে বসে দেখছে। হাতে লাল সুতোটা আছে তো?

ছবি দেখছেন, দেখছেন, এমন সময়ে তাঁর ঘাড়ে কে নিশ্বাস ফেলল।

চমকে ঘাড় ঘোরাতেই গোপাল দাদু 'ওঁ রেঁ বাঁবাঁ, আঁমাকেঁ ডাঁকছেঁ যেঁ' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন।

—কে ডাকছে? ধেৎ জমাটি জায়গাটা...

—ওঁই তোঁ...আঁঙুল তুঁলেঁ...

দীনু বলল, —কোথায়?

রাণা তো হেসেই ফেলল।

গোপাল দাদু কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর লাঁল সুঁতোটা সুঁতোটা বলতে বলতে পড়ে গেলেন। পড়েই অজ্ঞান হতে হতেও অনুভব করলেন ঠান্ডা শক্ত আঙুল তাঁর হাতের সুতো ছিঁড়ছে।

মনে হল, কে যেন কানের কাছে বলছে, —আয়! আয়!

ব্যস্, পুরো অজ্ঞান, অবশ গোপাল দাদু।

ফ্রিজের বরফে রীতিমত ঠান্ডা করা আঙুল ভীমের। সে বলল,—অ্যাকশান! আমি মেকাপ ছেড়ে আসি। তোরা ডাক্তার ডাক্। দেখ্, টেঁসে গেল নাকি?

দীনু বলল, —না না। বাথরুমে নিয়ে জল ঢালছি। এমন আহার দুবেলা, টাঁসবে না।

জ্ঞান ফেরাতে আধঘন্টা লেগেছিল। ডাক্তারও এসেছিলেন। প্রেত দর্শন? মাথার দোষ নেই তো?

দীনুদা বলল, —আমার তো তাই মনে হচ্ছে গো! ফি বছর আসেন, আহার নিদ্রা কুম্ভকর্ণের মতন। কোনোবার তো..এবারে একা উনিই দেখছেন আর দেখছেন। আমরা কেউ কিছুটি দেখিনি।

গোপাল দাদু চোখ মেলে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, —আজকের রাতটা কাটলে কালই বিদায় হচ্ছি দীনু! প্রেতপিশাচের অভিশাপ—

দীনুদা বলল, —এ তবে তোমার সঙ্গে এসেছে। কই, এ বাড়িতে কোনোদিন......

ডাক্তারও বললেন, —নেভার।

ভীমও ততক্ষণে এ ঘরে। সে বলল, —না, এটা পাড়ার বদনাম হচ্ছে।

—আমি বাড়ি যাব।

—নিশ্চয়ই যাবেন। আমি আপনাকে টিকিট কেটে তুলে দিয়ে আসব।

পরদিনই গোপাল দাদু রওনা হলেন। ভীম ওঁকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এল।

তারপর রাজাদের বাড়িতে জমপেশ ভোজ হল একখানা। দীনুদা বলল, —কত লোক কত খেতাব পায়। তা আমি তোমার খেতাব দিলাম দাদুতাড়ুয়া!

ভীম বলল, —বাপ্‌রে কঞ্জুষ! ট্রেনে শোবার ব্যবস্থা করে দিলাম, একটা টাকা দিয়ে বলে কি, জোয়ান ছেলে! বাসেই চলে যাও বাবা।

এই হল দাদু তাড়ুয়ার গল্প। অবিশ্যি, এর উপসংহারটুকু বাকী রয়ে গেল।

পলাশের দাদু হঠাৎ পা মচকে পড়ে থাকলেন। ফলে ভীমই আবার পেয়ে গেল অশরীরী মহিমের পার্টটা।

আর দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে রাজার মা বললেন, —গোপাল দাদু এ কি লিখেছেন, কিছুই বুঝছি না। 'মা খুকি। তোমার বাড়িতে ভৌতিক উপদ্রবে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছি। বাড়িতেও বলিতেছে, আমারও সংকল্প, এ ভাবে এ বয়সে আর মজঃফরপুর ছাড়িয়া ঘুরিব-না। শান্তি স্বস্ত্যয়ন করাইয়াছি, তাগা তাবিজ

লইয়াছি, কিন্তু বিদেশে আর যাইব না। যাহা হউক, তুমি অবিলম্বে তান্ত্রিক ডাকাইয়া গৃহশোধন করাইবে। অন্যথা করিও না।'

দীনুদা বলল, —ওনার মাথার দোষ হয়েছে বউমা! নইলে ঘরে আমি, রাজা, রাণা, সবাই, একা উনি দেখছে, আমরা কেউ দেখলাম না?

রাজার মা ভীতু মানুষ! তিনি বললেন, —যা হোক্, একটা কিছু করতে হয়।

দীনুদা বলল, —মোট্টেই না। পাড়ার সবাই ছ্যা-ছ্যা করবে। এ বাড়ি কেন, এ পাড়ায় কোনো ভূতপ্রেত নেই।

থিয়েটারটা সবাই দেখেছিল। দেখে রাজার বাবা কি বুঝলেন কে জানে, থিয়েটার দেখে ভীমের নামে একটি মেডেল ঘোষণা করলেন।

দীনুদা বলল, —দাদাবাবু ঠিক বুঝেছে।

রাজা বলল, —মা! মেডেলটা দেবার দিন ভীমদাকে খাওয়াতে হবে, খাওয়াবে তো?

—খাওয়াব, খাওয়াব। কিন্তু গোপাল দাদুর জন্যে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল রে।

রাজাও করুণ মুখ করল, —আমারও!

ভালো ছেলে

আমাদের ছোটবেলা আমরা সবাই বন্ধুদের মাকে মাসিমা বলেছি। কিন্তু বন্ধুর দাদা, দিদি, কাকা, মামা আমাদের দাদা, দিদি, কাকা, মামা ছিলেন। আমার নিজেরই চার কাকা, চার মামা। তার ওপর বন্ধুদের আত্মীয়স্বজন যোগ হওয়াতে কি ব্যাপার হত ভেবে দেখ।

আমার এক বন্ধুর পিসেমশাইকে আমরা বেজায় পছন্দ করতাম। তিনি মধ্যপ্রদেশের ঘোর জংলা জায়গায়, সিংভূমের জঙ্গলে, অদ্ভুত সব জায়গায় জঙ্গল কাটার কাজ করতেন। জানা চেনার মধ্যে তিনি একমাত্র লোক যাঁর সঙ্গে ভালুক পরিবারের বন্ধুত্ব হয়েছিল।

ভালুক বিষয়ে, আমার জঙ্গল হাঁটা জীবনে সবাই বলেছে, ভালুক অতি পাজি জন্তু। তেড়ে এসে আঁচড়ে দেয়।

অথচ পিসেমশাই যখন সমুন্দরি জঙ্গলে, তখন ঘোর বর্ষা নামল। তাঁবুতে ক্যাম্পখাট, তাতে মশারি খাটানো। মশারির ওপর বর্ষাতি চাপিয়ে পিসেমশাই ঘুমোচ্ছেন। বৃষ্টিতে আর কি হবে। ঝড় হলে গাছের ডাল ভাঙতে পারে।

রাতে বেশ বুঝছেন তাঁবুতে লোক ঢুকছে। তা ঢুকুক। তাঁর কুলিদের তাঁবুতে বোধহয় জল পড়ছে, তাই ঢুকেছে। তাঁবুর পর্দা দুদিকেই খোলা। ঝোড়ো বাতাস উঠলে তাঁবু উড়ে যাবে না, বাতাস বেরিয়ে যাবে।

সকালে মশারি থেকে মুখ বের করে দেখেন মা-ভালুক দুটো ছানা নিয়ে বসে আছে।

পিসেমশাই আস্তে উঠলেন। ঘোর বর্ষায় কুলিদের তাঁবুতে এসে বসলেন, চা এখানেই খাই।

—কেন বাবু?

—আমার তাঁবুতে ভালুক ঢুকেছে। না, টিনও পিটাতে হবে না। তাড়াতেও হবে না। জলে ভিজে ঢুকে পড়েছে।

ওঁর খালাসি বলল, শ্রাবণমাসে যদি তাঁবুতে ঢুকল তো বর্ষা কাবার করে বেরোবে।

—কে বলেছে?

—দেখবেন।

এই ভালুকরা আসবে বলে সেই বাঘা জঙ্গলে পিসেমশাই তাঁবুর পর্দা খুলে ঘুমোতেন আর পুরো বর্ষাকালটা ওরা ওঁর তাঁবুতেই কাটিয়ে দিল।

এই খালাসির নাম খরসোয়াঁ। রাজখরসোয়াঁতে ওর বাড়ি বলে নামই হয়ে যায় খরসোয়া। পিসেমশাই যখন বুড়ো বয়সে, ভারত স্বাধীন হবার একবছর আগে সিংভূমের কোন্ এক জায়গায় কাজ নিয়ে গেলেন, খরসোয়াঁ বলল, ওখানে তো কুলিরা যে যার গ্রামে চলে যাবে। আপনার কাজকর্ম করবে কে? আপনি লালমোতিকে বলবেন। ও আপনাকে একটা ভালো ছেলে দেখে দেবে।

এই ভীষণ কালো নেড়ামাথা বুড়োর নাম লালমোতি কেন হয়েছিল কেউ জানে না। লালমোতি বলল, তুই যে ঘরটার থাকবি বাবু, সেটা তো বানিয়ে নিবি?

সে তো বটেই। বছর দুই কি তাঁবুতে থাকা যায়? জঙ্গলের কাঠ দিয়ে ঘর করে নেয়াই বুদ্ধির কাজ।

—ঘর তো বানাবই।

—কোথায় বানাবি?

—এই জায়গায়।

—না না, ঝর্ণার ধারে এই গাছটার কাছে ঘর তুলে নে, ভালো ছেলে পেয়ে যাবি একটা।

—তার মানে?

পিসেমশাই বেশ অবাক। এই গ্রামের কোনো ছেলেই তো কাজকর্ম করবে। কাজ সেরে সে গ্রামে ফিরতে পারে। তাঁর ঘরেও থাকতে পারে। একটা বিশেষ জায়গায় ঘর বানালে তবে সে কাজ করবে, এর মানে কি?

—মানে আবার কি?

—ছেলেটা ভালো?

—নইলে বলি?

—মাইনে কত দেব?

—যা হয় দিস।

—রাতে থাকবে?

—না, রাতে থাকবে না।

ঘর তৈরি হল। পিসেমশাই সে কয়দিন গ্রামেই থাকলেন। তাঁর ঘরটার দেয়াল, ছাত, সবই কাঠের। মেঝেটা মাটির। তাতে একটা কাঠের মাচান। সেটাই তাঁর খাট ও টেবিল। তা ছাড়া কোণে সরু লম্বা একটা মাচান। তাতে বাকস, চাল, ডাল, জুতো, সবই থাকবে।

পিসেমশাইয়ের মন খুব খারাপ ছিল। কিছুদিন বাদে তার বনবাসী জীবন শেষ হবে। তখন তিনি কি করবেন?

যা হোক, সকালে তিনি নতুন ঘরে গেলেন। একটা বছর চোদ্দোর ছেলে এসে দাঁড়াল। এই তবে সেই ভালো ছেলে। সবচেয়ে ভালো কথা, কথাটি না বলে ছেলেটা তাঁর জন্যে চা ডিম ভাজা আর গরম রুটি করে আনল।

পিসেমশাই খুব খুশি। ওকে টাকা দিয়ে বললেন, চাল, মুরগি, সব কিনে আনবি। বিনে পয়সায় কিছু আনিস না। তা হলে বেদম মার খাবি।

ছেলেটা ফিক করে হাসল।

—তোর নাম কি?

—বুগিন বুরু।

বুগিন মানে ভালো, বুরু মানে পাহাড়।

আমি তোকে বুগিন বলব।

—তাই বলিস।

জঙ্গলে যাবার সময়ে পিসেমশাই দেখেন থলের মধ্যে জলের বোতলে জল। গরম রুটি আর আচার। দেখে তিনি খুব খুশি। রান্নার জন্যে ছোট্ট একটা ঘর তৈরি হয়েছে। ছেলেটা সে ঘরে ঢুকছে কখন, করছে কখন এত সব, কে জানে।

পিসেমশাইয়ের সঙ্গে যাবে বলে কুলিরাও এসে পড়ল। এসেই সবাই বেজায় চটপট ঝাঁকড়াঝোপা তেঁতুল গাছটার গোড়ায় নমস্কার করল। আর লালমোতি পাতার ঠোঙায় কি সব খাবার নামিয়ে রাখল গাছের গোড়ায়। পিসেমশাই এ সব জঙ্গলবাসী মানুষদের অনেক বছর দেখছেন। উনি জানেন যে ওরা কোনো কোনো গাছকে পূজা করে। তাই তেমন অবাক হলেন না।

কাজে চলে গেলেন ওঁরা। যাবার আগে পিসেমশাই বললেন, ওরে! এগুলো আলকাতরা। হাত দিস না।

—কি হবে?

—পরে গরম করে নেব ওই কড়াইয়ে। দেয়ালে আর চালে মোটা করে লাগাতে হবে। লাগালে উই লাগবে না, জলে নষ্ট হবে না।

সারাদিন বাদে সন্ধ্যেয় ফিরেছেন। দেখেন পুরো ঘরটায় আলকাতরা লাগানো হয়ে গেছে। তিনি তো তাজ্জব। বললেন কে করল এ সব?

—ঠিক হয়েছে?

—করল কে?

—আমি।

তুই!

—হ্যাঁ। ওই যে তোর খাবার। আমি চললাম।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিড়িং লাফ মেরে ছুটে ও পালাল। পিসেমশাই ঝর্ণায় স্নান করে ভাত আর বুনো শাক খেয়ে শুয়ে পড়লেন। না, নামটা একটু বিদ্‌ঘুটে। নইলে ছেলেটা খুব ভালো।

কি ভালো ছেলে যে কি বলি। কোথায় দশ মাইল দূরে পোস্টাপিস। ছেলেটা ওঁর ডাক এনে রেখে দেয়। ভোরবেলা বেরিয়ে যান পিসেমশাই, ফেরেন সন্ধ্যার মুখে। সন্ধ্যার সময়ে ফিরতে ফিরতে শুনতে পান, ছেলেটা গাইছে—

ঝর্ণা তুমি ভাল থেকো
সারা বছর জল দিও—

এ কি রকম গান কে জানে। তবে ছেলেটার গলা খুব রিনরিনে বলে শুনতে ভালো লাগে। ক্রমে ক্রমে অনেকদিন কাটল। এই ভীষণ জলকষ্টের জায়গায় গরম পড়লে জল শুকায় নদীনালায়। এই ঝর্ণায় জল কিন্তু শুকোয় না।

লালমোতি বলল, শুকোবে কেন?

—নিচে কি কোনো উৎস আছে?

—যতদিন আমরা গাছের গোড়ায় পূজা দেব, ততদিন ঝর্ণার জল শুকাবে না।

—তাহলে বুগিন বুরুর জন্যেই হচ্ছে বল্? ও তো রোজ গান গায় আর ঝর্ণাকে জল দিতে বলে।

—যা বুঝিস না তা নিয়ে কথা বলিস না। তুই কাজ করতে এসেছিস, কাজ করে চলে যা।

পিসেমশাই চুপ করে গেলেন। এই সামান্য কথায় লালমোতি রেগে গেল কেন? বুগিন বুরুর গানের সঙ্গে ঝর্ণায় জল থাকার সম্বন্ধ কি?

সেদিন রাতে তাঁর ভালো ঘুম হল না। আর আশ্চর্য কি, এই প্রথম শুনলেন রাতের জ্যোৎস্নায় ছেলেটা খুব কাছে কোথাও গান গাইছে। ভারি আশ্চর্য তো! তবে কি ও ঘরে যায়নি? মনে হল উঠে দরজা খুলে দেখেন। কিন্তু নিমেষে ঘুমে হাত পা ভারি হয়ে এল।

সকালে উঠে ছেলেটাকে দেখে জিগ্যেস করবেন, কিন্তু তখন মনেই পড়ল না। তার বদলে হঠাৎ যা মনে হল, তাই বললেন, হ্যাঁ রে, ঝর্ণায় মাছ পাওয়া যায় না?

—না।

—এমন জল, মাছ নেই?

—মাছ কি হবে?

—তা তুই কি বুঝবি রে? সেই রাঁচিতে মাছ খেয়েছি আর এদিকে মাছ মেলে তো চাইবাসায়।

—বেশি কৌতূহল না দেখালে এখানেও মিলতে পারে।

—কি বললি?

— বলছি যে তুই কাজে যা।

পিসেমশাই ভাবলেন, এ তো ভালো ঝামেলা হল। ঝর্ণার কথা বললে লালমোতি চটে। মাছের কথা বললে ছেলেটা রেগে রেগে জবাব দিচ্ছে। ভালো রে ভালো।

সন্ধ্যা বেলা যখন ফিরলেন, তখন থালাভর্তি মাছভাজা দেখে পিসেমশাই তাজ্জব। আর " কোথায় পেলি" বলে বেরিয়ে আসতেই দেখেন বুগিনবুরু এক লাফে হাওয়ায় ভেসে তেঁতুল গাছে উঠে গেল।

অন্য লোক হলে তখনি পড়ে মূর্ছা যেত। পিসেমশাইকে ঘাবড়ে দেয়া অত সোজা নয়। তাঁর খালাসি খরসোয়াঁ একবার কি সব উলটো পালটা মন্তর পড়তে গিয়ে একটি বছর বাঘ হয়ে থেকে গিয়েছিল। এ সব দেখে তাঁর খুব অভ্যেস আছে।

নিশ্বাস ফেলে পিসেমশাই গাছের গোড়ায় কয়েকটা ভাজা মাছ নামিয়ে দিলেন। বোঝাই যাচ্ছে ও ভূত। তা হোক। বাচ্চা ভূত তো। ওর কি আর খেতে সাধ যায় না?

পরদিন সকালে দাড়ি কামাতে কামাতে বললেন, কদ্দিন?

বুগিনবুরু একটু অপ্রস্তুত হল। বলল, বরাবর।

—তা কি হয় না কি?

—কৌতূহল ভালো নয়।

—যাক গে। যা বলিস। তা রাতে ঘুম টুমের দরকার হয় না না কি? খানিক ঘুমোলি, খানিক গান গাইলি।

ফচ করে হেসে ছেলেটা রান্নাঘরে ঢুকে গেল। নিমেষে গরম ডিম ভাজা, গরম রুটি, চা নিয়ে চলে এল।

—আজ কি খাবার ইচ্ছে?

—আজ শুওর শিকার হবে।

—কখন?

—এই কিছুক্ষণ বাদে।

—শিকার হলে ডেকো।

—আচ্ছা।

শুওরের ঠ্যাং পাতায় মুড়ে ঝোপের কাছে রেখে পিসেমশাই "এই যে, রইল" বলে জঙ্গলে ঢুকে গেলেন শিকারের পর। বাড়ি ফিরে তোফা মাংস রুটি খেলেন। গাছের গোড়ায় রাখলেন।

তাবপর তাঁর সুখের দিন ফুরাল। একদিন ভোররাতে বুগিনবুরু তাঁকে ডাকল। বলল, উঠে পড় উঠে পড়।

—কেন রে?

—তোকে নিতে লোক আসছে।

—কেন?

—তোকে সেরাইকেলা পাঠাবে। এখানে রাখবে না। বুগিনবুরুর কথা! পিসেমশাই উঠে দাড়ি কামিয়ে বিছানা বেঁধে তৈরি। সকালে বুগিনবুরু ছলছল চোখে ওঁকে চা এনে দিল। তারপর তিড়িং করে গাছে উঠে বসে থাকল। ওর ফ্যাঁচ ফোঁচ কান্না শুনে পিসেমশাই কেঁদে ফেললেন। তারপর ধমক দিয়ে বললেন, অত কান্নার কিছু হয়নি। আমি আবার আসব। আর, বাজার করতে যে টাকা দিতাম সে-গুলো কোথায় আছে, জানতে পারি কি? একটা টাকাও খরচ হয়নি।

—রান্না ঘরে। —গাছ থেকে জবাব এল।

রান্নাঘরে সেই টাকা ছিল। আর ছিল ঝুলকালি পড়া, মাকড়শার জালে ঢাকা হাঁড়িকুড়ি। রান্নাঘরে কোনোদিন কেউ রান্নাবান্না করেনি দেখলেই বোঝা যায়। রান্নাঘরের মেঝেতে অনেক কন্টিকারি গাছ হয়েছিল আর তাতে ফুলও ফুটেছিল। উনোনে কাঠবিড়ালির বাসা। হাঁড়িতে কি যেন পাখি ডিম পেড়ে রেখে গেছে।

লালমোতি সেই লোকটাকে এনেছিল। লোকটা থাকবে, পিসেমশাইকে যেতে হবে। লালমোতি লোকটাকে বলল, তুই এখানে থাক্। একটা খুব ভালো ছেলে দেব কাজ করতে।

লালমোতি পিসেমশাইয়ের দিকে চাইলও না। মুখের ভাবও তার একরকমই রইল।

গ্রাম ছেড়ে চলে আসার সময়ে লালমোতি অন্যদিকে চেয়ে পিসেমশাইকে বলল, পাহাড়ের মধ্যে ভালো মন্দ দু-রকমই হয়। বুগিনবুরুরা মানুষ ভালোবাসে, মানুষের কাছে থাকতে চায়। ওদের আশ্রয়ে থাকলে জলের চিন্তা থাকে না, ঘরে আগুন লাগে না। কোনো জানোয়ার ফসল নষ্ট করে না।

পিসেমশাই বললেন, এই টাকা রাখ। গাছের গোড়াটা পাথর এনে বাঁধিয়ে দিস।

পিসেমশাইয়ের কাছে বসে শোনা গল্প। বিশ্বাস করো আর না করো, সে তোমাদের ইচ্ছে।

অবাক ছেলের কথা

লোধা নামে যে একটি আদিবাসী জাতি আছে তা হয়তো তোমরা জানই না। ১৯৮১-র সেন্‌সাসে দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গে ত্রিশলক্ষ সত্তর হাজার ছয়শো' বাহাত্তর জন আদিবাসী আছে। আটত্রিশ জাতি আদিবাসী এই বাংলায় থাকে। তাদের কথা না জেনে তোমরা যদি বড় হয়ে যাও, তা হলে দেশকে চেনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমার জীবনটা ওদের নিয়েই কাটে। তাই ওদের কথা লিখতে আমি সবচেয়ে ভালবাসি।

লোধা, খেড়িয়া এই দুটি আদিবাসী জাতির নাম বিশেষ করে মনে রেখো। ইংরেজ যখন রাজত্ব করত, তারা গোটা ভারতবর্ষে রাজ্যে রাজ্যে অনেক ছোট ছোট আদিবাসী জাতিকে 'অপরাধ প্রবণ' বলে দাগ মেরে দিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে যেমন লোধা আর খেড়িয়া।

এরা সব বনবাসী জাতি। জঙ্গল ওদের মা। বনের গাছ, ফুল, ফল, লতা, মূল, কন্দ, ওষুধের গাছ, ধুনো, মধু, এ সব জোগাড় করে ওরা বেঁচে থাকে। শিকারেও ওরা দারুণ ওস্তাদ। বন থেকে কাঠ, পাতা, ফল, মধু আনলে যে চুরি করা হয় তা ওরা জানত না। তাই কপালে জুটল মিথ্যে অপবাদ।

অবশেষে ১৯৫২ সালে ভারত সরকার বলল, এরা 'অপরাধ প্রবণ' নয়। কিন্তু সমাজের মানুষ ওদের চোর ডাকাতই ভাবত। এখন এরা নিজেরাই লেখাপড়া শিখে এগিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

বড়ই গরিব ওরা! জমি নেই যে চাষ করবে। লেখাপড়া জানে কম জন। খুব কম লোধা খেড়িয়া চাকরি করে। আমি কত আদিবাসী গ্রামে গেছি, কত ঘরে থেকেছি, কত ঘরে খেয়েছি কি বলব।

লোধা ঘরেও থেকেছি। সুখের কথা, এখন রাজ্য সরকার লোধাদের সাহায্য করার নানা ব্যবস্থা করেছেন। লোধা মেয়েরাও তীর চালাতে পারে খুব।

এই লোধা ঘরের এক অবাক ছেলে সুধীর শবর। এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ও প্রথম বিভাগে পাশ করে ফেলেছে। আমি তো বলি এ বছর সবার ওপরে ওর রেজাল্ট। কেন তাও বলি।

মেদিনীপুরে জামবনি থানার কশাফলিয়া গ্রামে ওর ঘর। সে গ্রাম যে কি

জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হয়, কত যে দূর দুর্গমে, সে বলে বোঝানো কঠিন। জঙ্গলের পথে হাতি আসে মাঝে মাঝে। রাস্তা বলতে কিছু নেই।

তেমনি গ্রামে থাকেন গুরুচরণ শবর আর তাঁর স্ত্রী। খেজুর পাতায় ছাওয়া একখানি ঘর। সুধীর বড়, ওর ছোট বোনটিও পড়ছে।

ধন্য ধন্য ওই বাবা আর মা। ওঁদের জমি নেই, গরু নেই, কিছু নেই। জঙ্গল থেকে কাঠ আনেন। কাঠ বেচে চাল কেনেন।

গ্রামে অমন গরিব ঘরে ছেলে মেয়েরা পড়ে না। সাত-আট বছর হলেই তারা অন্য বড়লোকদের গরু ছাগল চরায়, বাগানে কাজ করে। সবাই রোজগার করে।

সুধীর যখন কশাফলিয়ার প্রাইমারি স্কুলে পড়ে, ওর মাস্টার মশাই সাঁওতাল কালীপদ মাণ্ডি বললেন, 'সুধীরের মা! ছেলেটা তো ভালো, ওকে পড়াবে তো?'

মাথায় কাঠের বোঝা, ছেঁড়া কাপড় পরণে, মা বললেন, 'ব্যবস্থা করে দাও।'

কালীপদ মাণ্ডি ওকে নিয়ে গেলেন কাপগাড়ি স্কুলে। সে স্কুল খুব নাম করা। লোধা ছেলে সুধীর তো হস্টেলে হাঁপিয়ে ওঠে। স্কুলের পর গাছে চড়ব, পাখি মারব, মাছ ধরব, তা তো হয় না। তখন মাস্টার ভবেশ মাহাতো আর আরেক জন সাঁওতাল শিক্ষক ওকে নিজেদের হাতে নিলেন।

সুধীর শবর প্রথম বিভাগে পাশ করেছে এতে ওর মাস্টাররাও বেজায় খুশি। আমিতো খুশি হবই। আমার মনে হচ্ছে চোখে না দেখলেও আমার একটা নাতি পাশ করেছে।

সুধীর পাশ করার পর সরকারি অফিসার ওদের বাড়ি গেলেন। সত্যিই তো, একখানি পাতার ঘর। আর কাঠ কেটে বেচে এমন বাপ-মা। সুধীরের মাকে অনেক কথা বললেন।

'গরু বা ছাগল নেবে মা?'

'গরু ছাগল নিলে চরাবে কে? ছেলে মেয়ের পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। চাই না গরু ছাগল।'

'ফলের গাছ লাগাবে?'

'আমরা বুড়ো বুড়ি তো কাঠ আনতে যাব। গাছের যত্ন করতে গেলে ছেলেমেয়ের পড়া হবে না।'

'কি করে তোমাদের সাহায্য করব বলো?'

যার একটি আস্ত কাপড় নেই। সেই আরণ্য কন্যা সগর্বে বলল, 'আমার ছেলেমেয়েকে পড়তে সাহায্য কর।'

সুধীর, এই অবস্থায় থেকে, তবু প্রথম বিভাগে পাশ করেছে, তাকে ধন্য ধন্য বলব না?

সুধীরের মাকেও ধন্য ধন্য বলব। মা বড় না হলে ছেলে মেয়ে বড় হয় না। সুধীরের মা চারপাশে লোধা ঘরে দেখেছে, বাপ-মা গরিব, ছেলে মেয়ে পড়ে না। কালীপদ মাণ্ডি লোধা ছেলেদের ধরে ধরে স্কুলে আনেন। অনেকেই পালায়।

তা দেখে সুধীরের মা একবারও ভাবেননি আমার ছেলে গরু চরাক, আমার মেয়ে ওদের গোয়ালে কাজ করুক।

কাঠ বেচেই ওঁরা ছেলে মেয়েকে বই, খাতা, জামা কাপড় সাধ্যমতো কিনে দিয়েছেন। বলেছেন লেখাপড়া শেখো।

লোধা জাতির জন্মকথাটি ভারি চমৎকার।

ওরা শবর, যাকে বলে ব্যাধ, অর্থাৎ শিকারী জাতি। মেদিনীপুর, আর ওড়িশায় লোধারা আছে।

ওরা বলে ওরা কালকেতু আর ফুল্লরার সন্তান। কালকেতু আর ফুল্লরা ব্যাধ দম্পতি। গভীর জঙ্গলে গিয়ে কালকেতু শিকার করে আনে। যখনি সে বনে ঢোকে, দেখতে পায় আকাশনীলরঙা গন্ধরাজ ফুল বন আলো করে ফুটে আছে।

সেই নীল গন্ধরাজ ফুল না হলে আবার দেবী বনচণ্ডীর পূজা হয় না। রাজবাড়িতে মস্ত মন্দির। রাজার লোক যায় ফুল আনতে। ব্রাহ্মণ পুরোহিত পূজা করেন। কালকেতু তো ব্যাধ, নিচু জাত। সে দূর থেকে দেবীকে প্রণাম করে শিকারে যায়।

একদিন কালকেতু দেখে, মন্দিরে ঘন্টা বাজে না, পূজা হয় না, এমন তো কখনো হয়নি।

সবাই বলল, পূজা হবে কোথা থেকে? নীল গন্ধরাজ ফুল যে পাওয়া যায়নি।

কালকেতু মনের দুঃখে বনে গেল। সে যেই বনে ঢুকেছে, অমনি গাছে গাছে নীল গন্ধরাজ ফুটে উঠল। এক কোঁচড় ফুল নিয়ে কালকেতু ছুটে গেল মন্দিরে। মন্দিরের বারান্দায় উঠে পূজারীকে বলল। ঠাকুর, এই নাও ফুল।

তখনতো জাতের কড়াকড়ি খুব ছিল। ব্রাহ্মণ রেগে বলল, তুই ব্যাধ! তোর কাপড়ে জানোয়ারের রক্তের দাগ, গায়ে ধুলো মাখা। তোর ফুলে দেবী পূজা হয়? নিয়ে যা ফুল।

কালকেতুর বনচণ্ডীর ওপর খুব রাগ হ'ল। আমার ফুলে তোমার পূজা হয় না যখন, থাকল পূজা।

শিকারে যেতে তো অনেক বেলা হ'ল। বনে সেদিন একটি শিকার মিলল না। যত বাঘ-হাতি হরিণ, সব উধাও। শেষ অবধি কালকেতু পেল একটা সোনালি গোসাপ। সেটিকে নিয়ে ও চলল। আজ তোর মাংসই খাব। দুর্গা পূজার অষ্টমী আজ, আমি কি উপোস করে থাকব?

সেই গোসাপ বা গোধা তো আসলে দেবী বনচণ্ডী। কালকেতুর ঘরে এসেই তিনি দেবী হয়ে দেখা দিলেন। বনে লুকানো ধনরত্নের সন্ধান দিলেন। বললেন, ব্যাধ রাজা হও। নীল গন্ধরাজ ফুলে আমার পূজা করো।

কালকেতু আর ফুল্লরার বংশধররাই হোল শবর। লোধা শবর, খেড়িয়া শবর। ভারতে রাজ্যে রাজ্যে শবর আছে। রামচন্দ্রের জন্যে এক শবরীই প্রতীক্ষা করে বসেছিল।

কালকেতুর সে রাজ্য অন্যরা নিয়ে নেয়। শবররা গরিব হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

লোধারা আজও বিশ্বাস করে, অষ্টমী পূজার দিন যদি কোনো লোধা গোধা শিকার করতে পারে, সে কালকেতুর মতো ব্যাধ রাজা হবে।

বড় হলে জানবে, আদিবাসীদের বনচণ্ডীই আজ দুর্গা নামে পূজা পান। বিন্ধ্য পাহাড়ে এক অষ্টাদশভূজা দুর্গামূর্তি আছে, তাঁর এক হাতে একটি গোধা।

সুধীর শবর ওই শবর জাতিরই ছেলে। সে আরো লেখাপড়া শিখুক, তার মায়ের দুঃখ দূর করুক, এসো, পূজার সময়ে আমরা সেই ইচ্ছাই জানাই। ইচ্ছা হলে ওকে চিঠিও লিখতে পারো, সুধীর শবর, গ্রাম কশাফলিয়া, ডাক—দই পুখুরিয়া, থানা-জামবনী, মেদিনীপুর।

সুধীর খুব খুশি হবে।

একটি ছেলের গল্প

আমাদের বাড়ির গল্প তো এই কাগজের পড়ুয়ারা ভালবাসে, তাই এবার বাড়ির একটা ছেলের গল্পই বলা যাক। মনে হচ্ছে আমার ভাই ফল্গুর কথা কখনো বলিনি। বলব বলে ভাবিনি কখনো কিন্তু জুলাই মাসে ফল্গু এমন একটা বিচ্ছিরি ব্যবহার করে বসেছে যে তার কথা না বলে উপায় নেই।

খুব ছোটবেলায় ফল্গু মানে সর্বজীবে অপার দয়া। পথ থেকে রোগা ঠ্যাংঠেঙে কুকুরছানা নিয়ে আসত। তারপর কাতর গলায় বলত, দেখ মা! ঠিক হরিণের মত দেখতে।—রোগা কুকুর। ঘেয়ো বেড়াল সব এনে যত্ন করে সারিয়ে তুলতো। খুব ছোটবেলায় শীতকালে লালমাছদের "শীত করছে" বলে জল থেকে তুলে বাবার চুরুটের ছাই বোঝাই ছাইদানে ছাই চাপা দিয়ে রেখেছিল।

ফল্গুর জীবে দয়ার জন্য একবার, শান্তিনিকেতন থেকে ছুটিতে বাড়ি গিয়ে দেখি বাবা ও মার দুই দলে অসম্ভব মনকষাকষি চলেছে। বাড়ির কাজের লোকজন, গয়লা, চাপরাসী, রিকশাঅলা, এদের মধ্যে কেউ বাবার দলের কেউ মার দলের লোক ছিল।

কি হয়েছে ভেবে পাই না। বাবা বাড়ির কারো সাথে কথাই বলছেন না, কিন্তু সব কথা না কি নন্দন রিকশাঅলা আর বরমদেও চাপরাশীকে বলছেন।

শেষে বোঝা গেল ফল্গুর জীবে দয়ার কারণে ঘটক বাড়ির সব বিগড়ে গেছে। বাবাকে কে যেন 'খাবেন বাবু' বলে দুটো মুরগি আর মোরগ দিয়েছিল। ফল্গুর অস্ত্র ছিল বুথ সাহেবের ক্লচ্ছার মতো হাঁ করে কান্না। ফলে তাদের খাওয়া হয় নি। মার বক্তব্য, এরা স্বাভাবিক মুরগি নয়। কেন না তারা এত ডিম পাড়ে, সব ডিম ফুটে এত বাচ্চা হয় কে কবে দেখেছে। সে সব বাচ্চাও না কি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বড় হয়েছে এবং মুরগির জন্য তৈরি ঘরে থাকে না। যেখানে ইচ্ছে ডিম দিচ্ছে।

ফল্গু বলতে চেষ্টা করল, ওরা যে যার জায়গায় ডিম দেয়, সেটা মনে রাখা মানুষদের দরকার।

তেমন সুবিধে হল না। কেন না আমি নিজেই দেখলাম, বাবার সযত্নে রাখা তিন মন ওজনের গরম ওভার কোটের প্রতি পকেটে ডিম আর মুরগি। কয়েকটা অতি হতচ্ছাড়া। তারা আড়ায় টাঙানো লেপ তোশকের ওপর উড়ে বসে এবং

ডিম পাড়ে। স্বভাবতই ডিম সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে ভেঙে যায়। আয়নাটেবিলের দেরাজে ডিম, ছবির পেছনে ডিম, আলনায় টাঙানো শার্ট পাঞ্জাবী পরতে যাও, পকেটে মুরগির বাচ্চা।

বেশ কয়েক মাস ধরে কোথায় মুরগি, কোথায় ডিম, তাই বের করার জন্যে সকালে ভীষণ দৌড়-দৌড়ি করতে হল। আর, মোরগ ভোরে ডাকে, এ একেবারে গল্প কথা। রাতে সবাই মনে করল, ঘুমোবে। সারা রাত ধরে কিছুক্ষণ বাদ বাদই মোরগরা একসঙ্গে বিকট ডেকে ওঠে। ফল্গুর মুরগিরা কাপ ডিস কাচের গেলাস ভাঙত এও দেখেছি।

যা হোক, এ সব মুরগি একদিন রাণীখেত অসুখে সবাই ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে মরে গেল।

এখন মনে পড়ছে মুরগিগুলো ডিমে তা দিত না। তখন বর্ষার বৃষ্টিতে ফল্গু মুরগিদের চিত করে স্নান করাত। বলত, কুড়কি ছাড়াচ্ছি।

এর পরেও কেউ মুরগি পোষে? একা ন্যাদোশই কয়েক বছর ধরে যথেষ্ট জ্বালিয়েছে। মা তো স্পষ্টই বলতেন যে এ বাড়িতে পাখি পশুও যেন কেমন হয়ে যায়।

এরপরেও ফল্গু যথারীতি এক বুড়ো মুরগি তুলে আনল পথ থেকে। মিসেস দলুই নামে এক বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী, যাঁকে আড়ালে সবাই "দলি বুড়ি" বলত তাঁরই মুরগি।

ফল্গুর হাতে পড়ে তিন দিনে সে মুরগি তাজা হয়ে সকলকে ঠুকরে বেড়াতে থাকল। মুরগিকে ফল্গু 'দলি বুড়ি' বলেই ডাকত। সবাই শুনতে পেত, এই দলি বুড়ি ঘর নোংরা করল; তাড়া দে, তাড়া দে। এই দলিবুড়ি পালাচ্ছে, ধর্ ধর্।--সব মিসেস দলুইয়ের কানে পৌঁছত। বলা বাহুল্য তিনি খুসি হতেন না। তাঁকে তো আর বলা যায় না ঠাকুরদার জ্ঞান বাবুর মতো দেখতে একটা বেড়ালের নাম ছিল 'জ্ঞান বাবু' আর 'জ্ঞানবাবুর ঠ্যাং ভাঙব' শুনে তিনি বেজায় রেগে বেরিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের বাড়ি থেকে।

মুরগিপুরাণকে বোকা বানিয়ে দলিবুড়ি বহুদিন বাঁচে,বহু ডিম পাড়ে।

ঠিক ওপরের বোন কঞ্চি ছোটবেলা ছিল বেজায় পাজি। রাঙাদির চেলা ভালোমানুষ ফল্গু একবার এক ঝুড়ি ডিম নিয়ে উধাও। দেখা গেল, খাটের নিচে ও ডিমের ঝুড়ির ওপর উপুড় হয়ে আছে।

কি করছ ফল্গু ?

রেশম রেশম চুল, অবাক অবাক চোখ, ফল্গু বলল, ডিমে তা দিচ্ছি। বাচ্চা হবে।

একবার দুজন কে সাবান দিয়ে স্নান করিয়ে ধপধপে জামা পরিয়ে ভাত খাইয়ে ঠিক দুপুরে আমি পাশের বাড়ি গল্পের বই আনতে গেছি। আসার সময় দেখি

রাস্তায় উলটানো পিচের ড্রাম থেকে দুটো কালো ভূতের ছানা বেরোচ্ছে। কঞ্চির বুদ্ধিতে দুজনে পিচের ড্রামের রহস্য সন্ধানে ঢুকেছিল। আমি পিচে ভরা কানগুলো অব্দি জুত করে ধরতে পারিনি। তারপর একবার কেরোসিনে চোবাই, তারপর গরম জল আর সাবানে। বহুকাল দুজনের ভুরু আর চুলে পিচ লেগেই ছিল।

এই ফল্গু এর পরেই খেলাধুলো, সাঁতার, বক্সিং ব্যবসায়ীদের জমা নেওয়া গাছের আম চুরি, স্কুল পালিয়ে গঙ্গা সাঁতরে চরের তরমুজ চুরি—এই সব ভালো ভালো কাজ করতে করতে বড় হয়ে গেল।

বড় হয়ে সে যে এমন পাকা গপ্পিদাদা হবে তা সত্যি ভাবা যায়নি।

কলকাতায় একদিন, আমার ছেলে বাপ্পা তখন খুব ছোট; ফল্গু এসে বলল, শীগগির চলো। ভীষণ বিপদ।

—কি হয়েছে!

—ছোড়দা আর বসন্তদার কাণ্ড (বসন্ত চৌধুরী অবুর বন্ধু ছিল) কি বলো ত? রথের মেলা থেকে দুটো হরিণ এনে ছাতে তুলেছে।

—হরিণ? জ্যান্ত হরিণ?

—নইলে কি?

—ছাতে তুলল কি করে?

—তরকারি দেখিয়ে দেখিয়ে।

—তারপর?

—তারপর তারা ছাতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ছাদ ভেঙে যাচ্ছে। বাড়িওয়ালা চেঁচাচ্ছে, ছোড়দাকে তুলে দেবে।

আমি বাপ্পাকে বগলদাবা করে দৌড়লাম। গিয়ে কি দেখলাম বল তো? ছাতের কোণে ছোট্ট একটা ফুলের টব তার ওপর এত টুকুন দুটো মাটির হরিণ।

অবু বলল, দিদি! একগাদা চিংড়ি মাছ এনেছি। চাকরটা যাতা রাঁধে। ফল্গুকে বললাম, দিদিকে নিয়ে আয়।

এই হল ফল্গু। সেদিন ডিগবয়ে গেছে, শ্বশুরবাড়ির কে এক ভদ্রলোক, আগে বহরমপুরে ছিলেন। তিনি আমাদের পাড়ার যার কথাই জিজ্ঞেস করেন, ফল্গু বলে তিনি তো নেই।

—সে কি?

—মারা গেছেন।

—অমুক লোক?

—আমেরিকা গেছেন।

হয় মারা গেছেন। নয় আমেরিকা গেছেন। যাঁদের কথা হচ্ছে তাঁদের বয়েস সত্তর থেকে বিরাশি। কেউই মারা যাননি, আমেরিকাও যাননি। ফল্গুর যুক্তি হল,

বেঁচে আছেন বললেই সাতগুষ্টির খবর জানতে চাইবেন, তার চেয়ে এ রকম বলাই ভালো।

ওর চূড়ান্ত বজ্জাতির কথা সহকর্মীদের কাছে শুনলাম। ও কাজ করত পাটনায়। বিহারের অন্য কোথাও গেছে। ফল্গুরা কয়েকজনই ওষুধ কোম্পানীর লোক আর সেখানে এক ওষুধ দোকানের চার ভাই এসেছে। বিহারের নিয়ম হল, কেউ মারা গেছে খবর পেলেই মাথা ন্যাড়া করতে হয়। ফল্গু ওদের দেখেই বলেছে, আরে আরে এ কি দেখছি? আপনারা তো সর্বনাশ করেছেন?

—কেন ঘটক বাবু?

আরে, পাটনায় আপনাদের কাকা—! ওঃ, কি দুঃখের কথা। তা আপনারা মাথা কামাননি?

এ সব রটে গেলে মহা নিন্দে। চাব ভাই মাথা কামিয়ে নাপিত নিয়ে বাড়ি দৌড়ল। ব্যাস, দু বছরের ছেলে থেকে আশি বছরের বুড়ো সবাই মাথা কামিয়ে ফেলল। পরদিন ভোরেই ফল্গু হাওয়া। পাটনা থেকে ওষুধ ব্যবসায়ী কাকার তো আসাব কথা। তিনি এলেন। তারপর বোঝো সে কি ব্যাপার। অনেকগুলো ন্যাড়ামাথা লোক শুধু ঘটকবাবুকে খুঁজছে।

আমাকে একবার লিখেছিল, কলকাতা যেতে পারছি না। পাটনা এরোড্রোমে হাজার হাজার নীলগাই ঢুকে পড়েছে। আমি তোমার চিঠি লিখছি আর চারপাশে তারা ঘুরছে।

কে জানে সেটা সত্যি না গল্প। এখন হঠাৎ মনে পড়ল, ছোট্ট বাপ্পা চিড়িয়াখানা যেতে চায়। ফল্গু বলছে, আগে খরগোশদের ব্যবস্থা হোক, তবে যাবে। এখন চিড়িয়াখানায় ভীষণ গণ্ডগোল।

—কি হয়েছে রাঙামামা? —ফল্গু তো বাপ্পার চোখে বীরপুরুষ। তার সব কথাই সত্যি।

—দ্বীপে খরগোশরা ছিল, বুঝলি তো? কালো রাজহাঁসদের পিঠে চড়ে তারা চলে এসেছে আর সারা বাগানে ছড়িয়ে পড়েছে। খরগোশদের ব্যাপার তো? বাচ্ছা হয়েছে তাড়াতাড়ি আর চিড়িয়াখানায় ঢোকাই যাচ্ছে না। পায়ের নিচে খরগোশ চাপা পড়বে না?

ফল্গুর চেয়ে বড়ো গপ্পিদাদা আমি তো আর দেখিনি। আর দেখব বলে মনেও হয় না। এমন মানুষও আর দেখিনি, যে হাজির হলেই রোজকার একঘেয়ে দিনটা উৎসবের দিনের মতো আনন্দ ঝলমল হয়ে ওঠে।

বাকি দিনগুলো নিয়ে কি করা যাবে, ভেবে পাচ্ছি না।

লোকটা

লোকটার গায়ে কেমন বোতামআঁটা লম্বা পিরান। পায়ে নাগরা। পরনে চুড়িদার। মাথায় পাগড়ি। বয়স বছর পঁয়ত্রিশ হবে। ইস্কুলের বাইরে ও রোজ দাঁড়িয়ে থাকে আর তথাগতকে দেখে।

তথাগত ক্লাস সিক্‌সে পড়ছে। পড়াশোনা সহজে করে না। এর মধ্যে ওর কতবার মাথা ফেটেছে আর পা কেটেছে আর হাত ভেঙেছে তার হিসেব নেই।

লোকটার কথা তথাগত বাড়িতে বলেছিল। মা আর বাবা ভাবে সব কথাই ওর বানানো। কানই দেয়নি। তারপর মা বলল, কোন লোক কি মতলবে কোথায় ঘোরে, কখ্‌খনো কথা বলবে না।

বাবা বলল, ছেলেধরারা এখন নানা রকম পোশাকে ঘোরে। তুমি ওকে দেখলেই দরোয়ানকে বলে দেবে।

ও মা! সেদিন তথাগত দরোয়ানকে সবে বলতে গেছে, লোকটা একটা বাসে উঠে পড়ল।

বন্ধুরা বলল, তোকে হয়তো ধরবে।

—ধরে কি করবে?

—তোর বাবার কাছে টাকা চাইবে।

—দূর! বাবার আছে তো শুধু বই।

—হয়তো বই চাইবে। লোকটা হয়তো পড়ুয়া।

—বাবা দিলে তো! সব বই আলমারিতে রাখে বাবা।

তথাগত ভাবল, কি অ্যাডভেঞ্চারটা না হতে পারত। ওরকম অদ্ভুত পোশাক পরা লোকের ছবি তথাগত দেখেছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে, বাবার বইতে। ওরকম চেহারার একটা লোক, যার রং ফর্সা, গোঁফ সরু, চোখ দুটো রহস্যময়, তথাগতকে যদি ধরতে আসত?

তথাগত তো ভীষণ সাহসী। শুধু ঠাকুমার কাছে সত্যি ভূতের গল্প শুনে রাতে একলা ঘুমোতে একটু ভয় পায়। তবু তো সাহসী। আর টি. ভি. দেখে, বন্ধুদের সঙ্গে প্র্যাকটিস করে, দিসুম দিসুম ভালোই শিখেছে।

ছেলেধরাটাকে তিন দিসুমে অবাক করে দিত ও। বন্ধুরা ছুটে আসত। সবাই

মিলে ওকে পুলিশে ধরিয়ে দিত। "অমুক স্কুলের বালক! আশ্চর্য সাহস!" এসব কথা কাগজে বেরোত।

মাকে ও বলতেই পারত, হ্যাঁ, অঙ্কটা ঠিক কষে উত্তরটা ভুল লিখি। ইতিহাস লেখার সময়ে "আকব" লিখে "র" লিখতে ভুলে যাই। কিন্তু বীর বালক তো! বীর বালকদের অমন ভুল হতেই পারে। শিবাজীকে যদি "তথাগত" লিখতে হত, তবে? আর মহামতি আকবর তো মোটেই লেখাপড়া শেখেননি।

বলা যায় না, বলা যায় না।

লোকটা যদি শুধু ওকে দেখে যায়, তা হলে আর অ্যাডভেঞ্চারটা কোথায়?

কিন্তু একদিন তথাগত বাবার সঙ্গে বইয়ের ছবি দেখতে দেখতে বলে ফেলল, এ মা! একে তো আমি চিনি।

—চিনি মানে? জানো এ কে?

—আরে, ছবিতে ওর কানে মাকড়ি আর গলায় হার আছে। কিন্তু এই লোকটা রোজ আমার স্কুলের সামনে আসে। আমরা যখন বাস থেকে নামি, আমাকে দেখে। আবার যখন বাসে ওঠার জন্যে দাঁড়াই, আমাকে দেখে।

—বটে! বলেছিলি বটে! বলেছিলাম না দরোয়ানকে ডেকে ওকে দেখিয়ে দিবি?

—দেখাতে গিয়েছিলাম তো!

—তারপর?

—ভ্যানিশ। কোথায় চলে গেল।

—বাউ! বাজে কথা বলছ না তো?

—তুমি প্রসেনজিৎ, শান্তনু, পূষন, সকলকে জিগ্যেস করতে পারো। সেদিন সবাই ছিল।

—ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে তো!

—বাবা! লোকটা মহাবিশ্ব থেকে আসেনি তো?

বাউ অথবা তথাগতর বাবা ছোটবেলা গাছের মগডালে উঠত। কিন্তু তথাগত কিছু করলে বা বললেই বাবা ঘাবড়ে যায় আর ভীষণ চেঁচায়।

তথাগতর মার ওসব ভানভণিতা নেই। ছেলের কিছু হয়েছে বা হতে পারে ভাবলেই মা হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ করে না বটে, কিন্তু মূর্ছা যেতে থাকে।

সব চেয়ে অদ্ভুত কথা, তথাগতর বিষয়ে বাবা-মা তখন নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে থাকে। যেন "চাঁদের পাহাড়" পড়া, বেড়ালদের খবর রাখা, ফুটবল হকি খেলা একজন ষষ্ঠ শ্রেণীর রীতিমতো বড়ো ছেলে সামনে বসে নেই।

—কাল থেকে আর বাসে যাওয়া হবে না।

—বাসে ফেরাও হবে না।

—যত অসুবিধে হোক, আমার সঙ্গে যাবে, আমি গেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দেব।

— নিয়ে আসবে ত তুমি।

—অবশ্যই। শুক্রবার নাইট ডিউটি...

—সেদিন আমি যাব। কলেজ থেকে চলে যাব।

—প্রিন্সিপালকে বলতে হবে।

—লোকটাকে, ধরে ফেলতে পারলে...

বাবা গোঁফদাড়ি চুলকে বলল, ধরেই ফেলব।

তারপর বলল, বাউ! তুমি খেলার মাঠে একা যাবে না, মা সঙ্গে যাবে। ছেলে যারা ধরে, তারা যে কি ভয়ানক! তুমি অবশ্য তাদের চেয়েও ভয়ংকর। ধরলে ওরা ফেরত দিয়ে যাবে, তা আমি জানি। তবু সাবধানের মার নেই।

কোথাকার কে একটা লোক, তার জন্যে বাবার সঙ্গে স্কুলে যাও আর এসো! মার হাত ধরে খেলার মাঠে যাও!

বড়রা আসলে একেবারে বেজায় গোলমেলে লোক। দরকারি খবর ওদের না জানাতে পারলে ভালই হয়। তবে সে জন্যে বোধহয় আরেকটু বড় হওয়া দরকার।

ব্যস্, হয়ে গেল!

পরদিন গাড়ি চালাতে চালাতে বাবা বলল, মাকে বলিস না, আমিও গোয়েন্দাগিরি করব।

—কি করবে?

—লোকটাকে ফলো করব।

—বাবা, তুমি তো বললে না লোকটা কে?

আরে, বইয়ে যার ছবি দেখেছিস সে তো এক [illegible] শ বছর আগে মারা গেছে। নামটাম বাড়ি গিয়ে বলে দেব। এ লোকটা হয়ত তার মতো দেখতে।

—পোশাকও এক রকম, চোখও এক রকম।

—মেকাপ নিতে পারে। তা ছাড়া আমাদের দেশে কত রাজ্যের মানুষ কত রকম পোশাক পরে!

মজার ব্যাপার হল, যেদিন থেকে বাবা তথাগতকে পৌঁছতে আর আসতে লাগল, সেদিন থেকে লোকটা একেবারে উধাও। দেখাই যায় না তাকে। প্রিন্সিপাল বললেন, আপনার ছেলে একটু ভাবপ্রবণ!

—নজর রাখবেন কিন্তু।

—অবশ্যই, অবশ্যই। আমাদের কি দায়িত্ববোধ নেই?

দরোয়ান বলল, কিছু ভাবার দরকার নেই। তারা চারজন যদি তথাগতর মতো

কয়েকশো' কিছু ছেলের ওপর নজর রাখতে পারে, একটা লোকের ওপর নজর রাখতেও পারবে।

তারপর আশ্বাস দিয়ে বলল, আপনার ছেলে বহুত বিচ্ছু আছে, ওকে কেউ ধরবে না।

কি অপমানজনক কথাবার্তা তাই বলো!

দিন পনেরো বাদে বাবা বলল, এ মাসটা নিয়ে যাব—আসব। ওমাস থেকে আবার বাসে যাবে।

এর মধ্যে নানারকম বড় ব্যাপার ঘটে গেল।

তথাগতর বাবার জুতোর মধ্যে নেংটি ইঁদুর ছানা পেড়ে রেখে গেল। বুজুন দাদা কিছুদিন এসে থেকে গেল। তথাগতর এবং তার বাবার মিতুন মাসিকে একটা লোক দেড়শো টাকার সুগন্ধি টগরের গাছ বেচে গেল। নিশ্চয় বুঝেছ, নির্গন্ধ টগর ফুলে এসেন্স না আতর মাখানো ছিল। তথাগতর মার দাঁত তোলানো হোল। এ রকম নানারকম উত্তেজনার মধ্যে সেই লোকটার কথা তথাগতও ভুলে গেল। বুলু কাকা বলে গেল, ছেলেধরা? দেখলেই শূন্যে লাফ মারবি আর দু'হাত উঁচু করে চাপড় মেরে বলবি, বাবা কালী! মা শিব!—উল্টোপাল্টা শুনলেই দেখবি লোকটা স্ট্যাচু হয়ে গেছে। তখন ধরো, আর লেক গার্ডেন্স থানায় ঢোকাও।

বুলু কাকা যে কি বলে।

আবার তথাগত বিকেলে মাঠে খেলতে যেতে থাকল। গল্‌ফগ্রীনে চারদিকে পার্ক আছে, মাঠ আছে। দেরি হলে মা ওকে ডাকতে যায়। কিন্তু তথাগত রোজ তো এক মাঠে খেলে না। আজ এ মাঠ, কাল ও পার্ক, মা জানবে কেমন করে?

তথাগত সেদিন চলে গিয়েছিল সেন্ট্রাল পার্কে। সন্ধ্যা হয়ে আসে আসে, বল বগলে তথাগত ফিরছে হঠাৎ ঝোপঝাড়ের পাশ থেকে সেই লোকটা বেরিয়ে এল।

—সাধুজী! আপনি আমাকে এত কষ্ট কেন দিচ্ছেন?

তথাগতর গলা শুকিয়ে কাঠ, শরীর যেন পাথর।

—দোসরা বরাদ্দটা আমাকে কবে দেবেন?

—বাবা গো!

বলে তথাগত দৌড় লাগাল।

—দৌড়বেন না সাধুজী। এবার আমি আপনাকে...

—ওরে বাবা রে...

বড় ছেলেরা খেলা শেষ করে আড্ডা দিচ্ছিল।

—আমাদের বাউ না?

—অ বুলটু দা! আমাকে বাঁচাও। ছেলেধরাটা আমাকে ধরতে আসছে।

—বটে! আমাদের পাড়ায় ঢুকে...

বুলটুদারা লোকটাকে ঘিরে ধরল। তারপর স্মরণ দা' একখানা চড় কষাল।

লোকটার গাল ফেটে রক্ত ঝরছে। কিন্তু লোকটা কিচ্ছু করল না। বলল, মারতে মারতে আমাকে মেরে ফেলতে পারো? পারবে না।

একটা ইট তুলে স্মরণদার হাতে দিয়ে বলল, মারো, খুব মারো।

তারপর এক হাতে আরেকটা ইট তুলে নিয়ে আরেক হাতের পাশ দিয়ে মেরে ইটটা দু' টুকরো করে ফেলল ।

ছেলেরা তাজ্জব।

লোকটা পাথব পাথর গলায় বলল, তোমাদের সকলে একদিকে, আমি একা। লড়বে?

মাথা নেড়ে বলল, পারবে না। তোমাদের চেয়ে অনেক জোযান গোরা সোলজারের সঙ্গে লড়েছি। গোখরো সাপ ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলেছি। আমার সঙ্গে পারবে না।

কিছুক্ষণ বাদে বুলটুদা বলল, আপনি ওব পেছন পেছন দৌড়চ্ছেন কেন?

—ওই সাধুজী আমাকে একশো আটাশ বছব ধোঁকা দিয়ে পালাচ্ছে। ওকে ধরব না?

রাগলে তোতনদা তোতলা।

—বাউয়ের বয়স এগারো, তা জানেন?

—সে তো এই জন্মে।

—আপনি কি পাগল?

—বলতে পারো। চলো না ওঁর বাবার কাছে নিযে চলো আমাকে। সব দুঃখের কথা তাঁকেই বলব।

তথাগত বলল, আমি বাড়ি যাব।

—চলো সাধুজী। সব কথা বলি। তারপব তুমি আমাকে নিশ্চয় দয়া করবে।

তারপর চারদিকে চেয়ে বলল, কলকাতা! কলকাতা! কোনো দিন ভাবিনি কলকাতা আসব।

বুলটুদা বলল, ট্রেনে চাপলেই তো আসা যায়।

লোকটি ঈষৎ হাসল।। তারপর পাগড়ির কোণা দিযে গালটা মুছে ফেলল।

—আপনি কি বাঙালী?

—না। তবে বাংলায় এসেছি, বাংলা বলছি।

ওরা সবাই মার্চ করে তথাগতদের বাড়িতে ঢুকল। বাবা আর মা এমন তাজ্জব, যে টোকা মারলেই পড়ে যাবে। বাবা শুধু বলতে থাকল, অবিশ্বাস্য! অবিশ্বাস্য! আনবিলিভেব্‌ল! হোনি আনহোনি! দেয়ার আর মোর থিংস...

মা বলল, তুমি থামবে একটু ?

লোকটি বলল, এঁরা কেউ থাকবেন না। কথাটা খুব গোপন। বাবুজী, আপনাকে বলব, মাতাজী আর সাধুজীকেও বলব। তারপর আপনি আমাকে পুলিশে দিন, মারুন, আমি কিচ্ছু বলব না। সত্যি বলতে কি, মারতে মারতে কেউ যদি মেরে ফেলে...মৃত্যুই তো চাইছি।

তথাগতকে দেখিয়ে বলল, সাধুজী আমাকে এখনি মুক্তি দিতে পারেন! হয় তো দেবেন।

তারপর সকলকে অবাক করে তথাগতকে ও প্রণাম করল। মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে তথাগতর পা ছুঁল।

বাবা ওকে হাত ধরে তুলে বসালেন। ছেলেদের বললেন, তোরা চলে যা ভাই। কাছে পিঠে তো আছিস। ও কি বলে তা শুনে নিই। দরকার পড়লেই ডাকব।

মা বললেন, এই যে জল আর তুলো। গালটা মুছে ফেলে এই ডেটল ক্রীমটা লাগান।

—না মাতাজী! দাওয়াই লাগবে না।

—কিছু খাবেন?

বিষণ্ণ হাসল লোকটি। বলল, না, আগে সব কথা বলব। সাধুজী আমার ব্যবস্থা করলে তবে খাব।

বাবা দরজা বন্ধ করে বসল।

ভীষণ, ভীষণ উত্তেজনা বাবার। আলমারি খুলে একটা মস্ত বই বের করল।

লোকটি বলল, থাক বাবুজী।

তথাগত বলল, ওই বইটায় তোমার...আপনার ...ছবি আছে। আমি দেখেছি।

একটু হাসল ও। হাসলে মানুষকে খুশি দেখায়। লোকটি যখন হাসল, মনে হল ওর মতো দুঃখী আর ক্লান্ত কেউ নেই। হেসে ও বলল, চার্লস ইস্টনের বই! তাতে চিন্তামণি আত্মারাম পেনধারকরের ছবি দেখেছ। অহংকার ছিল খুব। ছবি আঁকিয়েছিলাম। কানে মোতি, গলায় মোতি, পাগড়িতে একটা ছোট হীরে, আঙুলে আংটি।

বাবা বলল, কিন্তু ও ছবি তো...

লোকটি উদাস গলায় বলল, বাঁধাই করিয়েছিলাম সোনা দিয়ে, অহংকার ছিল

তো! তা বিঠুরের বাড়ি যখন লুঠ করল, ছবিও নিয়ে যায়। আমি তো তখন মস্ত এক আসামী। ধরলেই বলবে, "লটকাও! লটকাও!"

সগর্বে বলল, ধরতে পারেনি।

বাবা বলল, একটু খুলে বলবেন? কিছু মনে করবেন না, আপনার কথা আমি টেপ করে নেব।

—যা ইচ্ছা করুন। আমার কি এসে যায় বলুন?

—এবার বলুন।

—বলব। বিশ্বাস করা-না-করা আপনার ইচ্ছা। তবে আমি যেমন চিন্তামণি আত্মারাম পেনধারকর, যিনি আপনার ছেলে, উনিও তেমনি নেপাল তরাইয়ের মস্ত সাধু এক তুলসী পাতা স্বামী। একটা তুলসীপাতা সেবা করতেন। গোপন এক জঙ্গলে একা থাকতেন। সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না, ওঁর কাছেই...

তথাগত আর ওর মা উত্তেজনায় পাথর!

বাবুজী! আঠারো শো' সতাবনে খুব যুদ্ধ হয়েছিল। হাঁ হাঁ, আজাদীর জন্যে। অংরেজ রাজাকে হঠাব আমরা। দিল্লীতে বাহাদুর শাহ্ হবেন বাদশা। নানা ধুন্ধুপন্থ্ ফিরে পাবেন পেশোয়াশাহী, খুব লড়াই হয়েছিল।

তথাগত বলে ফেলল, ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ! আমি পড়েছি।

—হাঁ সাধুজী! তুমি তো জানবে।

—আপনি সেই যুদ্ধে ছিলেন?

—নিশ্চয়। খোদ বিঠুরে ছিলাম। শ্রীমন্ত্ নানা ধুন্ধুপন্থ্ পেশোয়ার কাছের মানুষ ছিলাম। বিঠুরে আমার বাড়ি ছিল গঙ্গার ওপরে। আমার শখ ছিল তরোয়াল চালানো। তা ছাড়া বন্দুকও ছিল। ছেলে ছিল, মেয়ে ছিল, বউ ছিল, মা, বাবা আর কত কত আত্মীয় ছিলেন। আমার শিব মন্দির ছিল। রোজ পূজা করতাম।

বাবা বলল, তা হ'লে আপনার বয়স?

—আমার জন্ম বিক্রম সংবৎ দু'হাজার পঁয়তাল্লিশে, অংরেজী সাল আঠারো শো' পঁচিশে। আপনাদের হিসাবে একশো তেষট্টি।

—কিন্তু..কিন্তু,

—এই অভাগার কাহিনীই তো সেটা বাবুজী! আঠারো শো' সতাবনে আমি বত্রিশ বছরের প্রৌঢ়। এখন আপনারা বত্রিশ বছরকে যুবক বলেন, আমরা বলতাম প্রৌঢ়। ষোল বছরের মেয়ে, তার বিয়ে হয়েছে। চৌদ্দ বছরের ছেলে, বিয়ে হয়েছে, বউ বড় হলে আনব। বউয়ের দশ বছর বয়স,বারো হলেই আনব। পরিবারে বাবাই কর্তা, আমি তো বড় ছেলে...

—আপনাকে দেখে...

—সুন্দর বারিষ হচ্ছে, ঠান্ডা দিন, মনে করুন না রূপকথা শুনছেন? আমার চেহারা তো আঠারো শো' ষাট সালের পর বদলায়নি। তখন আমার বয়স পঁয়ত্রিশ ছিল, এখনো সেই চেহারাই আছে। এটাই তো অভিশাপ।

—বসুন, বসুন। কিছু খাবেন?

মা বলল, ফল, মিষ্টি, দুধ?

—না মাতাজী। সূর্য ডুবলে আমি কিছু খাই না এখন।

—সারাদিন কিছু খেয়েছেন?

লোকটি আপনমনে বলে, সে ভারতের কিচ্ছু তেমন নেই। এ যে কেমন আজাদী তাও বুঝতে পারলাম না। একশো আটাশ বছর ধরে ঘুরছি আর ঘুরছি। কিচ্ছু চিনতে পারি না। সব বদলে গেছে। কিন্তু আমি কিছু খেয়েছি কি না, সে কথা তো একশো আটাশ বছরে কত শত বার কতো মা-বোন—মেয়ে জিগ্যেস করতে ভোলেনি। আমার ভারতে মেয়েরা যেমন ছিল, এই ভারতেও মেয়েরা তেমনি আছে। বাবুজী, এটা মস্ত বড়ো কথা।

তারপর বলল, এই শরীরটা অনেক খেয়েছে মাতাজী। এখন যত পারি কম খাই। তাতে যদি মৃত্যু আসে! মৃত্যু তো আসে না। এ কি অভিশাপ!

—ইতিহাস বলছে আপনি মৃত।

—ইতিহাস! ইতিহাস তো লেখাই হয়নি বাবুজী। আমার কথা আপনি পাগলের প্রলাপ মনে করছেন। আপনার চোখ তা বলে দিচ্ছে। তবু বলে যাই!

—বলুন!

—বিঠুরে আংরেজ এসেছিল! তারা পুরো বিঠুর নগরী ধ্বংস করে দেয়। অনেক পরে শুনেছি আমার বাড়ির মেয়ে, শিশু, সকলকে নিয়ে মা গঙ্গায় ঝাঁপ দেন। আর বাবা সব পুরুষদের নিয়ে লড়ে লড়ে মারা যান।

—আপনি তখন কোথায়?

—আমরা তো চলে গেছি শ্রীমন্ত পেশোয়ার সঙ্গে নেপালের তরাইয়ে। বহোৎ বারিষ! জঙ্গলও খুব ঘন। এখানে আজ, ওখানে কাল। পেশোয়াজীর হীরে মুক্তো দিয়ে গ্রাম থেকে চাল, আটা কিনছি। আস্তে আস্তে আমি দলছুট হয়ে গেলাম, সঙ্গে দত্তাত্রেয় আর শিবপ্রসাদ। আমি তখনো ভাবছি জঙ্গলে পলাতক সিপাহী, যোদ্ধা, এদের এক জোট করব। আংরেজকে আবার হটাব, লড়াই করব। টাকা চাই, বন্দুক চাই। কামান চাই, ঘোড়া চাই...

—তখনো যুদ্ধের কথা ভাবছেন?

—কেন ভাবব না? আমরা কেন হেরেছিলাম সে কথা একশো বার আমরা আলোচনা করতাম। দত্তাত্রেয়, শিবপ্রসাদ আর আমি। সে কি ভীষণ জঙ্গল, কি বারিষ! সাঁপ, বাঘ, হাতি, জোঁক। কি ছিল না সেখানে? রাতে গাছের ডালে থাকতাম। সে সব কথা ইতিহাসে লেখা নেই। তারপর খাবার যখন ফুরিয়ে গেল, হাঁটতে হাঁটতে আমরা পথের ধারেই পড়ে যাই, জ্বরে বেহোঁশ। জ্ঞান যখন হল, তখন আমি একতুলসী স্বামীজীর ওখানে।

তথাগত কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আর...ওরা...?

—আপনি তো জানেন সাধুজী। দত্তাত্রেয় আর বলবন্ত মরে গিয়েছিল। একতুলসীজী ঝোরায় স্নান করতে এসে আমাকে জীন্দা দেখে কোলে তুলে তাঁর লতাপাতার কুঠিয়াতে নিয়ে যান। লতাপাতার ওষুধ দিয়ে জ্বর সারান। বনের ফল, একরকম লতার রস খাইয়ে আমাকে তাগড়া করে দেন। আর আমার এই পোশাক, যা গায়ে ছিল, তাঁর পরশে নতুন হয়ে গেল।

রূপকথা, কিন্তু বড় সুন্দর রূপকথা।

—তারপর কি হল?

—সাধুজী বললেন, তুমি কি চাও? —আমি মূর্খের মতো বললাম, আমাকে অমর করে দাও, যাতে আংরেজকে লড়াই করে হটাতে পারি। সাধুজী একটু চুপ করে থাকলেন। বললেন, বেটা! জীবন শেষ হয় মৃত্যুতে। আমি তোমাকে বলছি, অনন্ত জীবন চেও না। একদিন দেখবে মরতে চাইছ, মরতে পারছ না। সেদিন আমাকে তুমি কোথায় পাবে?

—তা আমি বললাম, আপনাকে পাব না?

—উনি কি বললেন?

ওঁর চোখ যেন জ্বলতে লাগল। বললেন, ভগবানের নিয়ম তুমি উলটে দিতে চাও? বেশ! আমিও আজ উনিশ শো সতেরো সংবতে বলছি, দু'হাজার সাতান্ন সংবতের মধ্যে আমি চার বার জনম নেব। কোথায় জনম নেব, কি পরিচয় হবে তুমি জানতে পারবে। কিন্তু দেখা হবে না আমার সঙ্গে। দেখা না হলে তুমি মুক্তি পাবে না। যাও আমার কুঠিয়া ছেড়ে। তবে কিছু দান করব তোমাকে। এই দেহ বৃদ্ধ হবে না, এ পোশাক জীর্ণ হবে না। সসাগরা জম্বুদ্বীপে সকল স্থানের ভাষা বুঝতে পারবে। বলতে পারবে। ক্ষুধা তৃষ্ণাও জয় করতে পারবে। যাও, নিজের অভিশাপ নিজে ডাকলে। দু'হাজার সাতান্ন সংবতে আমি মুক্ত হব, আর জন্ম নেব না। আর চার জন্মই কাটাব তপস্যায়।

—তাই কি সত্যি হল?

—খুব, খুব সত্যি সাধুজী। আমি তো কুঠিয়া ছেড়ে ঘুরতে ঘুরতে দেখলাম, আংরেজের সঙ্গে লড়বে এমন ফৌজ বানাব সে ক্ষমতা আমার নেই। কে লড়বে! সব জায়গায় আংরেজ। তখন মনে মনে মৃত্যু চাই। মৃত্যু আসে না। বিঠুর দেখে জলে আমিও ঝাঁপ দিলাম, ঠেকে গেলাম বালির চড়ায়।

—সেই সাধুজী?

—সে কি অবস্থা আমার! দেশ বদলে যাচ্ছে, রেল দৌড়াচ্ছে, নতুন শহর গড়ে উঠছে। পড়ে থাকি পথের ধারে। হঠাৎ একদিন শুনলাম, সাধুজীর গলা। রামেশ্বরমে চলে এসো, সাধু ত্রৈলোক্য স্বামীকে খুঁজে নাও।

—গিয়েছিলেন?

—গেলাম। আমি যেদিন ওঁর কাছে পৌঁছলাম, সেদিনই উনি দেহরক্ষা করেছেন। আমি হাহাকার করে কাঁদলাম। ওঁর সেবকরা বললেন, আপনি আসবেন, উনি বলেছিলেন।

—এ তো একবার!

—বাবুজী। ঠিক সময়ে ওঁর নির্দেশ শুনেছি, দৌড়ে গেছি রাজস্থানের গ্রামে...দেখা হয়নি... গেছি অমৃতসর... দেখা হয়নি...একেক বার একেক ঘরে জনম, আর আমি পৌঁছাবার আগেই মৃত্যু...জীবনের নিয়ম উলটে দিয়েছি, তার অভিশাপ!

—আমার ছেলেকে সাধুজী মনে করলেন কেন?

—আর তো কোনো নির্দেশ পাই না। পাগলের মতো ঘুরতে ঘুরতে এলাম এই শহরে। অহংকার তো ভেঙে গেছে আমার। সবাই আংরেজি বলছে, বিলাত দৌড়াচ্ছে, কেমন আজাদী তাও বুঝি না। একথা কি সত্যি, যে আজাদী এসে গেছে?

তথাগত বলল, একচল্লিশ বছর আগে।

—এত মানুষ ভুখা নাঙ্গা, আবার এত মানুষ আমীর, আমি চিনতে পারি না কানপুর, জালৌন, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, নেপাল। আমার কাছে সব অচেনা। আমি মৃত্যু চাই, মৃত্যু চাই, কোথাও নেই আমার আপনজন, আমি আমার পাপের ক্ষমা চাই। বাঁচতে চাই না, মৃত্যু আসে না।

ও বিড়বিড় করে বলল, শরীর তেমনি আছে, পোশাক জীর্ণ হয় মা, এ কি অভিশাপ!

—আপনি আমার ছেলেকে সাধুজী ভাবলেন কেন? এর কি কোনো কারণ আছে?

হতাশ উদ্ভ্রান্ত চোখ তুলে ও বলল, নির্দেশ তো উনি দেননি। শুধু সেদিন যেন বললেন, কলকাতা! কলকাতা! আর ঘুরতে ঘুরতে ওই বিদ্যালয়ের কাছে দাঁড়িয়েছি, আপনার ছেলে চেঁচিয়ে বলল, দূরে কেন? কাছে এসো! বলোনি সাধুজী?

তো আমি ধরে নিলাম একতুলসীজী আমার সঙ্গে বালক সেজে ছলনা করছেন। ওকে যতদিন দেখেছি, ও এক কথাই বলে। কেন বলে?

তথাগত মুখ নিচু করে বলল, বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে আমরা তো ল্যাং প্র্যাকটিস করি। অরিন্দম ল্যাং মেরে পালায়। তাকেই চ্যালেঞ্জ করি।

—না সাধুজী! এ তুমি ঠিক বলছ না।

—সত্যি বলছি, সত্যি, সত্যি, সত্যি!

লোকটি তথাগতর দিকে চেয়ে থাকল।

—বিশ্বাস করুন...

ও যেন অনেক দূর থেকে বলল, নেপালে তোমার কুঠিয়া ছিল না? রোজ একটা অজগর সেখানে আসত না? ঝোরা থেকে জল এনে তুমি আমায় স্নান করাতে না?

—আমি...নেপালে...যাইনি...

—রাজস্থানে যোধপুরের কাছে সেই গ্রামে সবাই তোমাকে "বালক বাবা" বলত না?

—আমি রাজস্থানে যাইনি।

—অমৃতসরের কাছে এক জায়গায় গ্রামে তুমি "শুদ্ধসত্ত্ব" নামে তপস্যা করোনি?

—না, না, না।

তথাগত মার কোলে মুখ লুকাল।

লোকটি কপালের রগ টিপে বসে রইল।

বাবা বলল, দেখলেন তো কোনো মতেই আমার ছেলে সেই সাধুজী নন?

লোকটি চোখ মুছল। করুণ হেসে বলল, না। শিশু কখনো মিথ্যা কথা বলে না। এ জীবনের সমাপ্তি চাই বলে বড় মরিয়া হয়ে উঠেছি তো! তাতেই এরকম ভুল করলাম... মাপ করবেন বাবুজী, মাতাজী। তুমিও মাপ করে দিও আমাকে বালক! আর আমাকে দেখতে পাবে না।

বাবা বলল, কোথায় যাবেন এখন?

তথাগত বলল, বাবা, ওঁকে থাকতে বলো।

লোকটি মাথা নাড়ল। খুব জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, না না! আমাকে যেতে হবে। কোনো নির্জন জায়গায় কমন পেতে শুয়ে থাকতে হবে। এই শহরে কোথায় তিনি আছেন, নির্দেশ পেতে হবে। বাবুজী! তিনি যদি মুক্ত হয়ে যান? যদি এবার তাঁকে ধরতে না পারি?

হঠাৎ সে হাহাকার করে চেঁচিয়ে বলল, পৃথিবী যতদিন, আমিও ততদিন। এতবড়

শাস্তি আমাকে দিও না একতুলসীজী, যেখানেই থাকো। আমি অনুতপ্ত, দয়া করো, ক্ষমা করো, আমাকে অমর করেছ, এবার মৃত্যু এনে দাও।'

ঘরটায় যেন হাহাকার ঘুরতে লাগল ওর।

তারপর, নমস্তে! তোমরা শান্তিতে থাকো। তার দুঃখের, আর মূর্খতার কথা স-ব শুনেছ বলে চিন্তামণি আত্মারাম পেনধারকর একটু শান্তি পেল একশো আটাশ বছর পরে। একথা এ হতভাগ্য কখনো ভুলবে না।

দরজা খুলে বেরিয়ে গেল চিন্তামণি আত্মারাম পেনধারকর। শ্রীমন্ত্ নানা ধুন্ধুপন্থ পেশোয়ার বিশ্বস্ত মানুষ। ইংরেজকে তাড়াবে বলে যে অমর হতে চেয়েছিল।

তথাগত দেখছিল জানলা দিয়ে। চলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে ও।

মা কেঁপে উঠে তথাগতকে কাছে টেনে নিল।

বাবা ক্যাসেটটা খুলে নিল।

—ও কি করছ বাবা?

—মুছে ফেলছি ওর কথাগুলো।

—কেন, বাবা?

কেন রাখব বল্? ঘটনাটা সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, মানুষটা বড় দুঃখ।

তথাগত কেঁদে ফেলল।

—বড়দের বলে দেবে, প্রণাম করলে "চিরজীবী হও" যেন কখ্খনো না বলে।

মা বলল, কেঁদ না বাউ। দেখো, উনি ঠিক ওঁর সাধুজীকে পেয়ে যাবেন।

—ওঁর সব কথা কি সত্যি?

এ কথার কি উত্তর দেওয়া যায়, তোমরাই বলো। সব প্রশ্নের কি উত্তর আছে?

মা বাউকে চুমো খেয়ে বলল, ওঁর কাছে সত্যি। আমরা কিছু জানি না, কি বলব বল্?

ঝারোয়ার জঙ্গলে

মইনু, সোনাম আর তাতা এখনো জানে না ওদের সেই ঝারোয়া জঙ্গলের অভিজ্ঞতাটা সত্যি, না মিথ্যে না স্বপ্ন। অথচ এ কথাও সত্যি যে ওরা চারজন ঢুকেছিল জঙ্গলে। বাদল আর কোনদিনই ফেরেনি।

বাদলের জেদেই ঝারোয়া যায় ওরা। নইলে ঝারোয়ার নাম ওরা শোনেইনি কোনোদিন। বাদলের কাকা পালামৌয়ের এক জঙ্গলে কাঠ কাটবার ঠিকাদার। এ বছর মার্চ মাসে বাদল ওঁর সঙ্গে কাজে লাগবে। স্কুল থেকেই চারজন বেজায় বন্ধু। মইনু আর তাতা সবে ব্যাঙ্কে ঢুকেছে। সোনাম ওর বাবার খবরের কাগজের আপিসে ঢুকবে এবার।

বাদলই বরাবর বেজায় ছটফটে আর খেয়ালী। স্বাস্থ্যটা ওর রীতিমত ভালো। দেখলে বাঙালী ছেলে মনে হয় না। বাদলের উৎসাহে ওরা সাইকেলে ভারতবর্ষ ঘুরেছে। হিমালয়ে উঠেছে কয়েকবার।

বাদলের একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। কি সে ক্ষমতা, কয়েকটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবে।

"তরুণ দল" ক্লাবের সঙ্গে সেবার ওরা গঙ্গোত্রীর কাছে এক গ্লেসিয়ারের গতিপথ দেখতে গিয়েছিল। যেখানে বেস্‌ক্যাম্প করার কথা, বাদল বলল, এখানে নয়। এখানে ভীষণ দুর্ঘটনা হবে।

দলের নেতা মোহনবাবু চটে গেলেন। তিনি একজন পাকা পর্বতারোহী। সঙ্গে আছে তিনজন অভিজ্ঞ শেরপা। তাঁরা বুঝছেন না, বাদল বেশি বুঝছে?

বাদল বলতে গেলে তাঁকে অমান্য করেই বন্ধুদের নিয়ে ফিরে গেল তাঁবুতে। আর সেই রাতে চাঁদের আলোয় যখন ধুয়ে দিচ্ছে বরফের আঙিনা, অপ্রত্যাশিত বরফের ধস্ নেমে মোহনবাবুদের বেস্‌ক্যাম্প নিশ্চিহ্ন করে দিল।

ঠিক এমনি ঘটে আগ্রায় তাজমহল দেখতে গিয়ে। হঠাৎ বাদল বলল, এক্ষুনি চল্ এখান থেকে। কিছু একটা ঘটবে। থাকলে জড়িয়ে পড়ব।

ওদের খুব কাছে বসে নিথর হয়ে তাজমহল দেখছিল একটি যুবক। তার মত নিবিষ্ট হয়ে তাজমহল সেদিন আর কেউ দেখেনি।

ওরা তো চলে এল। তার আধঘন্টা বাদেই না কি দুজন লোক এসে যুবকটিকে লক্ষ্য করে দুমদাম গুলি ছোঁড়ে। যুবকটিও প্রস্তুত ছিল। দু পক্ষের সে লড়াইয়ে যুবকটি মরল। কয়েকজন ভ্রমণার্থী জখম হল।

বাদল আগে থেকে অশুভ কিছুর আঁচ পেত। মইনু, সোনাম আর তাতা তো তা স্বচক্ষে দেখেছে। ঝারোয়াতে গিয়ে কি হল?

সব যেন দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়।

মার্চে কাজে লাগবে বাদল। খুব উত্তেজিত। জঙ্গল ঘুরবে, কত রকম রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হবে। বাদলই বলল, তোরাও চল্। কয়েকদিন থেকে চলে আয়।

শিকার করা যাবে?

যাঃ, শিকার করা বারণ। পাখি টাখি মারতে পারবি।

আর এক আধটা হরিণ—

থাকব কোথায়?

কাকার বাংলোতে। কাকা বিয়ে করল না: সারা জীবন কাটাল জঙ্গলে জঙ্গলে। এক সময়ে বর্মায় হাতি ধরত। চল্ না, গল্প করবে জমিয়ে।

বাদলের কাকা থাকার জন্যে জায়গা বেছেছেন বটে। ট্রেন থেকে নামো কোমান্ডি নামে একটা জঙ্গলঢাকা স্টেশনে। তারপর কাকার জীপে চল্লিশ মাইল ভিতরে চলো। সুমা নামের একটা জায়গা। সুমা নদী পাথরে পাথরে নেচে বয়ে গেছে এঁকেবেঁকে। কাকার বাংলোর চারদিকে উঁচু কাঁটাতারের বেড়া।

এক সময়ে এখানে বক্সাইটের খনির কাজ শুরু হয়েছিল। বেশ কয়েক বছর কাজও হয়। তারপর খনির কাজ কেন যেন বন্ধ হয়ে যায়। খনির কাজের জন্যে তৈরি রাস্তাগুলো এখনো আছে। সেই পথেই কাঠবাহী ট্রাক চলে যায় ডালটনগঞ্জ।

দেখা গেল কাকা সংক্ষেপে জবাব দেন।

কাঁটা তারের বেড়া দিয়েছ কাকা?

হাতি আসে।

বেড়া উপড়ে ফেলতে পারে না?

পারে, ফেলে না। প্রখর বুদ্ধি রাখে।

মার্চ মাসেই বিকেল নাগাদ বেশ ঠান্ডা, সন্ধে থেকে শীত শীত।

বনতিতিরের রোস্ট আর চাপাটি খাওয়া হল। কফি খেয়ে কাকার মেজাজ যেন একটু খুশি হল।

তোরা তো এলি, কিন্তু সময়টা ভাল যাচ্ছে না। ভালো জঙ্গলটাতেই কাজকর্ম বন্ধ, কি যে হবে!

কেন? কাজ কর্ম বন্ধ কেন?

কি যে বলি, নিজেই বুঝছি না।

বল না, বল না।

ওই পাহাড়টার ওপারে ঝারোয়ার জঙ্গল। কখনো হাত পড়েনি, ভালো ভালো শালগাছ অঢেল।

কাকা কাহিনীটা বললেন। জঙ্গলটা জমা নেয় ,এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। নেয় খুব অদ্ভুত কারণে। নির্জনে থাকবে বলে নেয়।

একটা বাড়ি বানায়। বউ নিয়ে আসে। জানা যায় ওদের একটি বাচ্চাও জন্মায়। সপ্তাহে সপ্তাহে ধীলন হাটে আসত সওদা করতে।

হঠাৎ পর পর কয়েক সপ্তাহ তার দেখা নেই।

অবশেষে এক অবিশ্বাস্য খবর আসে কাকার কাছে। ধীলনের জীপ গাড়িটা রাস্তায় পড়ে আছে। আর ধীলনের মৃতদেহ পড়ে আছে তার বাড়িতে। বউ আর বাচ্চা উধাও।

কাকা তো গেলেন। তিনি দেখলেন ধীলন তার বারান্দায় পড়ে আছে। তার মুখে চোখে অবিশ্বাস্য আতঙ্কের ছাপ। ঘরের মধ্যে পড়ে আছে বিশাল গ্রেট ডেন কুকুরটা। ধীলন বা কুকুর, দুটো মৃতদেহেই এক ফোঁটাও রক্ত নেই। ধীলন কাগজের মত সাদা।

বউ বা বাচ্চার কোন খোঁজ নেই।

খোলামেলা বাড়িতে মৃতদেহ পড়ে আছে। হায়েনা বা শিয়াল টানাটানি করেনি।

কাকার জঙ্গলকুলিরা বলল, এ কোনো পিশাচদানোর কাণ্ড।

আর তাদের কাছেই কাকা জানতে পারলেন। ধীলন বিয়ে করেছিল একটি মেয়েকে, যার কোনো কুলুজিকুষ্ঠি সে জানত না। জঙ্গলের মধ্যে একা একা মেয়েটিকে ঘুরতে দেখে সে নিয়ে আসে ও বিয়ে করে। গজাড় জঙ্গলে একা একা কি কোনো মানুষের মেয়ে ঘোরে?

কাকা সে কথায় কান দেননি একেবারে। জঙ্গলে কাজ করতে হলে অত ভীতু হলে চলে না। আর এ কথা তিনি জানেন যে কুলিদের বেজায় বিশ্বাস ভূতপ্রেত, দেওপিশাচে। তিনি ধীলনকে দাহ করান, কুকুরটিকে কবর দেওয়ান। বাড়িটা বন্ধ করে চলে আসেন জীপটি নিয়ে।

তারপর জঙ্গল আপিসের সহায়তার ধীলনের কে আছে, না আছে খোঁজ নেন। অবশেষে রাঁচি থেকে এল ভার্মা নামে একটি ছেলে। ধীলন তার মামা। ভার্মা বলল, আমি ওখানে বাস করব না। বাড়িতে যা আছে তা জীপে চাপিয়ে নিয়ে রাঁচি চলে যাব।

ভার্মার সঙ্গে তার এক বন্ধুও এসেছিল। কোনো জঙ্গলকুলি ওদের সঙ্গে গেল না। তারা সাফ বলে দিল। জানোয়ারের ভয় করি না। যেখানে জানোয়ার অব্দি ঢোকে না, সেখানে কে যাবে?

কাকা তাঁর হেড কুলিকে ধমকালেন। হেড কুলির নাম দাসাইন ওরাওঁ। সে বলল, বাবু! আমরা তো যাবই না। ওই বাবুও যেন না যায়।

ভার্মা সে সব কথা উড়িয়ে দিল। ভার্মারি কাছেই কাকা ওই জঙ্গলটা ইজারা নিলেন। আদিম অরণ্য, বড় বড় শাল গাছ, প্রত্যেকটা গাছ খুব দামে বিকোবে। ভার্মা যাবার দিন হাটেও দেখা হল। ভার্মা বলল, কাল সকালে একবার আসবেন। একটু চা বানিয়ে আনলে তো কথাই নেই।

সেই শেষ দেখা। পরদিন সকালে থার্মস্ ভর্তি চা নিয়ে ঝারোয়ার জঙ্গলে হাজির হয়ে কাকা দেখেন ভার্মা এবং তার বন্ধু ঘরের মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে আছে। দুজনেই মৃত, দুজনের চোখ অবিশ্বাস্য আতঙ্কে বিস্ফারিত, দুজনের শরীরই রক্তশূন্য।

ছেলেরা বলল, তারপর?

দুজনের গলাতেই ছোট ছোট পাংচারের দাগ ছিল।

তার মানে কি?

জানি না। পুলিস এখনো খোঁজ চালাচ্ছে। কিন্তু কোনো কিনারা হয়নি। শুধু ভয়ঙ্কর আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। কেউ যাচ্ছে না ওখানে গাছ কাটতে।

পুলিস যাচ্ছে না?

কয়েকবার গেছে। সেও এক রহস্য।

কি রকম?

বাড়িটা পুলিস বন্ধ করে তালা মেরে আসছে। পরে গিয়ে বাড়ি খোলা পাচ্ছে। সব ঝকঝকে তকতকে। কে বলবে যে বাড়িতে মানুষ থাকে না।

তার মানে কি?

কোনো মানুষ আছে এর পেছনে। আমার তাই বিশ্বাস। হাজার সত্তর শাল গাছ, করম গাছ, তেঁতুল গাছ, লাখ লাখ টাকার জঙ্গল তো। কেউ আতঙ্ক সৃজন করছে।

কাকা খুব মুশড়ে পড়েছেন মনে হল। ঝারোয়ার জঙ্গলের ওপর খুব ভরসা করেছিলেন।

বাদল বলল, তুমি ভাবছ কেন? আমরা চারজন আছি, বন্দুক নিয়ে থেকে যাব ওখানে। সব রহস্য ফরসা হয়ে যাবে।

পরদিন দাসাইন ওরাওঁ ওদের নিয়ে গেল চিপা ফরেস্টে। সেখানে এখন গাছ কাটা চলছে। দাসাইন খুব আত্মসম্মানী ভারভারিক্কি লোক। গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট পরে ও, হাতে রাখে ছড়ি। দাসাইন বলল, তোরা যাস না ঝারোয়া।

কেন? সেখানে কি আছে?

বোস্, বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই, চায় লা।

ওভারসিয়ারের তাঁবুর কাছে একটা লোক কেটলিতে চা বানাচ্ছে, বিড়ি বেচছে।

কাটা গাছের উপর বসল ওরা। দাসাইন বলল, বাবু অনেকদূর বুঝে। সবটা বুঝে না।

দাসাইনের গল্পটা জঙ্গলে বসে মনে হয়েছিল গল্প, আর শহরে বসে মইনু, তাতা ও সোনামের আজ মনে হয় সত্যি। কেন এমন হয়?

গল্পটা এই রকম—

আদি অন্ত কাল আগে যখন পৃথিবী তৈরি হচ্ছিল, তখন বড় দেবতার সঙ্গে অসুরদের বউরা যুদ্ধ করতে যায়। বড় দেবতা শূন্য থেকে বউগুলোকে নিচে ফেলে দেন। তারাই হয়ে গেল পাহাড়। পাহাড়ের কোল দিয়ে ক্রমে বনও গজাল। আর একথাও সত্যি যে নানারকম মানুষ এসে সব জঙ্গল, সব মাটির দখল নিয়েছে।

তবু বনের কোনো কোনো জায়গা থাকে সংরক্ষিত। মানুষ সব দখল করছে বলে পাহাড় জঙ্গলের আত্মারা মানুষের উপর ক্ষেপেই থাকে। কেননা তাদের বসত ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। তখন তারা কোনো কোনো জায়গায় এসে ডেরা বাঁধে।

ঝারোয়ার জঙ্গল তেমনি এক জায়গা। এ কথা বাবু মানে না, বুঝে না। এ কথা কখনো বাবু ভেবে দেখল না যে ধীলন যেখানে ঘর করল, সেখানে গাছে পাখি বসে না; কোনো জানোয়ার ঢোকে না বাড়ির ভিতর? আর ধীলনও ভেবে দেখল না, জঙ্গলের মধ্যে একটা মেয়ে কোথা থেকে এল, বিয়ে করে বসল। অবশ্য ধীলন কিছু করতে পারতও না। যখনি ওখানে বাড়ি করেছে, তখনি ও মরেছে। যখনি মেয়েটিকে দেখেছে, তখন তো ওর উপর শাপ লেগে গেছে।

ও তো মেয়ে নয়। মানুষের উপর প্রতিহিংসা নেবার জন্যে কখন মেয়ে সেজে, কখন হরিণ বা ময়ূর সেজে মানুষকে ভুলায়। তারপর মানুষের রক্ত চুষে শেষ করে ফেলে রেখে চলে যায়।

কেন? — সোনাম বলল।

কেন শোধ নেবে না। মানুষ গাছ কেটে, পাহাড়ের পাথর চালান দিয়ে জঙ্গলের রক্ত চুষে নিচ্ছে না?

তোমাদের কিছু হয়নি তো?

দাসাইন শান্ত সুন্দর হাসল। বলল, আমরা তো জঙ্গলকে মারছি না বাবু, পাহাড় জঙ্গল শেষ করে টাকা জমাচ্ছি না। আমাদের মারবে কেন? আমরা জঙ্গলের সন্তান। জঙ্গলের দেওদেওতার নিয়ম মেনে চলি। ওদের রাগ বাইরের মানুষের উপর। আমরা যাচ্ছি জঙ্গল দিয়ে। ধর্ কেন, জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ পথের উপর একটা ডাল ভেঙে পড়ল। বা' নেই, বাতাস নেই, ডাল পড়ল কেন? তখনি জানলাম আর যাওয়া নিষেধ। আর যাব না, ফিরে আসব।

তাতা বলল, বাড়ি পরিষ্কার রাখছে কে?

যে ধীলনকে খেয়েছে, সে।

কেন?

কেন?

আরো খেতে চায় আরো মানুষ চায়।

পুলিসকে কিছু করেনি কেন?

কে জানে?

পুলিসকে যে কিছু করেনি, তাতেই মইনুরা নিঃসংশয় হয় যে এ কোনো মানুষের কারসাজি। তখনি বাদল ঠিক করে যে ওই বাড়িতে গিয়ে ওরা থাকবে।

কাকা বারণ করলেন।

পুলিস অফিসার বারণ করলেন।

বারণ না করে, "যাও" বললে ওদের উৎসাহ ফুরাত। বারণ করার ফলে যা ছিল উৎসাহ, তা হয়ে গেল জেদ। চার চারটে জোয়ান ছেলে। সাঁতার কাটতে, স্কুটার চালাতে, পাহাড়ে উঠতে সবাই পটু। রাইফেল ক্লাবে চারজনই একসঙ্গে ঢুকেছিল। অল্পবিস্তর বন্দুক চালাতে সবাই জানে। বাদলের তো লাইসেনস্‌ও আছে। জঙ্গলের কাজে আসার আগেই সে লাইসেনস্‌ নিয়েছে। মইনু কারাটে, তাতা আর সোনাম জুডোও শিখেছে।

পুলিস অফিসার সুজা সিং বললেন, ঠিক আছে। পাহাড়ের এপারে সুমাতে আমি রইলাম আজ। অনেক দিন বাদে জমিয়ে তাস খেলা যাবে।

কাকার বাংলোয় রয়ে গেলেন সুজা সিং। আর ওরা যখন গেল বিকেলে, তখন বার বার বলে দিলেন, পাহাড়ে নির্জনে শব্দ বহুদূর যায়। এই হুইস্‌ল্‌টা রাখুন। কিছু বিপদ বুঝলেই বাজাবেন। আমরা চলে যাব।

দাসাইন ওদের কিছুদূর এগিয়ে দিল আর মাথা নাড়তে নাড়তে, বক বক করতে করতে ফিরে গেল।

সুমা থেকে ঝাব্রোয়া, মাঝে একটি পাহাড়। পাহাড়টা খুবই নিচু। যাবার পথ পাহাড়ের গা ঘেঁষে পাহাড় ঘিরে। ধীলনের বাংলোটিতে ওরা যখন পৌঁছয় তখন বিকেল। কাঁধের ব্যাগ নামিয়ে ওরা আশপাশটা দেখতে বেরোল। বাদল বলল, যত সব গাঁজাখুরি কথা। ওই তো হরিণ দৌড়ে গেল, কাঠবিড়ালি ছুটছে। ভূতুড়ে জঙ্গল না হাতি!

মইনু, সোনাম আর তাতা অবশ্য কোনো হরিণ বা কাঠবিড়ালি দেখেনি। কিন্তু বাদল তো দেখেছে?

সন্ধে ঘনাতে ওরা ফিরে এল। বাদল বলল, এত বড় বড় শাল গাছ, ওঃ। কত দাম বলতো?

লাখ লাখ টাকা।

তা হলে?

তুই লক্ষপতি হচ্ছিস।

নাঃ, বেজায় বড়লোক হওয়াটা আর ঠেকানো গেল না দেখছি। কি আর করি বল্।

আমাদের মাঝে মধ্যে দিয়ে দিস।

বাংলোতে আলো জ্বলছে। তাই দেখেই ওরা অবাক হয় একটু। বারান্দায় পেট্রোম্যাক্স, ঘরে পেট্রোম্যাক্স, কে জ্বালল? আরেকটু এগিয়ে আসতে জবাব মিলল। বারান্দায় বসে আছে একটি মেয়ে। তার কোলে একটি বাচ্চা।

ওদের দেখে মেয়েটি উঠে দাঁড়াল বাচ্চাটিকে শুইয়ে রেখে। তারপর হাত জোড় করে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

ছেলেরা যত না অবাক, তত বিব্রত, আবার আশ্বস্তও। মইনু বলল, থামুন, থামুন। কাঁদবেন না। আপনি, আপনি ধীলনের বউ?

হ্যাঁ বাবুজী। এ তো আমারই বাংলো।

কোথায় ছিলেন?

কোথায় থাকব? জঙ্গল দিয়ে আমাদের গাঁয়ে পালিয়ে ছিলাম। পুলিস যে বড্ড ঝামেলা করে। কি বলে কিছু বুঝি না। আমি কি জানি যে স্বামী মরে যাবেন? উনি পরব পূজা পছন্দ করেন না। ঝগড়া করে আমি বাচ্চাকে নিয়ে চলে যাই। তারপর যা যা হল...গাঁয়ে আমায় থাকতে দেয় না। বলে, বাবুকে বিয়ে করছিলি। সেখানে যা। এখানে এলে পুলিস তাড়া করে।

আপনিই ঘরদোর সাফ করেন?

হ্যাঁ বাবুজী। কে করবে?

ঘর খোলেন কি করে?

এই যে, মাসটার চাবি দিয়ে? এ চাবিগুলো দিয়ে সব তালা খোলা যায়। বাচ্চাটার বড় অসুখ। কেবল শুকিয়ে যাচ্ছে, কিছু খেতে চায় না। তাই এসে বসে আছি। ভেবেছি সকাল হলে নিজে যাব পুলিস সাহেবের কাছে। বলব, আমাকে যা বলো তাই করব, বাচ্চাটাকে হাসপাতালে দিয়ে দাও। জংলী মানুষ আমি, কিছু বুঝি না। স্বামী সব বুঝতেন, সব দেখে শুনে রাখতেন। বাবুজী! রাতটুকু থাকব?

ছি ছি, সে কি কথা! আপনি বাচ্চাকে নিয়ে ঘরে থাকুন। আমরা ওই ঘরে থাকব। সকালে আমরাই আপনাকে নিয়ে যাব।

মেয়েটি বাচ্চাকে শুইয়ে এল। সেই ওদের খাবার সাজিয়ে দিল প্লেটে। কাকা খাবার সঙ্গে দিয়েছিলেন। অনেক পীড়াপীড়িতেও নিজে কিছু খেল না। কথা বলল অনেক। ধীলনের ভাগ্নে ভীর্মাকে কে মেরেছিল তা ও জানে না। ও তো ভয়ের চোটে আসতই না। গ্রামের লোকরা থাকতে দিল না বলে যাওয়া আসা করছে।

বসার ঘরে ওরা শুয়ে পড়ে। ঘুম কি আসতে চায়? এখন তো ঝারোয়ার বাংলোর রহস্যের সব সমাধানই মিলেছে। মেয়েটির গল্পের মধ্যে যে সব ফাঁকফোকর আছে তা ওদের এখন কিছু কানে বাজছে না। মেয়েটির চাউনি এত কাতর, গলায় স্বর এমন কান্নায় ভরা!

হঠাৎ মেয়েটি কেঁদে উঠেছিল। ছুটে এসেছিল। বাবুজী, বাবুজী! মেয়ে আমার নেতিয়ে পড়ছে কেন? একটু দেখ না গো? এমন রাতে আমি কি করি, কোথায় যাই?

ধড়ফড় করে ওরা উঠে যায়, ছুটে যায়। সত্যিই, বাচ্চাটা, তিন-চার মাসের বাচ্চাটা, যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছে। বাদল সামনে ছিল, পাগলিনীর মতো বাচ্চার মা বাদলের হাত ধরে টানতে থাকে।

এসো বাবুজী গায়ে হাত দিয়ে দেখ, বলো আমার মেয়ে বেঁচে আছে।

হতভম্ব বাদল এগিয়ে যায় কাছে। আর যে বাচ্চাটা মরার মত পড়েছিল এতক্ষণ, সে হঠাৎ খলখল করে হেসে বিছানা ছেড়ে যেন ভেসে উঠে আসে, বাদলের গলায় মুখ লাগায়, চুষতে থাকে কি যেন। বাদলের গলার স্বর আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে যায়। চোখ হয় বিস্ফারিত। মইনুরা এক পা নড়তে পারে না এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে। মেয়েটি বাদলকে ধরে থাকে আর একেবারে মমতাময় মানুষী মায়ের গলায় বলতে থাকে, খেয়ে নে সোনা, খেয়ে নে মণি, খেয়ে নে...

সোনাম এই ভয়ঙ্করতার অভিশাপ কাটিয়ে বাদলের রাইফেলটা এনে পরপর গুলি করেছিল মেয়েটির উপর। মেয়েটি একটুকু নড়েনি। বাচ্চাটাকে ও একসময়ে কোলে নিয়ে নেয়, বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। বাদল পড়ে যায়।

রাইফেলের শব্দে সুজা-সিং ও কাকা এসে পড়েন। তারপর সব অস্পষ্ট। ধোঁয়াটে, গোলমেলে। ওদের চারজনকেই হাসপাতালে নিতে হয়। বাদল অবশ্য জীবিত ছিল না।

তারপর ওরা একদিন ফিরে আসে।

ঝারোয়ার জঙ্গলের নাম ওরা কখনো করে না। কিন্তু খুব ছোট শিশু দেখলে ওরা ভীষণ ভয় পায় আজও। জীবনেও এ আতঙ্ক ওদের কাটবে না।

ঝারোয়ার জঙ্গলে এরপর আর কেউ ঢোকেনি।

কোথাও

দীপুকে দেখলে তোমরা বুঝতেই পারবে না ও কি রকম একটা কাজ করে ফেলেছে এ বছর পুজোর ছুটিতে। আমাদের দীপু দেখতে খুব সাধারণ। পড়াশোনাতে খুব ভালো কিছু একটা নয়। খেলাধুলোতেও তেমন কোনো কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি।

বাবা বলেন, ওর কোনো উচ্চাশাই নেই।

মাসিরা বলে, কে বলবে ও সমুদ্রর ভাই।

মা বলেন, লোকের কথা শুনতে তোর এত ভালো লাগে কেন? চেষ্টা কর্, চেষ্টা কর্।

সমুদ্র একটু হেসে বলে, চেষ্টা করলেই যদি সব হতো, তাহলে তো...

সমুদ্র তেমন কথা বলতেই পারে। সমুদ্র ক্লাসে প্রথম হয়, স্কুল ফুটবল টীমেও সেন্টার ফরোয়ার্ড। ছোটবেলা থেকে "বসে আঁকো" প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে। আর এখন তো অঙ্কের কুইজে ওর দারুণ নাম। সবাই জানে সমুদ্র একটা ছেলের মতো ছেলে।

চেহারাটাও ওর বড্ড বেশি ভালো। এত ভালো যে ছোটমাসি সবসময়ে বলে, টি ভি.-র বিজ্ঞাপনে ওকে নামতে দাও দিদি!

ছোটমাসি ওইসব বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন প্রোডিউস না কি যেন করে।

আর দীপু? সে সমুদ্রর ভাই সে কথা কে বলবে, ছোটবেলা থেকে ও এতবার শুনেছে," কে বলবে ওই দাদার এই ভাই?" যে ওর নিজেরই মনে হয় ও এ বাড়ির ছেলে হয়ত নয়।

সমুদ্রর জন্যে ভালো ভালো পোশাক, জুতো সবসময়ে আসে।

দীপুর জন্যে তেমন নয়।

মা বলেন, সমুর জিনিস তো দীপুই পরবে। বড়দের জিনিস ছোটরা তো পরেই।

সমু আর দীপুর স্কুলও এক নয়।

দুজনকেই ওই ভীষণ কায়দার ইংরিজি স্কুলে পড়াবার ইচ্ছে ছিল মার।

সমুদ্র খুব সহজে ভর্তি হয়েছিল।

দীপু তো পরীক্ষায় পারলই না।

বাবা-মা কম দৌড়াদৌড়ি করেননি। তাঁরা দুজনেই ব্যাঙ্কে কাজ করেন। ইংরিজি স্কুলে না পড়লে ছেলেদের কিছু হবে না এ কথা ভালোই বোঝেন।

কিন্তু পাঁচটা স্কুলে ভর্তির পরীক্ষায় যে ছেলে ফেল হয়ে যায়, তাকে কেমন করে ভর্তি করবেন? অবশেষে বাবার ছোটকা এসে হাজির হলেন।

বাবার ছোটকা, সমু দীপুরও ছোটকা। দীপু শুনছে ওঁকে রানীবাগেও সবাই "ছোটকা" বলে। রানীবাগে উনি একজন নামকরা হোমিওপ্যাথ। মা বলেন, ছোটকা যদি পয়সা চাইতেন তাহলে নাকি অনেক পয়সা করতে পারতেন।

বাবা বলেন, ছোটকা একেবারে সেকেলে। কাকিমা মরে গেছে, ছেলে অত বড় বাড়ি করেছে দিল্লীতে, কিছুতে যাবে না। রানীবাগে বসে বাগান করবে আর হোমিওপ্যাথি করবে।

সমু বলে, একেবারে সেকেলে, তাই না বাবা?

তা সেই ছোটকাই এসে পড়লে সেই সময়ে, যখন দীপু ওর বাবা-মার কাছে একটা সমস্যা হয়ে উঠেছে।

ছোটকা সব শুনে বললেন, অলক মেমোরিয়ালে ভর্তি করে দাও।

—বাংলা ইস্কুলে?

—তুমি কোথায় পড়েছিলে? দাদা মারা গেলেন, তোমাদের তো আমি কে এন স্কুলেই পড়িয়েছিলাম। বউমাও বেলতলায় পড়তেন। বাংলা স্কুলে পড়া যদি অতই মন্দ হয়, তোমরা দুজনই অফিসার হয়ে ব্যাঙ্কে ঢুকলে কেমন করে? অলক মেমোরিয়াল নামকরা স্কুল।

—তখনকার কথা আলাদা। আজকাল বাংলা স্কুলে...কেরানী ছাড়া কি হবে বল?

—না হয় তাই হলো।

—তিন তিনটে টিচার ফেল মেরে গেল। অথচ সমুকে নিয়ে কিছুই ভাবতেই হয়নি।

—যে ভালো তাকে অমন চেঁচিয়ে "ভালো" বলাটা ঠিক নয়। সমু অসাধারণ। কিন্তু সবাই তো তা হয় না। যে অত ভালো নয়, তাকে সর্বদা "তুই একটা যাচ্ছেতাই" বলাটাও ঠিক নয়।

—ইংরিজিতে না পড়লে উচ্চশিক্ষা, বিদেশ যাওয়া সব পথ বন্ধ হয়ে আসে।

—না সোমনাথ, দেশের অধিকাংশ ছেলেমেয়ে বাংলা স্কুলেই পড়ে। আরে! আমার তো কোনো ডিগ্রীই নেই। তবু তো তোমাদের মানুষ করেছি, তোমার বোনকে বিয়ে দিয়েছি। আজকাল অসাধারণদের দেখা যায়, মানুষের মতো মানুষ হতে দেখা যায় না। দীপু হয়তো মানুষ হবে।

তা, অলক মেমোরিয়ালেই ভর্তি হলো দীপু। না, প্রথম পুরস্কার ও আনতে পারেনি। তবে আবৃত্তিতে পাড়ায় অনেক পুরস্কার পেয়েছে আর সাঁতারটা খুব শিখেছে। স্কুলের কাছেই লেক।

পুজো বা গরমের ছুটিতে দীপুর বাবা-মা বেরোতে পারেন না। তাই দীপু কত জায়গা দেখেনি। এত জায়গা দেখেনি যে সেও এক অবাক কাণ্ড।

আজকের দিনে তুমি এমন একটা ছেলে কোথায় পাবে যে ক্লাস এইটে উঠেছে, সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের উপর যাদের বাড়ি, আর যাদের বাড়ির, নিচেই একটি চমৎকার ট্রাভেল এজেন্সির শাখা অফিস আছে, অথচ ছেলেটা দীঘা আর রাঁচি ছাড়া কোথাও যায়নি?

ছেলেটার দাদা সমু কিন্তু "কুইজ কিড" হিসেবে বম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, বাঙ্গালোর গিয়েছে। এবার গরমের ছুটিতে স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে কুলু-মানালি-রোটাং পাস ঘুরে এসেছে। সমু মাধ্যমিক পরীক্ষার পর যে বন্ধুদের সঙ্গে দক্ষিণ ভারত যাবেই যাবে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

এখন ও ভি ডি ও গেম নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত।

দীপু দাদার ভক্ত মানুষ।

—দাদা, তুই কি করে পারিস রে?

—পারতেই হবে।

—কেন?

—কম্পিটিশানে প্রথম হলে ওরা আমাকে জাপান ঘোরাবে। ভাবতে পারিস?

—এরোপ্লেনে!

—নিশ্চয়।

—তুই পারবি।

—তুই তো চেষ্টাই করিস না।

—পারবই না।

তাছাড়া অলক মেমোরিয়াল স্কুল তো এমন নয় যে ছেলেদের একশো রকম সুযোগসুবিধে দেবে। দীপুর স্কুলে এখনো ছেলেরা দেয়াল পত্রিকা বের করে, স্বাধীনতা দিবসে হাসপাতালে রোগীদের ফল দিতে যায়। ইস্কুলের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার হলো অলক স্মৃতি স্বর্ণপদক। সে পদক পেতে হলে খুব বড় কোনো কাজ করতে হয়। অলক রায়চৌধুরী তো লেকের জলে ডুবন্ত দুটি ছেলেকে বাঁচিয়েছিল আর নিজে দম হারিয়ে তলিয়ে গিয়েছিল। চৌদ্দ বছরের অলকের জীবনীটা লাইব্রেরি ঘরের দেয়ালে লেখা আছে।

না, অমন কোনো কাজ দীপু পারবেই না।

—পুজোতে তোরা অজন্তা-ইলোরা যাবি?

—নিশ্চয়।

দীপু মনে মনে নিঃশ্বাস ফেলল। ওদের রান্না মাসি নীরদাও কত জায়গা গেছে। মাকালপুরের মনসা মেলায়, যেখানে সাপুড়েরা সাপ নিয়ে আসে। তালতাচকের চড়ক দেখেছে যেখানে প্রতি বছর একটা গাছে অমন অসময়েই আম পেকে যায়। নীরদার নিজের বাড়ি ঠাকুরনগরে। সেখানে গাছে চড়া যায়, পুকুরে সাঁতার কাটা যায়, আর আখের গুড় দিয়ে গরম গরম রুটি খাওয়া যায়।

কিছুই দেখেনি দীপু।

রাতে খেতে বসে দীপু বলল, মা!

—কিরে!

—পুজোতে কোথাও যাবে?

দীপুর মা সব বুঝিয়ে বলতে ভালোবাসেন।

তিনি বললেন, না দীপু! এই ওপরতলাটা আমরা কিনে নিচ্ছি, সেজন্যে টাকা জমাতে হচ্ছে।

—ছোট্ট একটা কোথাও যাওয়া যায় না?

বাবা হাসলেন।

—"কোথাও" কিরে?

—যে কোনো জায়গায়? দাদা তো যাচ্ছে।

বাবা হলেন সত্যি কথায় বিশ্বাসী।

—সমু ইংরিজি স্কুলে এসে কম্পিটিশানে প্রথম হয়েছে, পাঁচশো টাকা পেয়েছে। ও তো যেতেই পারে। ভালো করে মাংসটা খাও দীপু।

—রান্না মাসির বাড়ি যাব?

মা চমকে উঠলেন।

নীরদার বাড়ি? সেখানে কি আছে?

বাবা বললেন, দীপু! ব্যাপারটা বোঝো। আজ অবধি তোমার মধ্যে, যাকে বলে এমন কিছু দেখিনি যাতে করে তোমাকে বিশ্বাস করে একলা ছেড়ে দিতে পারি।

মা বললেন, পুকুর! জল! ভয়ের কথা।

—আমি সাঁতার জানি।

সমু ইংরিজিতে বলল, গ্রামের পরিবেশ খুব দূষিত। সেখানে জল বলো, খাবার বলো, বাতাস বলো...

দীপু অবাধ্য জেদে বলল, ঠাকুরনগর কিছু গ্রাম নয়। আর পরিবেশদূষণ ওখানে অনেক কম। কলকারখানা তো নেই।

মা তাড়াতাড়ি বললেন, এসব কথা থাক। তুমি ছোট, আমি ভরসা পাই না।

দীপু বুঝল, মা মোটেও চান না যে রান্না মাসির কানে একটা কথাও যায়। রান্না মাসি রাগ করে চলে গেলে এ বাড়ি অচল। রান্না মাসির ছেলেকে ছোটকা স্যালো পাম্প চালাবার চাকরি করে দিয়েছেন, বাবা-মা রান্না মাসির মেয়ের বিয়েতে হাজার টাকা দিয়েছে, রান্না মাসি সেজন্যে খুব অনুগত। তবে রান্না মাসি খুব অভিমানী। ও দেশ থেকে মোয়া এনেছিল। মা বলেছিলেন, ওগুলো বিচ্ছিরি জিনিস। সে কথা শুনেই রান্না মাসি রেগে গিয়েছিল। দীপুরই মজা। মোয়াগুলো ওই খেল।

বাবা বললেন, বাড়ি কেনা হয়ে যাক। আমরাই তোমাকে নিয়ে বেরোব।

রান্না মাসি পরে বলল, আর বারাইছে! এহনো অগো টাকার নিশায় ধরেছে। এই নিশা বরো মন্দ। বারি হইলে গারি চাই, গারি হইলে হয়তো একখান এরেপেলেন চাইব!

অতএব দীপু বুঝল, এ বছরও ও পাড়ার পুজোয় স্বেচ্ছাসেবক হবে, প্যান্ডেলে ফাংশান দেখবে আর একদিন ছোটমেসোর মারুতি ভ্যানে চেপে ওরা কলকাতার ঠাকুর দেখবে।

এ সবই খুবই ভালো। কিন্তু কোথাও গেলে...

রান্না মাসি বলল, মনে মনে ঠাকুররে ডাক্ দীপু। ঠাকুর তরে কোথাও পাঠাইব নিশ্চয়ই।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর?

—দূর বোকা! ভগবান! ভগবানরে ডাক্।

দীপু আবার চুপ করে গেল। বাবা-মা যে বলেন "ভগবান নেই"। কাকে ডাকবে ও?

কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার দেখ। পুজোর আগেই ছোটকা চলে এলেন হোমিওপ্যাথি ওষুধ কিনতে। আর এসেই বললেন বিরাট যাত্রা উৎসব এবার। সমুর তো লম্বা প্রোগ্রাম। তোমরা কলকাতা ছেড়ে নড়বে না। আমি দীপুকে নিয়ে চললাম।

—কিন্তু... কিন্তু...

— কোনো "কিন্তু" নেই। জামাকাপড় গোছা দীপু। ব্যাগ নিজে টানবি। আমরা কাল ভোরে প্রথম বাসটা ধরব, কেষ্টনগরে যা সরভাজা খাওয়াব, অবাক্ হয়ে যাবি। অমন জিনিস খাসনি।

মা বললেন, সরভাজা কি তেমন হয়?

ছোটকা হাসলেন।

—আমার রোগী মদন। তার আলসার সারিয়েছিলাম। তার মস্ত দোকান। সে আসল সরভাজা নিয়ে অপেক্ষা করবে।

বাবার চোখটা চকচক করে উঠল।

—গোপাল মামার ছেলে? ওঃ, গোপাল মামার তৈরি সরভাজা, অপূর্ব!

—খাবি নাকি?

—না না, চিনি তো আমরা...

—যাক গে। তোমাদের ব্যাপার তোমরা বোঝ। সোয়েটার একটা দিও বউমা। ওখানে এখনই সন্ধ্যার পর বেশ হিম পড়ে।

—সাবধানে রাখবেন। ও তো তেমন চালাকচতুর নয়, মানে সমুর মতো নয়...

ছোটকা ঝকঝকে নিজের দাঁতে হাসলেন।

—সেজন্যেই দীপু যাচ্ছে, সমু যাচ্ছে না। সাঁতার কাটাব তোকে আমার বন্ধু বাড়িতে। জিয়াগঞ্জে ওদের যা একখানা দীঘি আছে না...

দীপু আনন্দে নেচে উঠল। সমু বলল, রানীবাগ! কে শুনেছে "রানীবাগ" নামটা? লোকে ফেমাস জায়গায় যায় দীপু, রানীবাগে যায় না।

—আমি যাই।

ব্যস্, পরদিনই ভোরের বাস ধরল ওরা। দীপুকে ভীষণ অবাক করে বাবার মদনদা ওর মাথায় চুমো খেলেন। বললেন সোমনাথের মতো কপাল আর চোখ। তা, ওরা এল না?

— কলকাতায় অনেক কাজ।

—তাই হবে। নিন, ডাব খান।

ডাব খেয়ে মদন কাকা ওদের একটা ভালো দোকানে নিয়ে গেলেন।

দোকানী বলল, ডাক্তারবাবু?

—হ্যাঁ, সঙ্গে নাতি।

গরম গরম কচুরি, বড় বড় রাজভোগ। দীপুর মনে হলো আহা! দাদা যদি খেত!

রানীবাগ ওরা বারোটায় পৌঁছে গেল। রানীবাগ বড় টাউন এখন। কিন্তু ছোটকার বাড়িটা টাউনের মধ্যে হলেও কি সুন্দর! কি সুন্দর! পাঁচিলঘেরা বাড়ি। বাড়ির মধ্যে ফুলের বাগান, তারের চৌকো শক্ত জালে ঢাকা, তাতে স্থলপদ্ম, অতসী, দোপাটি, আরো কত ফুলের গাছ।

—ওই বেগনে ফুলটা বুনো ফুল, জানিস? দেখতে কি সুন্দর, তাই দেখ্!

বাড়িটায় চারটে ঘর, ছাতে একটা ঘর। ছোটকা ডাকলেন, হিমি কোথায়? বুনো কোথায়?

হিমি দীপুর মায়ের বয়সী, বুনো দীপুর বয়সী। ছোটকা বললেন, ছোট নাতি দীপু। হিমি এ বাড়ির ম্যানেজার। আর শ্রীমান বলরাম এখন স্কুলে যাচ্ছেন, তবে ও ভালো ছুতোর হবে। বুনো, তোর যন্ত্রপাতি দেখাস।

বারান্দায় কয়েকটা বেঞ্চি, রোগীরা বসে। বাইরের ঘরে ডাক্তারখানা। ছোটকার ঘরে অনেক ছবি।

—এই দেখ তোমার ঠাকুরদা, ইনি তোমার ঠাকুমা, এই দেখ তোমার বাবাদের আর পিসিদের ছবি। এটা আমার ছেলে, বউ, নাতি।

হিমি বলল, কোন, ঘরে থাকবে?

— পাশের ঘরে। নিজের মতো থাকবে। বুনো তো শোয়, দুজনে বন্ধু হবে।

হিমি বলল, কিছু খাবে না তোমরা?

ছোটকা বললেন, না না। স্নান, খাওয়া, ঘুম। কি রেঁধেছ?

—খাওয়ার সময়ে দেখো।

ছোটকা, বুনো আর দীপু ঝকঝকে বারান্দায় বড় পিঁড়িতে বসলেন। বড় বড় কাঁসার থালায় চুড়ো করা ভাত, মুগের ডাল, বকফুলের বেগুনি, সজনে চচ্চড়ি আর বড় বড় কই মাছের ঝোল। সবশেষে ঘরের পাতা দই আর গুড়।

দীপু বলেছিল, আমি দুপুরে ঘুমোই না। কিন্তু বুনোকে ইংরিজি দেখাতে গিয়েই ও ঘুমিয়ে পড়ল। মস্তবড় সেকেলে পালঙ্ক, পরিষ্কার বিছানা।

বিকেলে দীপু বুনোর সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াল মাঠে। বাড়ি ছেড়ে আধমাইল গেলেই মস্ত মাঠ। ওখানেই যাত্রা হবে। তারপর দিনের পর দিন যে কোথা দিয়ে উড়ে যেতে থাকল! ডাক্তারবাবুর নাতিকে সবাই দেখতে চায়। সোমনাথের ছেলেকে সবাই আদর করে। দীপু ভাবল, বাবা-মা যদি একবারও আসত!

হিমিকে ও হিমি পিসি বলছে। সত্যি পিসিই তো! ছোটকার যেন কিরকম ভাইঝি। খুব দুঃখে ছিল, ছোটকা নিয়ে এসেছেন।

পুজোর প্যান্ডেলে গিয়ে দীপু অবাক হয়ে গেল। বুনোদের সঙ্গে মিশে ও তো চমৎকার কাজ করতে পারছে।

ছোটকা হিমিকে বললেন, পারবে না কেন? চিরকাল শুনেছে "তুমি কিছু পার না", আর ওর ভেতর থেকে ইচ্ছেটাই চলে গেছে।

হিমি বলল, এখানে রেখে দাও না।

—ওর বাবা-মা কি ছাড়বে?

—বুনো দেখাদেখি নিজের জামা কাচছে, বিছানা পেতে নিচ্ছে।

—খুব ভালো। খুব ভালো।

এর মধ্যেই লেগে গেল যাত্রা উৎসব। সে যে কত রকম পালা!

সামাজিক পালা, পৌরাণিক পালা, ঐতিহাসিক পালা!

দীপুর দুশো মজা। রাত জেগে পালা দেখ, মাঠে গিয়ে বল খেল, নৌকো চেপে ঘোর; "না" বলেন না ছোটকা। তবে নৌকোয় বেড়াতে নিয়ে যান নিজে।

দীপু বুনোকে বলল, তোর কি মজা! ইচ্ছে করলে তো ছোটকার মতো ডাক্তারই হতে পারিস।

বুনো বলল, ক্লাস এইট পাশ করলেই যাব কাঠের কাজ শিখতে।

—কেন?

—হাতের কাজ শিখলে পয়সা আছে। ছোটকা আমাকে পালদের দোকানে কাজ করে দেবে।

—দোকানের কাজ!

—হ্যাঁ...কাজ না করলে...

বুনো কালো মুখে সুন্দর সাদা হাসি হাসল।

—আমরা তো গরিব। আমি কাজ না করলে মা খুব কষ্ট পাবে।

—তুই পড়বি না?

বুনো বলল, আমরা কি তোদের মতো বড়লোক যে যতদিন ইচ্ছে পড়ব? আর, এইটের পর ভর্তি না হলে বয়সও পেরিয়ে যাবে।

দীপু চুপ করে গেল।

বুনো বলল, আসল মজাটা এখনো বাকি আছে।

—সেটা কি?

—হাজি সায়েবের বাড়ি যাব আমরা পায়রাতলায়। ওর মস্ত আমবাগান আছে, আর বাড়ির কাছেই চণ্ডী নদী। বড় নদী তো নয়, নৌকোয় খুব বেড়াব। মাছ ধরব আমরা, আর সাঁতার কাটব।

কি সুখ, কত রকম সুখ এখানে। কলকাতার চেয়ে কত ভালো। দীপুকে যদি ফিরে যেতে না হতো!

—জানিস বুনো, মা-বাবাকে খুব বলব এবার। আমাকে যদি এখানে পড়তে দেয়...

—তাহলে খুব ভালো হয়। আরেকটা কথা, হাজি সায়েবের ওখানে গেলেই ঝুড়ি বোঝাই বাজি দেবে পোড়াতে। ওঁর ছেলের বাজির কারখানা আছে তো।

—বাজি পোড়াতে আমি কি ভালোবাসি। মা-বাবা কিছুতেই দেয় না বাজি ধরতে...

—কেন?

দীপু আস্তে আস্তে বলল, আমি যে কিছু পারি না, কোনো বিষয়ে আমার মন নেই...আমার দাদা না! স-ব পারে, স-ব!

একটু হেসে দীপু বলল, বাবা বলে, আমি বড় হলে ঠিক একটা কেরানী হব।

বুনোর মনে হয় দীপুর মনে বোধহয় দুঃখ আছে কোথাও। তাই বলে, ঘুড়ি নিয়ে যেতে হবে। হাজি সায়েবের ওখানে ঘুড়ি ওড়াবার সুখ।

আর কি আশ্চর্য! হাজি সায়েব পরদিনই চলে আসেন। ইয়া দাড়ি, ইয়া গোঁফ, সব সাদা, কিন্তু কি বলশালী চেহারা! এলেন থলিবোঝাই মেওয়া, কিশমিশ, বাদাম নিয়ে। অমন বিশাল চেহারা আর তেমনি দরাজ গলা।

—কি ছোটকা! পায়রাতলা চলেন কেন? লাতি লাও চড়বে, বাজি ফোটাবে, আর আপনি আরামসে বসে রোগী দেখবেন। আপনার বিটি কানছে কত? অ লাতি! আমার বুড়ী মাকে উনি পেটের ব্যামো সারাল, সে হতে উনি বাপ, তিনি বেটি। বাপ বেটির সম্পর্ক, বুঝলে কিছু?

এসব কথাবার্তার পরই ওরা পায়রাতলা চলে যায়। গ্রামের বনেদী মুসলিম গেরস্ত বাড়ি, রীতিমতো অবস্থাপন্ন। হাজি সায়েব বললেন, গাছে ওঠো, পেয়ারা খাও, নদীতে সাঁতার কাট। চণ্ডী বড় শান্ত নদী গো, কেউ ডোবে না। আর শোন আম্মা! খাওয়াও, খুব খাওয়াও ওদের। ছোটকা পিঁয়াজ রসুন খায় না। মাছ দিবে, দই দিবে...

ছোটকা বললেন, যা! মাঠে দৌড়ো, ঘুড়ি ওড়া, টেনে টেনে নিশ্বাস নিবি। এমন দেশ কি আছে?

হাজি সায়েবের নাতির ছেলেরা রাজা, রাণা আর সিরাজও জুটে গেল। হাজি সায়েব শুধু বললেন, বাজি ফুটাবি হোই দূরে যেয়ে। মা আমার বুড়ো হয়েছে, বাজির শব্দে তার বুক ধরফড় করে।

বাড়ির সামনে মাঠ। তারপর হাইওয়ে। হাজি সায়েব বললেন, ওদিকে যাস না কেউ। মানুষমারা কল করে রেখে গেছে ঠিকাদার।

ছোটকা বললেন, কি করল?

—বিদ্যুৎ তো পাই না। বিদ্যুৎকর্মীরা ধর্মঘট করল। ঠিকাদার লেগে গেল ধর্মঘটকালে কাজ চালাবে। ওই দেখেন! সতেরো মেগাওয়াটের তার টানল, পোল বসাল, তারে স্যাগ দিল না। এগারো হাজার ভোলটের তার ঝুলছে। কবে কি হয়ে যায়।

দীপু বলল, ট্রাক এলে তো বিপদ!

—গ্রামের লোকেরা নজর রাখছে। এ তার যে কবে স্যাগ লাগিয়ে টেনে দিবে!

তা ওদিকপানে নজর রেখেই মাঠে মহানন্দে বাজি ফাটাচ্ছিল দীপুরা। আর সে সময়েই বড় বড় লোহার শিক নিয়ে একটা ট্রাক আসছিল। শিকের ওপর অন্তত চারটে লোক বসে।

দীপুরা চেঁচিয়েছিল। বলেছিল আর এগিও না, কিন্তু ড্রাইভার কি তা শোনে?

তখন দীপুর সাহস কোথা থেকে এসেছিল কে জানে। বাজির ছালাটা রাস্তার ওপর টেনে এনেছিল, চেঁচিয়ে বলেছিল, জ্বালিয়ে দে সিরাজ! আর সিরাজ পরপর উড়ন তুবড়ি ছুঁড়েছিল বাজির গাদায়। দিয়েই ওরা পথের ঢাল ধরে মাঠে নেমে যায়।

সে যে কী ভীষণ শব্দ, আর আগুনের ছোটাছুটি তা বলে বোঝানোই মুশকিল।

লরি থামিয়ে ড্রাইভার ওদেরকে স্প্যানার নিয়ে তাড়া করে আসে।

ততক্ষণে পায়রাতলার সব লোকজন ছুটে এসেছে। লোকদের হাতে বেদম পেটন খেয়ে তবে ড্রাইভারের চৈতন্য হয়েছিল।

হাজি সায়েব বলেছিলেন, ওই ঝুলন্ত তারে যদি লরি ঠেকত, কি হতো জানো?

ড্রাইভার মুখের কপালের রক্ত মুছে বলল, মরে যেতাম সবাই।

তারপরই দীপুকে দেখে ও চেঁচিয়েছিল, এই বিচ্ছুটা আমাদের জান বাঁচাল, এই বিচ্ছুটা।

তারপর দীপুকে কাঁধে তুলে তার সে কি নাচ! বহোৎ কামদারী লেড়কা! ওকে ড্রাইভার এক লরি লাড্ডু খাওয়াবে, একশোটা সিনেমা দেখাবে...

দীপু কোনোমতে নামতে পারলে বাঁচে।

হাজি সায়েব বললেন, দু'দিকে রোড ব্লক করে দাও। কালই চলো টাউনে বিদ্যুৎ আপিসে।

কি নাম রটে গেল দীপু, সিরাজ, বুনো, রাজা আর রাণার, তা ভাবতে পারছ।

পাঁচটি বীর বালকের ছবি কাগজে কাগজে তোমরা সবাই দেখেছ। সবচেয়ে নাম হলো দীপু আর সিরাজের। ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, তিনি নিজেই ওদের মেডেল দেবেন, আর সাহসিকতার জন্যে ভারত সরকারের পুরস্কার যাতে ওরা পায়, সেজন্যে নাম পাঠাবেন দিল্লীতে।

সবচেয়ে বড় বাংলা কাগজে দীপুদের জয়জয়কার। কলকাতাতেও দীপুকে সংবর্ধনা দেবার জন্যে পাড়ার ক্লাব ক্ষেপে গেল।

সবচেয়ে কাজের কাজ হলো,তিন দিনে স্যাগ লাগিয়ে তার টেনে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল।

বাবা-মার টেলিগ্রাম চলে এল।

হাজি সায়েব বললেন, পায়রাতলার সংবর্ধনাটা না দিয়ে তো ওকেছাড়া যাবে না।

হাজি সায়েবের বাবার নামে হাজি দানেশমন্দ্ হাইস্কুলের হলে সে মস্ত সভাই হয়েছিল। দীপুর বাবা-মা ততদিনে পায়রাতলা চলে এসেছেন বলে তাঁরাও সে সভায় ছিলেন বই কি।

হাজি সায়েব, ব্লক অফিসার, স্কুলের হেডমাস্টার, সকলের মুখে দীপুর কৃতিত্বের কথা শুনে দীপুর বাবা-মার চোখ গোল গোল হয়ে গেল।

আর ছোটকা যখন দীপুকে ছুঁয়ে বললেন, এ ছেলের কৃতিত্বটা সবচেয়ে বেশি! কেননা সারাজীবন ও শুনেছে, ও কিছু পারে না। অথচ ও দেখিয়ে দিল, ভালোবাসা আর বিশ্বাস পেলে ও মস্ত কাজও করতে পারে। আমি তো মনে করি যে দীপুর মতো ছেলেদেরই চাই আমরা। দেশে থেকে বিদেশী হয়ে যায় যারা, তারা বিদেশে যাক। তারা ভালো রেজাল্ট দেখাতে পারে। কিন্তু এমন সাহসের কাজ দেখাবে তারা? কখনোই না। তারা দেশের মাটিতে আসবেই না কখনো।

বাবা আর মা অবাক, অবাক!

দীপু সত্যি কোথাও একটা পৌঁছে গেছে। কত সহজে ও বলল, আসছে বছর আমি ছোটকার কাছে থাকব। বাবার স্কুলে পড়ব, এখানে কলেজে পড়ব, তোমরা "না" বলবে না?

—কিন্তু কেন?

—বুনোটা ইংরিজি বোঝে না। ওকে পড়াব, আর ওর সঙ্গে থাকলে আমি অনেক কিছু পারব। আমি তো ছোটকার মতো হতে চাই বাবা!

—বেশ! তাও আমরা মনে রাখলাম।

মা বললেন, তুই যেন বড় হয়ে গেছিস।

দীপু একটু হাসল। কোথাও যেতে চেয়েছিল ও, মা জানে না দীপু সেই 'কোথাওটা' পেয়ে গেছে।

অলক মেমোরিয়াল স্কুল এখন দীপুকে নিয়ে ভীষণ গর্বিত। পাড়াতে দীপু এখন হিরো।

সমুর মহা মুশকিল। পথেঘাটে ওকে শুনতে হয়, দীপুর দাদা যাচ্ছে।

সমু বলল, কি করে কি করলি দীপু।

দীপু বলল, কোথাও গিয়েছিলাম যে?

পড়াশোনাতে খুব মন দিয়েছে দীপু। নিজে খুব ভালো না হলে বুনোকে পড়ানো যায়? তোমরাই বল?

ধাঁধা

তোমরা কি কাগজে খবরটা পড়েছ? ৩৪নং হাইওয়েতে একটি চোদ্দো বছরের ছেলের সাহসের ফলে তিনজন কুখ্যাত ডাকাত ধরা পড়েছে।

মীরবাজারের রতন পালের সাহসের কথা সবাই বলছে। কিন্তু রতনকে যারা জানে, তারা সবাই ধাঁধায় পড়ে গেছে। কেমন করে ওই ছেলে এত বড় সাহসের কাজ করল?

তিনজনই যাকে বলে স্বনামধন্য। সকলেই ওদের ভয় পায়। একে তো ডাকাতি এখন অসম্ভব বেড়ে গেছে। তাতেই মানুষ ভয়ে ভয়ে থাকে। ডাকাতদের ধরতে কে চায় বল? ধরতে পারলে বহু মানুষ মিলে পেটায় যায়।

কিন্তু ধরবে কে? ওরা আজ নদীয়া, কাল মুর্শিদাবাদ, পরশু শিলিগুড়ি চলে যায়। একেক জায়গায় একেকটা নাম ওদের। ডাকাতির কৌশলটাও ভাল। রাতে হাইওয়ে দিয়ে বাস আসছে। হেডলাইটের আলোয় দেখা গেল একটা লোক নিথর পড়ে আছে। দুজন তাকে তোলার চেষ্টা করছে, বুক চাপড়াচ্ছে, বাসকে থামাতে বলছে। বাস কি তখন চলে যেতে পারে?

ব্যস্, বাস যেই থামল, অন্য দুজনের কান্না। দয়া করে অন্তত বহরমপুর কি কেষ্টনগর পৌঁছে দিন। নইলে লোকটা বেঘোরে মারা যাবে। সাপে কেটেছে, বুঝলেন? একটা প্রাণ চলে যাবে। একটু দয়া করবেন না?

বাস থামল। ওরা ধরাধরি করে কাছাকাছি আনল। তারপরেই বাসে লাফিয়ে ওঠে। পিস্তল উঁচিয়ে একজন দাঁড়িয়ে থাকে ড্রাইভারের মাথার ওপর। আর দুজন হুমকি দিয়ে বলে, যার কাছে যা আছে সব আদায় করে নাও।

এরকম হচ্ছে বলেই বাসে শান্ত্রীও থাকে। তবে প্রাইভেট বাসে অত ব্যবস্থা সম্ভব নয়। সরকারি রকেটে তবু সম্ভব। 'জয় মা তারা', 'সন্তোষী মা, 'মাধুরী', 'ড্রীমল্যান্ড' এসব বাসের সিধে কথা। পারতপক্ষে রাতে চালাব না।

আমরা দূরপাল্লার বাস নই। ছোট পাল্লার বাস। আমরা রাতেভিতে চালিয়ে কোন ঝামেলায় পড়তে যাব না। আজকাল দিনকাল খারাপ। ডাকাত মারলেও মারবে। পাবলিক মারলেও মারবে।

তবু কেষ্টকালী কুণ্ডুর বাস হাইওয়ে ধরে রাতেই আসছিল। বাসে বিয়েবাড়ি

ফেরত লোকজন ছিল। কেষ্টকালী কুণ্ডুর বাসের নাম 'কেষ্টকালী', ড্রাইভারের নাম কেষ্টচরণ, কন্ডাক্টরের নাম কেষ্টলাল।

কুণ্ডুগিন্নি বড় জাঁদরেল। তিনি বলে দিয়েছেন, দেখ! বাবুর নামে নাম, ও নাম এখানে চলবে না। তোমার নাম চরণ আর ওর নাম লাল।

ড্রাইভার মেনে নিল কিন্তু কন্ডাক্টর তো ফচকে যেমন, তেড়িয়াও তেমন।

পিতৃদত্ত নামটা ফেলে দেব? সে কি হয়? পিতা অবশ্য জলে গেছেন...

সে আবার কি?

আজ্ঞা। সিদ্ধি খেয়ে নৌকো চেপে আসছিলেন, তা মাঝিকে বললেন, বেছনা কি নাছচ?

ও আবার কি ভাষা?

—দেশের ভাষা মা ঠাকরুন। উনি বললেন, বেছনা কি নাছচ? ঘোনা কি টানাইছ? মানে বিছানা কি পেতেছ? মশারি কি টাঙিয়েছ?

—কি সর্বনেশে কথাবার্তা!

—মাঝিও তো সিদ্ধি টেনে ভোঁ। সে বলল, হ্যাঁ বাবু। সঙ্গে সঙ্গে বাবা বললেন তয় আমি শোই? মাঝি বলল, শোন।

তারপর?

—নৌকোর পাড়ে বসেছিলেন। শুতে যাবেন বলে যেমন কাত, তেমনি জলে ধপাৎ।

ডুবে গেলেন?

কে আর দেখল বলুন? আমি অবশ্য তখন দুধের শিশু, তবু পিতৃদত্ত নাম।

গিন্নি বললেন, সে যাই বল, আমি বলব চরণ আর লাল। এর নড়চড় হবে না।

কেষ্টলাল নিশ্বাস ফেলে বলল, তা হলে লালু বলে ডাকবেন। লালু বললে শুনতে মিষ্টি লাগে।

মীরচক, মীরবাজার, গরুখালি, দোহাটা, কেষ্টকালীর বাসই ভরসা। বিয়েসাদীতে ভাড়া কর। পিকনিক করতে বেথুয়াডহরি যাও, ওই বাস পাবে।

এই কেষ্টকালী কুণ্ডুর বাড়িতেই গরু চরায় রতন। বেজায় ভিতু। একটুতে ভয় পায়। খায় দায়। দশ টাকা পাইনে পায়।

বাবু। দশ টাকায় আর চলে না এ কথাটা অবধি ও বলতে ভয় পায়।

কেষ্টলালকে দেখে ওর হিংসে হয়। কি চমৎকার জীবন। বাসে চেপে টিকিট কাটো, ঘুরে বেড়াও, হরদম যাত্রী তুলে পয়সা হাতাও।

কেষ্টলাল ওকে বলে. তোর কিচ্ছু হবে না। তুই এমন ভিতু, গায়ে জোর আছে এত ভয় পাস কেন?

— ভয় সারান যায় না লালুদা?

— দেখি, খোঁজ করে দেখি!

— কি খোঁজ করবে?

— কতরকম পীর ফকির সাধু আছে...

— তারা ভয় রোগ সারাতে পারে?

— নিশ্চয়। আমার বন্ধু আরশোলা দেখলে ভয়ে কাঁপত। নিয়ে গেলাম পীরের মাজারে। বেঁধে দিলাম কবচ মাদুলি।

— তারপর?

— বাপ রে! সে এখন গব্বর সিং।

— সত্যি?

— নিশ্চয়। তার নাম শুনলে...

— কি হয়?

— পুলিশ মুচ্ছো যায়। সোডা, পটকা আর বোমের নাম শুনিসনি বুঝি?

— ও বাবা, তারা তো ডাকাত!

— তবে আর বলছি কি!

— ডাকাত তোমার বন্ধু?

কেষ্টলাল দার্শনিকের মত বলল, বন্ধু বলতে বন্ধু? তবে আমি তো ওদের লাইনে গেলাম না!

—দেখা হয়?

— তোকে বলব কেন? তুই যা ভিতু!

— আমাকে একটা ব্যবস্থা করে দাও না।

— সাহস থাকলে বাবুকে চোখ রাঙিয়ে বাসে চেপে চলে যেতিস কলকাতা।

কি করতাম?

কতরকম লাইন আছে। তোদের পাড়ার ছেলেরা করছে না? এখানে থেকেই তো...

—মা মেরে ফেলবে।

— ওই তো! মাকেও ভয় পাস।

রতন খুব বিমর্ষ হয়ে পড়ে। ওদের পাড়ার ছেলেদের অনেকেই চুরি, ছিনতাই, আরো কতরকম কাজে নেমেছে। ওইসব দেখেই তো মা ওকে এ বাড়ি রাখালী কাজে দিয়েছে।

— আমি তোর পয়সার ভরসা করি না। হাটে হাটে তরকারি বেচি, ছাগলের দুধ বেচি। তোর টাকা জমলে একটা গরু কিনব, তখন দেখিস!

— আমার এ কাজ ভাল লাগে না।

পাড়ার হাওয়া থেকে দূরে তোমায় থাকতে হবে। সেটা মনে রেখ।

এর চেয়ে ইস্কুলে পড়তাম।

পড়ে কি হবে? পড়লে কি বাবুরা কাজ দেবে? পড়েছিলি তো।

হ্যাঁ মা!

রাখালী কাজ ভাল লাগে না রতনের। একদম ভাল লাগে না। কিন্তু মাকে সেকথা বলবে কে? মা শুধু বলে, ধর্ম পথে থাক।

গিন্নিমাও বলে, সদা সর্বদা কি ভাবিস বলতো? পেটভরে খাস। কোন কষ্ট রাখিনি। মুখে হাসি নেই কেন? এইটুকু ছেলে, এমন গোমড়া?

রতন ভাবে। ইস! ভয়টা যদি সেরে যেত। এখনি রইল তোমার চাকরি বলে চলে যেতাম।

—লালুটার সঙ্গে বা অত গল্প কিসের?

এমনি, ও কিছু নয়।

ছোঁড়া রাতদিন শুধু বকে।

বাবু বলে, ও কথা বোল না, বোল না। চরুণ আর লালুকে পেয়েছি বলে দুটো পয়সা পাচ্ছি।

রতন মনে মনে ভাবে লালুদাকে "ছোঁড়া" বলা? ইস, গিন্নিমা যদি জানত যে লালুদার বন্ধু কারা, তাহলে ভয়ে মরে যেত।

তা এর মধ্যেই লালু ছুটি নিল তিনদিন।

—বন্ধুর কাছে যাচ্ছ লালুদা?

—কেন রে?

—বলছিলাম...

—কি?

—তোমার বন্ধু তো এখন গব্বর সিং। মাদুলিটা যদি আমাকে দিত...

—তুই কি ডাকাত হতিস?

—একটা কিছু করতাম।

—ডাকাত হয়ে লাভ কি বল? শুধু পালিয়ে বেড়াও, শুধু পালাও। বেকায়দায় ধরা পড় তো পাঁচ পাবলিক মেরে ফেলবে।

—ডাকাত হব কেন?

—তবে?

—ভয়টা তো সেরে যেত!

—বাঃ, তুই দেখছি...আচ্ছা, ব্যবস্থা একটা করে ফেলব।

—করবে তো?

—নিশ্চয়।

লালু দেশে গেল। দেশ ওর শান্তিপুরের কাছে। ওখানে মাটির গুণই আলাদা। সবাই না কি সাহসী কেউ ভীতু নয়।

—তুমি যে গরু ফোঁস ফোঁস করলে ভয় পাও?

এ কথা জিগ্যেস করলে লালু বলেছিল, বাবা বলেছিল, গরু জাতকে বিশ্বাস করবি না। বাপের কথা...

রতনের তো বাবাও নেই। মা যার অমন ডাকাবুকো, তার ছেলে যে কেন অত ভীতু তা কে বলবে। মনে মনে ও ভীষণ সাহসী হয়ে যায়। সিনেমায় দেখা সেই লোকটার মত দাঁতে ছুরি চেপে দু হাতে বন্দুক নিয়ে লাফিয়ে পড়ে পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে।

একশো একবার কেষ্টকালী কুণ্ডুর সামনে ছোরা নাচিয়ে বলে, মাইনে বাড়াও নইলে এখনি...

গিন্নিমাকে ভাতের থালা ছুঁড়ে দিয়ে বলে, মাছগুলো কোথায় সরালে?

কাজের বেলা কিচ্ছু করতে পারে না।

ইস, লালুদা যদি একটা কিছু এনে দেয়। তা হলে রতন মীরবাজারে সকলকে তাক লাগিয়ে দিতে পারে। ভয়টা রক্ত থেকে বের করা দরকার।

লালু দেশে যাবার সময়ে বাবু বলেছিল, ঝটপট ফিরবে। এ সময়ে লাইনে বাস চলুক না চলুক, বিয়ের মরশুম আসছে, এবারে ম্যাটাডোরও কিনব দুটো। পুজো রে, বরযাত্রী রে, এ ব্যবসাটায় মীরবাজারে এখনো কেউ লাগেনি।

লালুও কম নয়। সে বলে গেল, নিজের নামে একটা অটো কর্পোরেশান করে ফেলুন। তবে আগে অবিশ্যি ভোটে দাঁড়াতে হবে।

—বোকা না মেলা। ভোটে দাঁড়িয়ে পয়সা খরচ করব কেন?

—তা হলে একটা ট্র্যাভেল এজেন্সি করুন। বাসে চাপিয়ে তীর্থ ভ্রমণ করাবেন।

এসব বলে লালু তো কাটল। রতনের মন বড়ই উতলা। লালুদা তার কথাটা মনে রাখবে তো?

লালু তিনদিনের জায়গায় পাঁচদিন কাটিয়ে ফিরে এল। এসেই রতনকে বলল-

—এনেছি, এনেছি।

—এনেছ?

—নিশ্চয়।

—কি এনেছ?

—আশানন্দ ঢেঁকির নাম শুনেছিস?

—না লালুদা।

—আরে বাপরে! সে ছিল মহাবীর। ঢেঁকি তুলে ঘোরাত আর ডাকাতদের মারত। তাতেই তো কলকাতায় বড়লাট তাকে খবর দিল। বিলেত থেকে মহারানী ভিক্টোরিয়া এসেছে। তোমায় দেখতে চায়।

—সত্যি?

—নিশ্চয়। তা আশানন্দ ঢেঁকি সেই ঢেঁকি কাঁধেই কলকাতা গেল। মহারানী তাকে দেখে খুব খুশি। কত ঝুড়ি ঝুড়ি সোনাদানা........

—বিস্তর দিল!

—হেভি দিল। তা সেই যে আশানন্দ ঢেঁকি, সে মরে যাবার সময়ে আমার পূর্বপুরুষের কাছে তার আংটিটা রেখে গিছল। এ আংটি হাতে পরলে যে পরবে তারই দুর্জয় সাহস হবে।

—সেই আংটি দিচ্ছ?

—হ্যাঁ রে। ভেবে দেখলাম, আমরা সবাই তো সাহসী আছিই। তোর এখন দরকার। তা কাজ ফুরোলে আবার নিয়ে নেব।

—দাও না লালুদা।

—তাই কি হয়? শনিবার দিন সবাই বিয়েবাড়ি যাবে। গিন্নিমা তোকে থাকতে বলবে বাড়িতে। কিন্তু থাকলে চলবে না।

—কি করব?

লালু চোখ বুজে পানের পিক ফেলে বলল, শনিবার সন্ধেবেলা মীরতলা কালী বাড়ি যাবি। পুকুরে চান করবি। আংটি মাটিতে পুঁতে জলে নামবি। তারপর চান করে মায়ের মন্দিরে গড় করে তবে আংটি পরবি।

—একবার দেখাও না!

—এই তো!

দেখতে ঠিক পেতলের আংটির মত। লাল পাথর বসান মাঝখানে।

—দেখে বুঝবি না। আশানন্দ ঢেঁকিকে এ আংটি দিয়েছিল এক মহাপুরুষ। মহাপুরুষ তিব্বতে থাকত, উড়ে উড়ে আসত।

—কেউ দেখেছে?

—আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা যিনি, তিনি তো হরদম মহাপুরুষের দেখা পেত। তিব্বতে যেতে আসতে তিনি ওনার উঠোনের কাঁঠাল গাছে উঠে বসত আর কাঁঠাল ভেঙে খেত।

—শনিবার তোমরা বিয়েবাড়ি যাবে?

—ভোজের কথা ভাবছিস? আরে আংটি পরলে তোর কপাল ফিরে যাবে তখন তুই কতজনকে ভোজ খাওয়াবি তাই দেখিস?

সবই সত্যি। শনিবার রতন আংটি পরবে তাও সত্যি। কিন্তু ভোজের জন্যে ওর মন কেমন করতে লাগল। ইস, কত কি না খাবে ওরা। জীবনে একবারই রতন বিয়ের ভোজ খেয়েছে। কেষ্টকালীর ছেলের বৌভাতের ভোজ।

রতনের মা-ও বলল, এ কি রকম কথা? একটা দিন, ছেলেটা সঙ্গে যাবে। একটু ভালমন্দ খাবে। তাকে বাড়ি পাহারা দিতে রেখে যাচ্ছ?

এসব কথা ও কুণ্ডু গিন্নিকেই বলল। গিন্নি বলল, কি করব বাছা! সবাই যাব। যেতে হবে, ছেলেরই শালার বৌভাত। বাড়িতে একা কর্তা থাকবে, গদাই আর রতন না থাকলে হয়? পরে নয় ওকে একদিন ছুটি দেব।

শনিবার দিন বিকেল না হতে কুণ্ডুবাড়ির সবাই সেজেগুজে বাসে চাপল। কুণ্ডুবাবু বলল, গয়নাগুলো ফেরার কালে পেটকাপড়ে বেঁধে নিও। অত গয়না পরেই বা যাচ্ছ কেন?

—গয়না রয়েছে, কুটুমকে দেখাব না?

ছেলে বলল, ভয় কি? আজ পাইকারি হাট। কত লরি টেম্পো চলবে রাত অবধি। পথে লোক থাকবে।

তাও সত্যি। শনিবার বসে পাইকারি হাট মীরবাজারে। তল্লাটের লোক আসে কুমড়ো, পটল, ডাঁটা, বেগুন কিনতে। বিকেল থেকে রাত অবধি চলে কেনাবেচা। সে সব কিনে নিয়ে ব্যাপারীরা টেম্পো, লরি, রিকশা-ভ্যান নিয়ে চলে যায়।

আংটি তো এখনো পরেনি। তাই কিছুই না বলে কেটে পড়ার সাহস হল না রতনের।

সে বলল, বাবু! আমি একবার কালীবাড়ি যাব।

—কেন রে?

—মায়ের মানসা আছে।

—যাবি। ফিরবি তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সাতটা না বাজতে।

—অবশ্য ফিরিস।

—হ্যাঁ বাবু।

—অমনি বাঁকটা নিয়ে যা। দু'কলসি জল আনবি পুকুর থেকে।

—বাঁক নিয়ে যাব?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, গঙ্গাজল নেই।

গঙ্গা তো অনেক দূর। এ অঞ্চলে ওই কালীতলার পুকুরের জলই গঙ্গাজল বলে

চলে। রতন মনে মনে গজগজ করল। যেই শুনেছ কালীবাড়ি যাচ্ছি, অমনি চাপিয়ে দিলে দুটো ধুমসো কলসি।

বাঁকে কলসি চাপিয়ে যাবার সময়ে রতন হাটতলা ঘুরে গেল। মাকে দেখা যাচ্ছে না। কত মাটাডোর, টেম্পো সাইকেল-ভ্যান। তিনটে ছেলে মাটাডোরে কেবলি নারকেল ওঠাচ্ছে। ওঃ, বেচবে তো নারকেল, ব্যবসা তো হাটুরে ব্যাপারীর, পোশাক কি! কালো জামা, কালো প্যান্ট, গলায় খাসা রুমাল, চোখে কালো চশমা।

সকলের সঙ্গে ডেকে ডেকে কথাও বলছে। রতনকে বলল, কি ভাই কোথা চললে?

—মীরতলা কালীবাড়ি।

—তুমি কুণ্ডুবাবুর বাড়ি থাক না?

হ্যাঁ।

—যাও যাও। মীরতলা ভাল জায়গা।

—আপনারা গেছেন?

—যাব, যাব বই কি!

রতন সরল বিশ্বাসে বলল। খুব জাগ্রত দেবী। যে যা মানসা করে। স-ব পূরণ হয়।

—সকলের সব মানসা?

—মনে পাপ নিয়ে যে যায়...

—তার হয় না। এই তো?

—না।

—আমরা খুব ভাল ছেলে। দেখ না এম এ পাশ করে স্বাধীন কারবারে নেমেছি।

—হ্যাঁ দাদা।

রতন চলে গেল। মনটা তো ছুটছে তার। কাঁধে বাঁক নিয়ে, কি ছোটা যায়?

পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল গড়াল। ভক্তিভরে স্নান করল ও। মাঝপুকুর অবধি সাঁতরে গিয়ে তবে ঘড়া ভরল। তারপর জল থেকে উঠে কাচা কাপড় পরে ভিজে কাপড় রেখে মন্দিরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল।

আংটিটা মাটিতে পুঁতে রেখেছিল। তুলে নিয়ে জলে ধুয়ে আঙুলে পরল। কি আশ্চর্য, ওড়িয়া পুরোহিত তখনি ওর হাতে বাতাসা দিয়ে বলল, মা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি দিবে রে।

পুরুতকেও প্রণাম করল রতন। আঙুলে এখন আশানন্দ ঢেঁকির আংটি। এখন নিজেকে কেমন সাহসী সাহসী বোধ হচ্ছে। মনের মধ্যে কে যেন বলছে এতখানি শরীর। খেটে খাস, গায়ে জোর, ভয় কেন পাবি?

মনে মনে 'জয় মা!' বলে রতন রওনা হল। এখন আর ছুটে যাবার উপায় নেই। পথের সবটা ভালও নয়। বাঁকের ভারও আছে।

মীরতলা ছাড়াতেই অন্ধকার। খানিক দূর দিয়ে পথ গেছে দক্ষিণে ঘুরে। ওই পথেই বাবুর বাস গেছে। ওই পথ এসে উঠেছে হাইওয়েতে। তারপর উত্তরে ঘুরলেই মীরবাজার। মাইল দেড়েক দূরে।

এইখানে পৌঁছন গেল। তারপর? এসেছিল ভেতর দিয়ে দিয়ে। সে পথে তাড়াতাড়ি আসা যায়। কিন্তু ও পথে আলো নেই। তার চেয়ে বাসের পথ ধরে যাওয়াই ভাল। কিন্তু বাঁকটা যেন বড্ড ভারী।

পুলিনবাবুর ইটভাটা, কি যেন মামলার ফলে বন্ধ হয়ে আছে। রতন এখানে হরদম গরু চরাতে আসে। বাঁকটা নামিয়ে অন্ধকারেই বসল রতন। একটু হেলান দিই, একটু জিরোই। ওই তো কত ভ্যান টেম্পো যাচ্ছে পথ ধরে। কলসি দুটো দু হাতে আগলে বসি।

বসে বসে কখন চোখ ঢেলে ঘুম নেমেছে তাই কি রতন জানে? ঘুম বলে ঘুম সে একেবারে অজগর ঘুম। ঘুমোলে রতন বেহুঁশ।

ঘুম ভাঙল যখন, তখন কত সময় যে কেটে গেছে তা রতন বলতে পারে না। মিশমিশে রাত, পথও নিঝুম। সর্বনাশ! কত রাত হল?

সাহস আছে চলে যাব, সাহস আছে চলে যাব, মনকে বলছে রতন, বলতে বলতেই মনে হল খুব চেনা হর্ন দূরে বাজছে।

বাবুর বাস তো বটে! যাক, পথে যেয়ে দাঁড়াই। দোষ যা হয়েছে তা হয়েছে, বাসে চেপে ফিরে যাব।

এই ভাবছে ও এমন সময়ে কানে এল কথা।

প্রথমটা চমকে উঠল রতন। এত রাতে কথা বলে কে? মানুষ তো? সাড়া দেবে, না দেবে না? যদি খারাপ লোক হয়। তাহলে তো রতনকে মেরে ঘড়া দুটো নিয়েই পালাবে।

—ভ্যানটা কোথায়?

—রাস্তায়, রাস্তা বন্ধ করেছি।

—বাসটা আসছে তো?—হ্যাঁ হ্যাঁ, কেষ্টলালের সঙ্গে কথা হয়েই আছে। বাস এ পথেই আসবে।

—নারকেলগুলো?

—ভ্যানেই আছে।

—চল তা হলে।

রতনের মাথা বোঁ করে ঘুরে গেল। সেই তিনটে ছেলে! লালুদা বলেছিল ওর

ওঃ, কারসাজি দেখ, দেখ কারসাজি।

—কটা বাজল?

—এগারোটা।

বাসটা এগোচ্ছে, এগোচ্ছে। রতন এখন কি করে? হাতে আংটি আছে। বুকে সাহস আছে কি?

ছুটে যাবার শব্দ। চল। রতনও যাচ্ছে। বটগাছটা ঘুরে পঞ্চায়েত ভবন বাঁ পাশে রেখে গাড়ি যখন পথে উঠেছে। হেডলাইটের আলোতে দেখা গেল ভ্যানের সামনে তিনমূর্তি।

জয় আশানন্দ ঢেঁকি! চরণদা। বাস থামিও না। সাইড কেটে চলে যাও।

বাস থেমে গেল।

তারপর কি হল রতন বলতে পারে না। কোথা থেকে ও সাহস পেল। ভীষণ অবাক কাণ্ড। ও যে ভ্যানে লাফিয়ে উঠেছে। ধমাধম নারকেল ছুঁড়ছে ওদের গায়ে মাথায়। যার মাথায় লেগেছে সে কি পড়ে গেল? রতন ছুঁড়ছে আর বসে পড়ছে। একই সঙ্গে ও চেঁচাচ্ছে। চরণদা! বড়দা! আমি রতন। আমি রতন!

বাসের পেছনের দরজা দিয়ে কারা নামছে। কারা ছুটছে। কে যেন বলল, ভ্যানে স্টার্ট দে!

যে আসছিল, রতন তার মাথায় দড়ি বাঁধা চারটে নারকেল ধমাস করে মারল।

বিয়েবাড়ি থেকে বেরতে রাত হয়েছিল বলে ওবাড়ি থেকে জনাছয়েক যণ্ডা ছেলে এদের পৌঁছতে এসেছিল। তারাই ছুটে এসেছিল। লোহায় মাথা বাঁধান লাঠি নিয়ে। সোজা কথা নয়। তারা মদনচক গ্রামের দেহশ্রী ছয়জন।

তারা না থাকলে কি হত বলা যায় না। ওদিকে যখন বিষম হুটোপুটি। রতন লাফিয়ে নামল। ওর মনে তখন প্রচণ্ড রাগ। একটা বোম পড়ল কোথায়।

—পেটো দেখাচ্ছ?

ধমাস ধমাস লাঠির বাড়ি। রতন ছুটতে ছুটতে বাসে উঠল আর লালুর মাথায় ঝুনো নারকেলটা ফাটিয়েই ও অজ্ঞান হয়ে গেল। বাপরে! এতক্ষণ যাদের মারছিল তারা ডাকাত তো বটে। তারা যদি রতনকে মারত?

তারপর যা হল তা তো বুঝতেই পারছ। মীরবাজার থেকে মীরতলা ভেঙে পড়ল। দারোগা অব্দি বলল, ওঃ! টিপ বটে ছোঁড়ার। এক বেটাও বোমা পিস্তল বাগিয়ে ছুঁড়তে পারেনি?

রতনের তখন কি আদর! কি আদর! পরদিন ভোরেই তিনজনকে বেঁধে-ছেঁদে পুলিশ হাসপাতালে পাঠাল। আর কেষ্টলালকে সিধে থানা গারদে।

মীরবাজারে রতন একেবারে নায়ক হয়ে গেল। সেই রতন। সেই ভীতু রতন। তার নাম কাগজে উঠে গেছে। তার সাহসের জন্যেই ডাকাতরা ধরা পড়েছে। এ যে সপ্তম নয়। অষ্টম আশ্চর্য!

কেষ্টলাল অবশ্য লম্বাচওড়া কথা বলতে বলতেই চালান হয়ে গেল। বরাবর যারা বাসের সামনে শুয়ে পড়ে বাস আটকায়, এবার কেন যে তারা কৌশল পালটাতে গেল!

মীরবাজারে রীতিমত সভা করে অঞ্চলপ্রধান বলল, দেখ! সাহস কইরা আউগাইলে একোজনেও কেমুন লঙ্কাকাণ্ড বাধাইতে পারে!

মীরবাজারের লোকরা চেপে ধরল কুণ্ডুবাবুকে। দিন, রতনকে মোটা টাকা দিন।

মদনচক গ্রামের ছয় দেহশ্রী রতনকে প্রচুর বাহবা জানিয়ে গেল। একজন তো বলল, ভাই! তোমার হাতটা ঝাঁকাতে চাই । অভিনন্দন!

রতন গম্ভীর হয়ে বললে, আংটিটা বাঁচিয়ে।

ওর মা অবশ্য বলল, কেন সাহস দেখাতে গেলি? গুণ্ডাগুলো যদি গুলি চালাত?

রতন করুণাভরে হাসল একটু।

তিনটে কেন, ত্রিশটা ডাকাতও কিছু করতে পারত না, কেন না রতনের হাতে ছিল ওই আংটি।

কিন্তু সে কথা তো মাকে বলা যায় না। ও শুধু মাকে বলল, পাঁচশ টাকা পেয়েছ, গরু না হয় ছাগল কেন। নয় হাটে পানের দোকান দাও।

না, রতন আর বাবুর বাড়ি রাখালী করবে না। এখন থেকে ও কেষ্টকালী বাসের হেলপার-কন্ডাক্টর। পরে গাড়ি চালানটা শিখতে পারলে ...

আর কী রাখালী কাজ করা যায় দশ টাকায়? আশানন্দ ঢেঁকিব আংটি! সে আংটির একটা সম্মান নেই? তোমরা কি বল?

অথ অজগর কথা

জায়গাটা কোথায়, কোন জঙ্গলের কথা বলছি, তা কিছু বলা যাবে না, কেন না এ সব বেজায় গোপন কথা! জঙ্গলের কথাবার্তা ফাঁস করতে নেই। ফাঁস করতে গেলে কি রকম বিপদ হয়, তা নিয়ে একটা সত্যি কথা বলি। যদিও, কথাটা সত্যি, না মিথ্যে তা কোনদিন প্রমাণ করতে পারবে না। এ ভাবেই বুঝে দেখ। ন্যাদোশ যদি মিথ্যে না হয়, আসল বড় গল্পে যাবার আগে ভূমিকায় যে ছোট গল্প বলছি, তাও মিথ্যে নয়।

ছোট গল্পটা কি তা বলি। যেবার স্বাধীনতার পর প্রথম সেন্‌সাস নেয়া হল, পশ্চিমবঙ্গের কোনো জেলার এক উৎসাহী কেরানী লিখলেন, তিনি যে জায়গাটা ঘুরেছেন সেখানে চার হাজার "গ্যান্‌ডার" আছে! তাঁর বক্তব্য ছিল হাঁস আছে চার হাজার, হাঁসী কতগুলি তা ভুলে গেছি।

এটি যাঁর হাতে গেল, তিনি ভাবলেন, দেখ দেখি কাণ্ড! গণ্ডার লিখবে, তা "গ্যানডার" লিখেছে। তিনি উপর মহলে গুছিয়ে লিখলেন, এই জেলায় চার হাজার রাইনোসেরাস আছে। তিনি তো ইংরিজিনবীশ, তাই "গণ্ডার" লিখবেন কেন?

এ খবর পেয়ে না কি মহাকরণে মহা হুলুসস্থুলুস। আমরা গণ্ডারকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি, আমরা জানি যে গণ্ডার জলাজঙ্গলে থাকে, —এই তো একটা শুকনো পোড়োঝোড়ো জেলায় চার হাজার গণ্ডার ঘুরছে। —তখন সে জেলার বনবিভাগের কাছে জানতে চাওয়া হল, গণ্ডারদের জন্যে তিনি কোনো বিশেষ ব্যবস্থা কেন করেননি। আর চার হাজার গণ্ডার যে আছে তা জানাননি কেন।

তিনি জবাব দিলেন, 'গণ্ডার নাই বলিয়া জানাই নাই। যে গণ্ডার নাই তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা কি ভাবে করিব জানাইলে নির্দেশ মতো কাজ করিব।'

জঙ্গলের ব্যাপার স্যাপার মোটেই সোজা নয়।

তা, কোনো এক জেলার কোনো এক জায়গায় আছে সংরক্ষিত অরণ্য। সংরক্ষিত বনে সব প্রাণীই নিরাপদ। এদেরও গুনে গেঁথে রাখা হয়। এই জঙ্গলের দায়িত্ব পেলেন এক জঙ্গল বাবু।

সঙ্গে সঙ্গে পুরনো জঙ্গলরক্ষী বাহাদুর তাঁকে একটা তালিকা ধরিয়ে দিল। গরম কালে জানোয়াররা যখন জল খেতে আসে তখন জলাশয়ের ধারে কাদার ওপর পায়ের ছাপ দেখে সব গুনে ফেলা হয়েছে। জঙ্গল বাবু বাহাদুরকে বললেন, সব গোনা গাঁথা? —সব।

—গোসাপ, খরগোশ, কাঠবেড়ালী?

—স-ব গোনা আছে। —সাপ?

সাপেদের তো আগে গুনেছি হুজুর।

এই সময়ে লালু নামে আরেক জঙ্গল রক্ষী বলল, সাধু চরণকে কিছু করা যাচ্ছে না হুজুর।

—সাধুচরণ! সে আবার কে?

—একটা পুরনো ময়াল সাপ।

—তার নাম সাধুচরণ?

—সাপটা সন্নেসী টাইপের হুজুর। সাধু সন্নেসী ধারে কাছে এল তো তাদের পায়ের কাছে গিয়ে হাজির হবে। তাই তো ওর নাম সাধুচরণ?

—বটে! তা তাকে কিছু করা যাচ্ছে না কেন?

—সুযোগ গেলেই বন থেকে বেরিয়ে যায়।

—না না, সে সব কোন কাজের কথা নয়। এই বন এবং এ বনের সমস্ত প্রাণী তোমাদের হেফাজতে। কখনো যদি গুনতিতে কম পড়ে তো দেখবে।

বাহাদুর বলল, সাধুচরণ বেশ বজ্জাত আছে হুজুর। নদীতে সাঁতার কেটে হেথাসেথা যায়।

—ময়াল সাপ ক'টা আছে বনে?

—তা, তিনটে তো বটেই। —না হুজুর, সাতটা।

—ধুর বোকা, তুইও যেমন!

নদীতে সাঁতরাচ্ছিল, দেখ নি?

—ওরে গাধা! সাধুচরণ সাঁতরাল, তুই একটা ময়াল দেখলি। সে পাড়ে উঠল, তুই আরেকটা দেখলি। সে গাছে উঠল, তুই আরেকটা দেখলি। —থামো থামো!

লালু আর বাহাদুর বলল, চলুন না হুজুর। স্বচক্ষে গুনে গেঁথে দেখবেন ক'টা ময়াল আছে?

—না না। তোমাদের কথাই যথেষ্ট।

বাহাদুর বলল, এ একটা কথা বটে। হুজুর যখন কাছে যাবেন, তখন যদি তার ক্ষিদে থাকে? সেবারে তো....

—কি হয়েছিল?

—বিটবাবুর পা থেকে খেতে লেগেছিল তো আমরা হিঁচকে টেনে নিলাম তাঁকে, আর একটা ছাগল ছানা ছুঁড়ে দিলাম। তা সাধুচরণ কিছু বলেনি।

জঙ্গল বাবু বুঝলেন, এ আগেকার নিরাপদ শাল জঙ্গল নয়। এ এক গোলমেলে জায়গা।

বাহাদুর বলল, ওই সাধুচরণ এ বনের লক্ষ্মী, জানেন হুজুর? একবার চলে

গিয়েছিল কোথায়। সেবারই মড়ক লেগে খুব জানোয়ার মরল। একেবারে অনেক। ও ফিরে আসতে আমরা মুরগি দিয়ে ওকে পুজো দিলাম।

—সে তোমাদের বিশ্বাস!

—ওদের কত প্রাণীর মধ্যে দেবদেওতা থাকে হুজুর, পুজো দিতে হয়। এখন না হয় বনও ছোট, জানোয়ারও কম। বন যখন বড় ছিল, জানোয়ার অঢেল ছিল, তখন দেবদেওতার পুজো দিয়ে আমাদের বাবারা বনে ঢুকেছে, কারো কোন অনিষ্ট হয় নি।

লালু বলল, সাধুচরণকে যদি একবার তাগিয়ে বাগিয়ে ধরতে পারি তাহলে ওর গলায় ঘন্টা বেঁধে রাখব। চলবে তো ঘন্টা বাজবে।

বাহাদুর বলল, ঘন্টা বাঁধবি? কি দিয়ে বাঁধবি? যা দিয়েই বাঁধিস, ময়াল গা ফুলালেই বাঁধন ছিঁড়ে যাবে।

জঙ্গল বাবু মনে মনে ঠিক করলেন যে, যদ্দিন এখানে আছেন পারতপক্ষে বনে ঢুকবেন না।

আপিস থেকে বেরিয়ে বাহাদুর লালুকে বলল, বাবু জবর বাবু! এত বাবু এল গেল, কেউ বলে না, সাপ কত! গোসাপ ক'টা! বেজি, খরগোশ, সজারু ক'টা!

—এরপর বলবে পাখিগুলো গুনে ফেল।

—সাধুচরণকে নিয়েই মুশকিল।

—তুই ওকে চিনিস?

—খুব চিনি। লেজের ৬গা কাটা।

—হ্যাঁ লেজকাটা সাধুচরণ।

তা বনের পাশেই নদী। নদী থাকলে জেলে থাকবে। জেলেদের সঙ্গে লালু আর বাহাদুরের ভাবও খুব। জেলেপাড়ার নিতাই ওদের মাছ খাওয়ায়। ওরাও খরগোশটা সজারুটা। বনেও থাকব আর মাংস কিনেই খাব, তা কি হয়?

দিন যায়, দিন যাচ্ছে। জঙ্গল বাবু বাহাদুরকে ডেকে মাঝে মাঝেই বলেন, জানোয়ারগুলো সব আছে তো?

—হ্যাঁ হুজুর, কোথায় যাবে?

—দেখো। আবার কিন্তু গোনাগুনি হবে।

—হোক্ না কেন? আপনি বরং দেখুন কিছু গার্ড বাড়াতে পারেন কি না।

—আরে, তোমরা আছ তো।

এ রকমই চলছে। হঠাৎ সেদিন বাহাদুর এসে বলল, সর্বনাশ হয়েছে হুজুর। সাধুচরণ আবার সাঁতরে কোথায় চলে গেল। এবার দেখবেন কি বিপদ হয়।

—কোথায় গেল?

—সে কি বলে কয়ে গেছে যে জানব?

—না না, এমন লম্বা অমন মোটা বুড়ো ময়াল হল এ জঙ্গলের শোভা। তা ছাড়া গোনাগুনতি হিসেবের সাপ। তার খোঁজ কর।

—হুজুর। পুব পানে গেলে গাঁয়ের লোকরা মেরেই দেবে। ও তো লোকেব হাঁস মুরগি সব খাবে।

লালু বলল, ছোট ছেলেপিলে পেলে কি ছেড়ে দেবে?

—না না, সে ভয়ানক বিচ্ছিরি হবে। কাগজে বেরোবে হই চই হবে, তাকে ধরতে হবে।

—আমাদের সাধ্যি কি?

জঙ্গলের দিকে দিকে যতজন জঙ্গলরক্ষী আছে, তাদের বলা হল। জঙ্গল তোলপাড়। নেই সাধুচরণ, কোথাও নেই। বাহাদুররা বলতে লাগল, এবার দেখবেন কিছু বিপদ হবে। ও যখনি জঙ্গল ছাড়ে তখনি ঝামেলা বাধে।

জঙ্গলবাবু ক্ষেপে গিয়ে বললেন, ও সব জানি না। বনের প্রাণী বনে ফেরাও। নইলে সকলের জরিমানা হবে।

বাহাদুররাও ক্ষেপে গেল, জরিমানা করলেই হল? জঙ্গলে গোলমাল তো বেধে গেছে। গাছের ডাল ভেঙ্গে একজন কাঠুরে জখম হয়েছে, নতুন চারা লাগাবার গর্তে হরদম সাপ বেরোচ্ছে, এ সব কি যথেষ্ট বিপদ-সংকেত নয়? পাহাড় থেকে হাতি নামার সময়ও হয়ে এল। সাধুচরণ আছে বলে না বিপদে আপদে রক্ষা পাওয়া যায়?

এমনি থমথমে সময়ে জঙ্গল আপিসের ছোট বাবু, যিনি চাকরিতে ছোট অথচ বয়সে বড়। তিনি বললেন, ওদের চটালে সাধুচরণ ফিরবে না। আপনি বরং বখশিস দেবেন বলে ঘোষণা করুন।

—কে আসবে সাপ ধরতে?

—কেন, জেলেপাড়ার নিতাইয়ের বাবা।

—সে সাপ ধরবে? —সে এ কাজে ওস্তাদ।

এ সব কথাবার্তা হচ্ছে যখন, তখন বাহাদুর আর লালু নিতাইদের সঙ্গে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। নিতাইয়ের বাবা নিতাইকে বলেছে, ওরে! বাহাদুরকে ডাক তো।

—কেন?

সারারাত নদীতে কাটিয়ে নিতাইয়ের বাবার চেহারা জলদৈত্যের মত হয়েছে। সে ক্ষেপে গিয়ে বলল, বেটারা খালি খালি বুড়ো ময়ালটার থাকার গাছের কোটরটার কাছে ঠকর ঠকর করবে, সে বেটা চলে এসেছে আবার। আমি তো তাকে জালেও বেঁধেছি, জলেও রেখেছি। এবার আমি ওটাকে বেচে দেব। অনেক টাকা পাব।

নাইলনের শক্তপোক্ত জালের মধ্যে সাধুচরণকে দেখে বাহাদুররা নিশ্চিন্ত হল। মাথাটি নদীর পাড়ে, জলের মধ্যে দেহটি। বাহাদুর হাত জোড় করে বলল,

দেবদেওতা বলে মানি, পুজো দিই, ঘরের মুরগি খেলে কিছু বলি না, কেন থেকে থেকে সন্নেসী হও?

নিতাইয়ের বাপ বলল, জলে রেখে কাবু করি। তারপর বেতের খাঁচায় পুরব আর বেচে দেব।

লালু বলল, মাথা গরম কোর না। জঙ্গলবাবু বড় জ্বালাচ্ছে। দেখি, একটা বুদ্ধি করা যাক।

নিতাই গা চুলকে বলল, বনের প্রাণী বেচে দিলে তোমার জরিমানা হবে, জেলও হবে।

নিতাইয়ে বাপ বলল, হোক। দেখ্ নিতাই! আমাকে জেলে দেয় এমন লোক নেই। এ সাপ বেচলে অঢেল টাকা। টাকা নিয়ে আমি চলে যাব।

যাহোক, তারপর সবাই তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করল। অনেক পরামর্শের পর বাহাদুর বলল, যাই। কিছু টাকা তো আদায় করে ছাড়ি। তারপর দেখা যাবে।

ওরা জঙ্গলবাবুর কাছে নিতাইয়ের বাপকে নিয়ে গেল। নিতাইয়ের বাপ বলল, এ কি শুনছি বাবু? সে যে ভীম অজগর। ক্ষিদে জাগলে আশপাশের গ্রামের মুরগি-ছাগল খেয়ে নিকেশ করবে।

—বাপ রে বাপ! তারপর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

—তা আর হবে না? বাছুর খেলে তো হাজার টাকা দিতে হবে। এখন সব কিছুর দাম কত!

—তা শ'খানেক টাকা পাবে বাপু।

—একশো টাকা? এ কি ঠাট্টা করছেন বাবু?

—একশো কি কম হল?

—বেশি আর কি হল বাবু! ওই ভীম অজগর! আহা, পড়ে থাকে যেন মহাদেব! কিন্তু তাড়া করলে রক্ষে আছে? লেজের বাড়ি মারলে প্রাণটা চলে যাবে। আচ্ছা চলি। একশো টাকার জন্যে প্রাণটা দিতে পারব না।

ছোটবাবু জঙ্গলবাবুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, শহরে গাঁয়ে, সর্বত্র দালাল ঘুরছে। জ্যান্ত প্রাণীর দাম যত, চামড়ার দাম সোনার মতন। এ বুড়ো যদি ধরে বেচে দেয়, হাতে হাতে হাজার টাকা পাবে। সাপের চামড়া হরদম রপ্তানি হয়। সার্কাস পার্টির লোকজনও আছে। আর কোথাও না হোক, বিদেশের চিড়িয়াখানাতেও কিনবে।

—কি বলছেন? বখশিস বাড়াব? বলুন না।

—নিশ্চয় বাড়াবেন।

অনেক দরাদরির পর ঠিক হল যে জ্যান্ত এবং অক্ষত অবস্থায় সাধুচরণকে ধরতে পারলে হাতে হাতে আড়াইশো টাকা পাওয়া যাবে আর ধরার জন্যে যে

অসম্ভব পরিশ্রম হবে তার কারণে জঙ্গলবাবু পকেট থেকে একটা যাকে বলে রীতিমত ভোজের খরচ দেবেন।

নিতাইয়ের বাপ বলল, পুজো বলে তিরিশটা টাকা আগে দিয়ে দিন তো। পুজো না করে এমন কাজে হাত দেয়া ঠিক নয়।

অনেক মুড়ি বাতাসা দিয়ে পুজো দেয়া হল। তারপর নিতাইয়ের বাবা বাহাদুরকে বলল, বড় ডুলির মত খাঁচা বানাব। বন থেকে বাঁশ আর বেত এনে দাও।

বাহাদুর বলল, তার চে গ্রাম থেকে গাড়ি আনি। ওই জালে বেঁধে ছেঁদে গাড়ি করে নেব তখন।

--গরু গাড়ি টানবে না।

--ছেলেরা টানবে। তা মুরগি একটা দিলে হত না ওকে? কিছু না খেয়ে রয়েছে?

--থামো দেখি। দু চার দিন না খেলে সাপের কি হয়? কিচ্ছু হয় না। ওরা কি মানুষ যে নিত্য খাবার চাই? যাই, একটা গাড়িই দেখি।

গরুর গাড়ি থেকে গরু খুলে গাড়িতে খড় চাপিয়ে সাত দশজন মিলে তো সাধুচরণকে ওঠাল। জলে ভিজে জালে বাঁধা পড়ে সাধুচরণও কয়েকদিনে খুবই কাবু হয়ে পড়েছিল। বাহাদুর বলে, ও রোগা হয়ে গিয়েছিল বলে ওঠানো গেল। তা রোগা আর কাহিল সাধুচরণের ওজনই অনেক। জালের পোঁটলা পাড়ে তুলে বাঁশের মাচানে রাখা হল। তারপর তাকে মাচান সুদ্ধ বয়ে গাড়িতে রাখা হল। নিতাই গ্রামের ছেলেদের, জেলে পাড়ার সকলকে ডেকে নিয়েছিল। সবাই হই হই করে সাধুচরণকে নিয়ে চলল।

জঙ্গলবাবুর সামনে নিতাইয়ের বাপের কি বারফট্টাই! কয়েকদিন ধরে সে কোথায় খুঁজেছে, কোথায় খোঁজেনি! তারপর যখন তার দেখা পেল, তখন সে একটা গাছ পেঁচিয়ে এদিক-ওদিক চাইছে। কত কৌশল করে ওকে ধরা গেল।

জঙ্গলবাবু দেখে নিলেন লেজের ডগা কাটা মস্ত ময়াল তিনি বললেন এবার ওকে জঙ্গলে রেখে এস বাপু।

বনের মধ্যে নিয়ে, জাল না ছিঁড়ে অনেক চেষ্টায় গলদঘর্ম হয়ে তবে সাধুচরণকে তার কোটরে রাখা গেল। গর্তের মধ্যে ফেলতে সে একবারটি হাঁ করেছিল, তাই দেখেই সব দে দৌড়।

বখশিস তো হাতে হাতে। টাকাটা কেমন হিসেবে ভাগজোখ হয়েছিল তা বলতে পারব না। তবে জঙ্গলবাবুর কাছে রীতিমত ভোজটা ওরা আদায় করেছিল। সব চেয়ে বেশি ভাত আর মাংস খেয়েছিল বাহাদুর।

বড়াম মায়ের থানে

মোহনচাঁদবাড়ি গ্রামে তোমরা কেউ ঝপ করে বেড়াতে যাবে বলে মনে করি না। গেলে আমি খুব খুশি হতাম। ছুটিতে তোমরা, যারা বেড়াতে যাও, কত দূরে চলে যাও। কাশ্মীর থেকে উটি। বোম্বে থেকে আন্দামান, হিমালয়ের বুকের শহর, কত জায়গা! আমার তো খুব ইচ্ছে করে যে গ্রামে যাও, গ্রাম দেখ। গ্রাম না দেখলে দেশ দেখা সম্পূর্ণ হয় না। গ্রামে আরাম কম, সুবিধে কম, সবই কম কম, তবে মানুষ তো আছে।

অবশ্য মোহনচাঁদবাড়িতে কি দেখতেই বা যাবে! তিরতির করছে একটা গ্রাম। বম্বে রোড ছেড়ে দক্ষিণে ঘুরে ঘুরে একটা জঙ্গলের এলাকা। তারই পরে মোহনচাঁদবাড়ি। সাঁওতাল, ভূমিজ, মাহাত, এমন কয়েক ঘর। গরিব তারা, ভীষণ গরিব। হ্যাঁ, দেখার মতো বাড়ি বটে হরকান্ত মহাপাত্র বাবুর। তাঁরই বাড়িতে মোহনচাঁদজীউয়ের মন্দির।

মোহনচাঁদজীউ খুব সৌখিন দেবতা। পেতলের ঝকঝকে চেহারা, হাতে রুপোর বাঁশি, পায়ে রুপোর নূপুর, হাতে সোনার বালা আর গলায় সোনার মালা। মাথায় রুপোর জালে তৈরি কটকি ময়ূরপুচ্ছটি দেখার মতো।

এই যে খরা চলছে, গরিবের পেটে ভাত নেই, মোহনচাঁদ কিন্তু দুধে পাক করা মোহনভোগ খেয়ে দিন শুরু করেন, দুপুরে সরু চালের ভাত, পঞ্চব্যঞ্জন আর পায়েস, বৈকালীতে ফলমূল, স-ব তাঁর চাই।

সাঁওতাল ছেলে রতন হেমব্রম বড্ড পাজি। সে পুরুতকে বলে, সব যদি ওই ঠাকুর খাচ্ছে, তবে সে মোটেই মোটা হচ্ছে না, আর তুমি দিন দিন চালের জালার মত পেট মোটা হচ্ছ, এর কারণ কি?

পুরুত ঠাকুর মোটাসোটা নাদুসনুদুস বটে। তবে মানুষটা বেশ ভালো। পুরুত বলে,—রতন রে! এই যে মোটা দেখছিস, এ শুধু ঠাকুরের দয়া।

রতনকে পুরুত ঠাকুর বেশ পছন্দ করে। তার একটা বড় কারণ হল, পুরুতের ভাইপো সনাতন তার চব্বিশ বছর বয়সের মধ্যে চুরি বাটপাড়ি জোচ্চোরি সবই করেছে। শেষে মন্দিরের রাসনকোসন চুরি করে ওড়িশা পালিয়েছিল। সবাই বলেছিল, যাক! আপদ গেছে।

আবার বছরখানেক হল সনাতন গ্রামের বাইরে রাস্তার ওপর একটা চায়ের দোকান খুলে বসেছে। ঠিক নিজের মতন বেয়াড়া কয়েকটা ছেলে সেখানে জুটেও গিয়েছে। সনাতন বলে, কাকা—জ্যাঠা মানি না। একদিন যাব, কাকার মাথায় বাড়ি মেরে মন্দিরের সব লুটে আনব।

পুরুত ঠাকুর ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপে। এই সনাতনের দলই সেদিন রতনের লাল-সাদা ছাগলটা ধরেছিল, কেটে খাবে বলে। রতনরা কয়েকজন রীতিমত মারপিট করে ছাগল ফিরিয়ে এনেছে।

বয়সে যারা অনেক ছোট, তাদের হাতে মার খেয়ে সনাতনের তেড়িবেড়ি খানিক কমেছে। তাতেই পুরুত খুব খুশি।

রতন কি করে, তা বলা উচিত। রতন, হারা, মনাই, রাজা, গোপাল, সে এক দঙ্গল ছেলে যাকে বলে। ওদের বাবারা পারমিট নিয়ে বন থেকে কাঠ কুড়োয়, মরা গাছ, জ্যান্ত গাছ কাটে। রতনরা হাটে বাজারে কাঠ বেচে।

তা ছাড়া পাতা আনে, মাটি খুঁড়ে নানারকম কন্দ আনে। যখন কাজ পায়, কাজ করে। হরকান্ত বাবুর জমিতে কাজ করে। তবে বর্ষার নামগন্ধ নেই। চাষবাসও নেই। রতনের দাদু ভৈরব বলে, গ্রামদেবতা বড়াম মায়ের পুজো দাও, জল হবে।

হ্যাঁ, বড়াম মা ঠাকুরানী এই সাঁওতাল, ভূমিজ, মাহাতদের কাছে অনেক বছর হল পুজো পাচ্ছেন। আজকাল ওরাও বিশ্বাস করে না যে বড়াম মায়ের পুজো দিলে কোনো সুরাহা হবে।

ভৈরবের বিশ্বাস টলে না।

সে বলে, সেবার যখন ঝড় হল, মা ছুটাছুটি করে ঝড়কে অন্য পথে পাঠাল তা জানিস? সকালে দেখি মায়ের পাটের চুল উসকোখুসকো, শালুর শাড়ি আলুথালু, সে কি চেহারা! হবে না? মা যে জাগ্রত।

রতন বলে, হ্যাঁ, খুব জাগ্রত। তাতেই যারা বড়াম মায়ের ভক্ত তাদের পেটে ভাত নেই। যারা বড়ামকে মানে না, সেই হরকান্ত বাবু রোজ ভাত খায়।

রতন! —রতনের মা ধমকে ওঠে : ঠাকুর্দার সঙ্গে কথা বলছিস তা মনে রাখিস।

ভৈরব বলে, তোরই তো দোষ। সেই যে ইস্কুলে পাঠালি, দু বছর পড়ে লিখে মাথাটা ওর কেমন হয়ে গেল।

রতন আর কিছু বলে না। তবে বাবা-মা-নিজে, তিনজনে অনেক কষ্টে জোগাড় করা চালের ভাত আর বনের তুঙ্গা আলুর তরকারি যখন খায়, তখন তার মনে হয়, পিতলের ঠাকুর এত এত খাবে আর রক্তমাংসের মানুষ মোটে খাবে না, এই বিচারটা কি মোহনচাঁদজীউ, কি বড়াম মা, কোনো দেবতাই কি সুবিচার করেছে।

মোহনচাঁদজীউ বা কেমন জাগ্রত? পুরুত বলে, খুব জাগ্রত।

তখন রতন বলে, সনাতন যখন বাসন চুরি করছিল তখন জাগ্রত ঠাকুর কি মজা দেখছিল?"

—ঠাকুরের লীলা!

—লীলা আবার কি?

—ঠাকুর বাধা দেবে কেন? সে যে নতুন বাসনকোসন চাইছিল। তাই বাধা দেয়নি।

—যত বাজে কথা! আমাদের ছাগল ধরেছিল, বলেছিল দেব পাঁচটা টাকা। তা মারধোর করে কেড়ে আনলাম বলে না ছাগলটা পেলাম?

—ও তুই বুঝবি না।

এমনি করেই চলছিল সব। কিন্তু একদিন সকালে গ্রামে হই হই কাণ্ড। মন্দিরটা হরকান্তের বাড়ির উঠোনে। উঠোন পাথরের পাঁচিলে ঘেরা, পাঁচিলের গায়ে ভারি দরজা। মন্দিরের দরজায় ভারি তালা। মন্দিরের দালানে দরোয়ান ঘুমোয়। এত সব পাহারাদারি সত্ত্বেও না কি মোহনচাঁদজীউ চুরি হয়ে গেছে। হরকান্ত বাবুর বুড়ি মা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে। সে উঠবে না, জলও খাবে না, ঠাকুরকে ফিরে এনে দিতে হবে।

মন্দির বন্ধ করে পুরুত। চাবি দেয় বাবুর কাছে। এখন দেখা যাচ্ছে দেউড়ির তালাও খোলা, মন্দিরের তালা খোলা। যে এমন কাজ করেছে, সে চাবি দিয়েই খুলেছে।

এমন কাণ্ড ঘটলে যা হয়, পুলিশ চলে এল। তারপর রতনদের সে কি দুর্ভোগ! কেউ কাজে যেতে পাবে না, কেউ নড়বে না গ্রাম থেকে, যতক্ষণ না চোর ধরা পড়ছে, ততক্ষণ কারো নড়া চলবে না।

ভৈরব বলল, এ কেমন কথা? আমরা বাবুর ঘরে ঢুকি না, মন্দিরের সামনে যাই না। আমাদের আটকে রাখলে কেন?

—চুপ করো বুড়ো।

রতন বলল, আমাদের আটকে রাখলে আমরা জঙ্গলে যাব কেমন করে?

—আজ যাবি না।

—তবে খাব কি?

—তা কি জানি।

—নাম লিখে নিয়ে ছেড়ে দাও না বাবু।

—কে রে তুই?

—রতন হেমব্রম।

—অ। তুই ছোঁড়া তো দাঙ্গাবাজ। সনাতন বাবুর সঙ্গে মারপিট করেছিস।

—সে আমার ছাগল নিয়েছিল কেন?

—বুনো জংলী কাকে বলে আর! বামুনের ছেলে তোর ছাগল কেটে খাবে, সে তো ভাগ্যি।

—ইশ্‌শ্‌!

দারোগাটা এলাকায় নতুন এসেছে। সে সাত পাঁচ না ভেবে রতনের গালে খুব জোরে একটা চড় মারল। সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পড়ল রতন।

কালো কালো মানুষগুলোর মুখ পাথর পাথর হয়ে গেল। ভৈরব বলল, আমরা চললাম বাবু। ওঠ্ রতন। চল্। চুরি করি নি, চুরি জানি না, আটক হয়ে থাকতে পারব না।

হরকান্ত বাবুকে ভৈরব বলল, তোমার বাড়িতে এই উঠোনে আমরা কখনো ঢুকি না। অথচ সে কথাটা তুমি একবারও বললে না।

ভৈরবের পিছন পিছন সবাই বেরিয়ে গেল। হরকান্ত বাবু বললেন, এটা কি করলেন আপনি? ওরা সাদাসিধা, ভালো তো ভালো,--রাগলে পরে ক্ষ্যাপা মোষ। আমার বাবার আমলে ধানকাটা ঝগড়ায় আমাদের বাড়ি ঘিরে ফেলেছিল তীর ধনুক নিয়ে।

সবাই বলল, এ কাজটা ঠিক হয়নি। —দারোগা বেশ খানিক চুপসে গেলেন।

রতন ক্ষেপে গেল ভীষণ! মুখ গোঁজ করে ও বেরিয়ে গেল ছুটে। দাদুর ডাক শুনল না, বন্ধুদের ডাক শুনল না।

মা বলল, ঘুরে ঘুরে রাগ পড়ুক, দুঃখ ভুলুক, ঠিক আসবে।

রতন কিন্তু ঘুরে আসবে বলে ছুটে চলে যায়নি। ওর দুঃখ আর রাগ তো খুবই হয়েছে। আর হয়েছে অপমান। সে হল রতন হেমব্রম। সমবয়সী সব ছেলেদের সর্দার। তাকে বিনা দোষে দারোগা চড় মারবে কেন?

জঙ্গল পেরিয়ে, বড়াম মায়ের ছোট মন্দির পেরিয়ে, ঝাঁপালো একটা বটগাছে উঠল রতন ঝুরি বেয়ে। তারপর ডালে ডালে জড়ানো একটা জায়গা বেছে সেখানে হেলান দিয়ে বসল। এ জায়গাটা রতনের খুবই প্রিয়। এখানে বসলে ওকে কেউ দেখতে পায় না, ও সকলকে দেখতে পায়। হেলান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে ও ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙতে ও বুঝল, এখন হচ্ছে নিমনিমে বেলা। সূর্য ডোবে ডোবে। ওই তো হর্ন শোনা যাচ্ছে, এ সময়ে পালধি বাবুর "জয় জনার্দন" বাসটা যায়। তবে সাঁঝ লেগে গেল বটে? এখন নামতে হয়। একটু পরেই কোটর ছেড়ে পেঁচাগুলো উড়ে যাবে খাবারের খোঁজে। এখন নামা দরকার। এভাবে চলে এসেছে, ক্ষিদেও পেয়েছে খুব। পাখি যদি হত, তাহলে পোকামাকড় বা বটফল খেয়ে পেট ভরাত। কিন্তু গাছের নিচে কারা কথা বলছে?

এ কি, এতো সনাতন আর পুরুতের গলা।

দুজনে ফিসফিসে গলায় কি বলছে? তবে না কাকা-ভাইপোতে খুব ঝগড়া?

—তুই যে এলি, তোকে কেউ দেখেনি তো?

—না না, ভয় পেও না।

—দেখিস বাপু। সবাই জানে তোতে-আমাতে জবর শক্রতা, সেটা যেন বজায় থাকে।

—তা থাকবে। বাসনের বেলা কে জেনেছিল?

—ও! খুব ভয়ে ভয়ে আছি।

—সব রেখেছ কোথায়?

—সে শিবের অসাধ্যি জায়গায়। মেঝের মাটি খুঁড়ে বাসনকোসন, মোহনচাঁদজীউ, সব পুঁতেছি। তারপর মাটি সমান করেছি। তারপর সেখানে চালের জালা পর পর বসিয়ে রেখেছি।

—মালগুলো ব্যবস্থা করব কবে?

—গোলমালটা মরুক, সব ঠান্ডা হোক। তারপর তোর কাকিমাকে বাপের বাড়ি পৌঁছতে ময়ূরভঞ্জ যাবি।

—সেখানে লোক আছে?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। এখন যা। সাবধানে থাকবি, আর লোককে শুনিয়ে আমাকে খুব গাল পাড়বি।

—এবার আমি মোপেড কিনব, হ্যাঁ!

—কিনবি, কিনবি।

ওরা দুজনে দু দিকে চলে যায়। রতন মনে মনে বলে, দাঁড়াও, তোমাদের জব্দ করতে হচ্ছে।

খানিক বাদে রতন নামে। এবার ও বড়াম মায়ের থানে যাবে। কিন্তু তার আগে মনাই হোক, হারা হোক, একজনকে ধরে বন্ধুদের খবর দিতে হবে। মনাইদের বাড়িটা কাছে পড়বে। মনাই নিশ্চয় এখন ডোবায় জল খাওয়াচ্ছে গরুকে।

রাত আটটা না বাজতে গ্রামের সবাই দৌড়োয় বড়াম মায়ের থানে। অদ্ভুত কান্ড হয়েছে। রতন হেমব্রমকে সকাল দশটা থেকে কেউ দেখেনি। এখন দেখ সে ছেলে আর ছেলে নেই। সে মানুষই নেই মোটে। দুই হাতে ভর দিয়ে সে শুধু দুলছে আর বলছে, আমি মা বড়াম ঠাকরুণ! পুজো দে আমাকে, পুজো দিবি না?

পরেশ মাহাত বাবুর বাড়ি থেকে চেয়ে হ্যাজাক এনেছে। কাউকে কাছে যেতে দিচ্ছে না পরেশ। আরে বাপ রে! কে বলে মা জাগ্রত নয়? গ্রামের ভক্তজনেরা পুলিসের হাতে আজই নাকাল হয়েছে। তাই স্বয়ং মা এসে ভর করেছেন। পুজো দাও, ঘণ্টা বাজাও।

বড়াম মায়ের পূজারী মধু শবর। সে আসে। বলে, তোরা সরে যা সবাই। মাকে পূজা দেব, তোরা সরে যা।

রতনের মা, বাবা, ঠাকুরদা, কাউকে চিনতে পারে না রতন। শুধু বলে, পুজো দে, পুজো দে!

মনাই, হারা সব বন্ধুরা ভিড় করে দাঁড়ায়। খুব ধুমধাম করে পুজোর আয়োজন করা হয়। মধু শবর নিজের ঘর থেকে মুরগি আনে, আতপ চাল, ধূপধুনো। রাজা সাইকেল চেপে দূরের দোকান থেকে বাতাসা আনতে যায়।

রাজার ঠাকুমা হঠাৎ আছড়ে পড়ে, মা গো! আমার জামাই কবে ঘরে ফিরবে গো!

—আসবে, আসবে। তোর উঠোনে যখন ঢেঁকি নাচবে, তখন আসবে!

সবাই বলে, এই দেখ! শীতকালে তবে নিয্যস সে ফিরবে। মায়ের কথা!

পুরুত হইচই শুনে মজা দেখতে এসেছিল। রতনটা বজ্জাতি করছে কিনা জানা দরকার। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সে বলে, মা, মা, মাগো! মনে একটা ইচ্ছে করেছি। ঠাকুর চুরি, তাতে মনে বড় কষ্ট হচ্ছে। কি করে প্রায়শ্চিত্ত করি তা বলতে পার?

রতন তো এখন বড়াম মা! আর যাত্রা দেখে দেখে কথাবার্তা কইবার ধরন সে ভালোই রপ্ত করেছে। সে বলে ওঠে হত্যে দে! বালক বিগ্রহ, না খেয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছে! আঃ! আঃ! তার কান্না আমি শুনতে পাচ্ছি। নিরম্বু উপোস থেকে হত্যে দে!

—নিরম্বু উপোস!

—সে যে তোকে ছাড়া কারুক্কে জানে না রে!

এ কথায় পুরুত যেন চমকে ওঠে। তাই হবে মা! —বলে সে দৌড়ে চলে যায়।

সকাল অবধি এরকম চলে। সকালে ভিড় আরো বাড়ে। একসময় মধু শবর রতনকে স্নান করায়। লালপেড়ে কোরা কাপড় পরতে দেয়।

আর বেলার দিকে মোহনচাঁদবাড়ি থেকে একটি পালকি আসে। পালকির সঙ্গে সঙ্গে হরকান্ত বাবু, পুলিশ, আরো লোকজন। হরকান্ত বাবুর মা বলেছেন, ঠাকুরের ভর হয়েছে যখন, তখন আমাকে যেতেই হবে। আমি জানতে চাইব আমার ঠাকুর কোথায়?

দারোগা অবশ্য "এসব বুজরুকি" বলেছেন। কিন্তু হরকান্ত বলেছেন, আপনারা কতদিনে চোর ধরবেন কে জানে। আমার মা নিরম্বু উপোসী থাকলে মরে যাবেন না?

তা দারোগা হেসে বলেছেন, চলুন, মজাটা দেখে আসি। কাল তো খুব বকলেন আমাকে। আমার হাতে চড় খেল বলেই ছোঁড়ার ভর হয়নি তো?

—দূর মশাই! আমি মারদাঙ্গাকে ভয় পাই। একে এখন মানুষের মেজাজ রুক্ষ চড়া, তাতে এদের চটিয়ে বসবাস করা খুব কঠিন।

—চলুন, মজাটা দেখা যাক।

গ্রামের হর্তাকর্তা হরকান্ত মহাপাত্রের মা যখন এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বসলেন, সমবেত পাঁচখানা গ্রামের লোক চমকে গেল। কখনো বাড়ি থেকে বেরোয় না বুড়ি, আজ ছুটে এসেছে।

হরকান্তের মা হাত জোড় করে কাঁদতে লাগলেন, মা! মা গো! আমার মোহনচাঁদ কোথা গেল মা!

—কেন, আমার কাছে কেন? তোরা তো আমাকে মানিস না।

—মানি মা! এই যে ছুটে এসেছি।

—বটে! ঠাকুর চুরি গেছে তাইতে এসেছিস।

বল মা! কি করতে হবে?

—এই যে আমি ভাঙা ঘরে থাকি, আমার ভক্তজন এসে জলে ভেজে, রোদে পোড়ে...

—মা গো! পাকা মন্দির করে দেব, সামনে ছাউনি দেয়া চাতাল থাকবে।

—পুজো হলো পুজো পাঠাস?

—পাঠাব মাগো!

—তিন সত্যি কর্।

—সত্যি, সত্যি, সত্যি!

—ঠাকুর পেলে আমাকে মন তুষ্ট করে পুজো দিবি? পাঁচশো এক টাকা দিয়ে?

—দেব গো মা!

হরকান্ত বাবু এলিয়ে পড়েন। পাকা মন্দির, পাকা চাতাল, পাঁচশো এক টাকা, এ যে অনেক টাকার ধাক্কা। ওঃ, কি প্যাঁচে পড়া গেল। তবে মা যখন বলছেন, তখন দিতেই হবে। এ সম্পত্তি তো মায়ের। মাতামহ মাকে যৌতুক দিয়েছিলেন।

—ঠাকুরকে ফিরে চাস?

—হ্যাঁ মা!

হাতে একটা তীর নিয়ে রতন চলতে থাকে। ক্ষিদে, তেষ্টা, পরিশ্রমে সে খুবই অবসন্ন। এখন যে চলছে, তা শুধু ঝোঁকের মাথায়।

সঙ্গে চলে সবাই। এখন সবাই খুব উত্তেজিত, হরকান্ত আর দারোগাও। মধু শবর আগে আগে চলে নেচে নেচে। সে বলে চলে, জয় মা! জয় মা! —তার দুই চোখ বেয়ে জল ঝরতে থাকে। আহা! রতন বড় ভাগ্যবান ছেলে। বড়াম মায়ের নতুন মন্দির হবে, দালান হবে ছাউনি দেয়া। এ সবই মায়ের অসীম, অপার কৃপা।

রতন যখন চলতে চলতে পুরুতের ঘরের সামনে চলে আসে তখন সবাই হইহই করে ওঠে। পুরুত যেন ফাঁদে পড়া জন্তু। ভিড়ের চাপে সে নড়তে পারে না।

রতন এবার তীরটা তুলে ভীষণ গর্জনে পুরুতকে দেখিয়ে বলে, এই সেই পাপী। এ আর এর ভাইপো। মোহনচাঁদকে মাটি চাপা দিয়ে রেখে তার উপর চালের জালা চাপিয়ে রেখেছে। আহা, বালক দেবতা গো! সে আমাকে কেঁদে কেঁদে সব জানাল, দিদি গো! খুড়ো ভাইপো ময়ূরভঞ্জে গিয়ে আমাকে বেচে দেবে।

—না, আমি নয়! আমি নয়!

সনাতন পালাতে চেষ্টা করল। দারোগা খপ করে তার হাত চেপে ধরে মোলায়েম গলায় বললেন, আহা! পালাচ্ছেন কেন?

পুরুত মেঝেতে ধপ করে বসল আর চোখ উলটে অজ্ঞান হয়ে গেল।

মানুষ তখন উত্তেজিত। বাইরে ঠেলে এনে ফেলল চালের জালাগুলো। কোদাল আর শাবল এনে মেঝে খুঁড়ে ফেলল।

হরকান্ত বাবু আর দারোগার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। মোহনচাঁদ জীউ, তামার ঘড়া, পুজোর বাসন, পিলসুজ রে, থালা রে, সে এক কাণ্ড বটে!

হরকান্তের মা বললেন, হরকান্ত! মায়ের পুজোর টাকা এখুনি দে।

—আনছি মা!

রতন লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল, চোখ বুজল। ভৈরব হেমব্রম একবার দারোগা একবার হরকান্ত বাবু, দুজনের দিকে চাইল।

তারপর কি হল তা তো বুঝতেই পারছ। দাবোগা তো পুরুত আর সনাতনকে নিয়ে চলে গেলেন। রতনকে নেয়া হল বাড়িতে।

রতনের ভর ছেড়ে গেল। এরপর যখন টাকা এসে পৌঁছল, তখন সেই সঙ্গে চালটাও হরকান্তের মা পাঠিয়েছিলেন। ফলে কত মাংস আর কত ভাত রান্না হয়েছিল পুজোর পর। তা ভেবে দেখ।

মন্দিরের কাজে নাকি বর্ষার পরেই হাত পড়বে। আমরা যতদূব জানি, রতনের পদমর্যাদা ওগ্রামে খুবই বেড়ে গেছে। সকলেই তাকে সমীহ করে চলছে। কে জানে, আবার যদি বড়াম মা ভর করেন?

কিন্তু মায়ের ভর তো আর হবে না।

সে কথা শুধু রতন, মনাই, রাজা, এই সব ছেলেরাই জানে।

বুড়ি মায়ের মোরগ ছেলে

অনেক কাল আগেকার কথা। এক গরিব গ্রামে ছিল এক গরিব বুড়ি। বুড়ির তো সাতকুলে কেউ ছিল না। যতদিন পেরেছে, বুড়ি কাঠ কুড়িয়েছে, ঘুঁটে দিয়েছে। কিন্তু থুরথুরে বুড়ি হতে সে তো আর কাজ করতে পারে না। বড় দুঃখে বুড়ি ভিক্ষে করতে শুরু করল।

গ্রামের মানুষও তো বড়ই গরিব। তারা কেমন করে রোজ ভিক্ষে দেয় তাই বলো। একদিন গ্রামে কেউ ভিক্ষে দিতে পারল না। শুধু একটি বউ বলল, 'বুড়িমা! আমার ঘরে আজ তো কিছুই নেই। তবু বুড়ো মানুষ তুমি। এমন আগুনঢালা দুপুরে খালি হাতে ফিরে যাবে? একটা ডিম আছে, তাই নাও।'

'তাই দাও বাবা!'

ঘরে গিয়ে বুড়ি ভাবছে আজ নয় উপোস করে থাকি। কাল ডিমটা খাব। এই ভেবে সে যত্ন করে ডিমটা তুলে রেখেছে। ওমা! সকাল হতেই চিক চিক শব্দ। বুড়ি দেখে ডিম ফুটে একটা মোরগ বেরিয়েছে। এতটুকু ছানাটি। দেখলেই মায়া হয়। তখনই বুড়ি ঠিক করল যে মোরগটিকে বাঁচিয়ে রাখবে।

ভিক্ষের ক্ষুদ কুঁড়ো খাইয়ে খাইয়ে বুড়ি তো মোরগকে বড় করল। বড় হতে হতে সে মানুষ সমান উচুঁ হল। এখন আর বুড়ি তাকে খেতে দেয় না। পোকামাকড়, ক্ষেতকুড়ানো গমের দানা সে নিজেই জোগাড় করে। একদিন সে বুড়িকে বলল, 'মা, কাল আমি কাজ করতে যাব।'

বুড়ি বললে, 'ওমা! মানুষ কাজ পায় না, তুই কোথা থেকে কাজ পাবি যে করবি?'

'সে তুমি দেখো।'

পরদিনই মোরগ গিয়ে হাজির ভিন্‌গাঁয়ের মোড়লের বাড়ি। মোড়লের মাঠজোড়া ধানক্ষেত। ধান কাটার ব্যবস্থা হচ্ছে। মোরগ বলল, 'আমাকে ধান কাটতে দেবে?'

'তুমি পারবে?'

'পারি কি না পারি দেখে নিও।'

মোড়লের আর তার লোকজনেরা খানিক ধান কেটে বাড়িতে গেছে নাইতে খেতে। ফিরে এসে দেখে তাজ্জব ব্যাপার। সব ধান কেটেছে মোরগ। বয়ে নিয়ে গেছে গোলায়। তারপর উঁচু গাছের ডালে বসে আছে।

মোড়ল অবাক মানল। তারপর বলল, 'ভাই! যেদিন ধান মাড়াই হবে, সেদিন এসো। যত কাজ করেছ, তার দাম আমি ধান দিয়ে শোধ করে দেব।'

মোরগ বাড়ি ফিরে এল। বুড়ি বলল, 'কী কাজ করলি? কত পয়সা পেলি?'

'মা! ধান মাড়াইয়ের দিনে মজুরি পাব।'

ধান মাড়াইয়ের দিনে মোরগ তো গিয়ে হাজির। দেখে তার জন্যে অনেক ধান রেখেছে মোড়ল।

'কি ভাই বস্তা তো আনোনি। এত ধান তুমি নেবে কেমন করে বলো তো?'

'ভাই, আমি মাথা হেলাচ্ছি। আমার কানের ফুটোয় ধান ঢেলে দাও।'

'তোমার কানের ফুটোয় কত ধান ধরবে?'

'যতটা ধরবে ততটাই নেব।'

মোড়ল ভাবল, মোরগটা কাজ করতে পারে। কিন্তু বুদ্ধি তার নেই। এক মুঠো ধান ঢাললেই ওব কানের ফুটো ভরে যাবে। এ একরকম ভালই হল।

মোড়ল আর তার লোকেরা মোরগের কানের ফুটোয় ধান ঢালছে তো ঢালছেই। ফুটো আর বোজে না। শেষে সব কটি ধান নিয়ে মোরগ বাড়ি ফিরে এল।

বুড়ি বলল, 'বাছা! এত কাজ করলে সেদিন, আজ শুধু হাতে বাড়ি এলে?

'তাই কখনো আসি?'

মোরগ মাথা কাত করে দিতেই ধান পড়তে থাকল। ধান পড়ে পড়ে পাহাড় সমান উঁচু হল। তখন বুড়ির আনন্দ দেখে কে' আর তো ভিক্ষে করব না। আর কষ্ট পাব না। সব দুঃখই ঘুচে গেল।

মোরগ বলল, 'মা' এবারে আমাকে বিয়ে দাও। এত ধান সিদ্ধ করতে হবে। শুকোতে হবে, ভানতে হবে। তবে তো চাল হবে। এত কষ্ট তুমি একা কেন করবে? বউ আসুক, সে তোমাকে সাহায্য করবে।'

বুড়ি তো বউ খুঁজতে বেরোল। কিন্তু যাকেই এ কথা বলে, 'সে বলে, ওমা! মোরগের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব কেমন করে? মোরগ কি রোজগার করবে। না বউকে খেতে দেবে? সে কখনও হয় না বাছা।'

বুড়ি তো ফিরে এল। মোরগ বলল, 'কী গো মা! মোরগের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে কেউ রাজী নয়? দাঁড়াও, আমি নিজেই নিজের বউ জোগাড় করব।'

পরদিন সকালে মোরগ বেরিয়ে পড়ল বউয়ের খোঁজে। সে তো চলেছে হনহনিয়ে। পথে এক শেয়ালের সঙ্গে দেখা। শেয়াল বলল, ''মোরগ ভাই, যাচ্ছো কোথায়?'

'বিয়ে করতে যাচ্ছি ভাই।'

'চলো আমিও বরযাত্রী হয়ে যাই।'

'চলো না, সে তো ভাল কথা।'

'তা, বরযাত্রী হয়ে কি হেঁটে যাব?'

'কেন, আমার কানের মধ্যে ঢুকে পড়ো।'

শেয়াল তখনই কানের ফুটোয় ঢুকে গেল। মোরগ চলছে তো চলছে। এক বাঘের সঙ্গে দেখা।

'এমন ব্যস্ত হয়ে চলছ কোথায়?'

'বিয়ে করত যাচ্ছি ভাই।'

'চলো চলো। আমিও যাব। তবে বাঘ দেখে ভয়ের চোটে মেয়ে পালাবে না তো?'

'তুমি আমার কানের ফুটোয় ঢুকে পড়ো।'

একে একে বরযাত্রীর দলে জুটল এক দঙ্গল বোলতা, আগুন আর জল। মোরগ তো সামান্য মোরগ নয়। সকলকেই কানের ফুটোয় ঢুকিয়ে নিল। সামনে এক গ্রাম। সে গ্রামের রাজার মেয়েরা কেউ ধান ভাঙছে, কেউ কাঠ কাটছে, কেউ বাগান কোপাচ্ছে। তা দেখে মোরগ ভাবল, এমনি মেয়েই আমার দরকার। খাটতে পারবে, হাসিমুখে কাজ করবে, রাজাটা কেমন লোক কে জানে! দেখাই যাক।

শিমুল গাছের ডালে বসে মোরগ হেঁকে বলল, "কোঁকর কোঁকর কোঁ। বলি অ রাজামশাই ভালয় ভালয় আমার সঙ্গে একটি মেয়ের বিয়ে দেবে। না আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে? যুদ্ধ করলে তুমি হেরে যাবে তা তো নিশ্চয়। তার চেয়ে একটা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দাও।'

রাজা বললেন, 'এমন কথা? কে কোথায় আছিস? মোরগটাকে ফেলে দে তো গুড়ের জালার মধ্যে। হাবুডুবু খেয়ে মোরগটা মরে যাক।'

যেমন কথা। তেমন কাজ । রাজার লোকজনরা মোরগকে ধরে গুড়ের জালায় ফেলল। মোরগ তখনি বোলতার দঙ্গলকে বের করে দিল, 'ভাই বরযাত্রী এনেছি। চেটেপুটে গুড় খেয়ে নাও। একরত্তি ফেলে রেখো না।'

বোলতার দঙ্গলতো মহাখুশি। তারা গুড় খেয়ে শেষ করে দিল। মোরগ বেরিয়ে এসে আবার গাছের ডালে বসল। রাজা তা দেখে খুব রেগে গেলেন, 'এমন সোনারঙা খাসা গুড়। তা সব ওই মোরগটা খেয়ে ফেলল? দে ওকে ছাগলের খোঁয়াড়ে ফেলে। আমার ছাগলগুলো ওকে পা ঠুকে ঠুকে মেরে ফেলুক।'

এই বলে রাজামশাই ঘুমতে গেলেন। মোরগ তখনি শেয়ালকে বের করে আনল। ভাই বরযাত্রীকে খাওয়াতে হয়। তা এই তো তোমার খাসা বন্দোবস্ত।'

শেয়াল তো মহাখুশি। সে আগেই সবগুলো ছাগলকে মেরে ফেললে। তারপর পেট পুরে মাংস খেয়ে বনে চলে গেল। বলে গেল, 'ভাই! অনেক বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে গিয়েছি বটে। তবে এমন ভোজ কখনও খাইনি। তোমার কথা আমার খুব মনে থাকবে।'

পরদিন রাজামশাই রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। একটা সামান্য মোরগ, সে কী না বারবার তাকে জব্দ করবে? 'এবারে ওকে আমার মোষের গোহালে পুরে দাও। আমার মোষগুলো যেমন জোয়ান, তেমনি বড়। ওরা ওকে সিং দিয়ে মেরে ফেলবে।'

তোমরা ভাবছ, মোরগটাকে রাজা নিজে কেন মারতে গেলেন না। রাজা হলেন অহংকারী মানুষ। সামান্য একটা মোরগকে মারলে তার তো মানহানি হবে। লড়াই

হয় সমানে সমানে। রাজা নয়, বীর যোদ্ধা নয়, সামান্য একটা মোরগকে মেরে তিনি কী মান খোয়াবেন?

মোষের গোহালে ঢুকেই মোরগ বাঘকে বের করে দিল, 'ভাই। কত খেতে চাও খাও। মোষের মাংস কত ভালো তা তো তুমি ভালই জানো।'

বাঘকে পায় কে? সব কয়টা মোষের ঘাড় মটকে, সবচেয়ে মোটা মোষটার মাংস পেটপুরে খেয়ে, বাঘ বলল, 'ভাই! তোমার বিয়ের ভোজের কথা চিরকাল মনে রাখব। বিয়ে না হতেই এমন ভোজ খাওয়ানো। এমন কথা শোনাই যায় না।'

পরদিন সকালে রাজা রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন। বললেন, 'ওরে হতভাগা! তোকে আমি নিজেই মারব এবারে।'

মোরগ উড়ে গিয়ে গাছের ডালে বসল। আগুনকে বের করে এনে বলল, 'ভাই! এবারে তুমি রাজবাড়িটা খেতে শুরু করো।'

রাজবাড়ি জ্বলে উঠতে রাজা তো ভয়ে কাঠ হয়ে গেলেন। এতো সামান্য মোরগ নয়। আগুন যদি জোরে জ্বলে তাহলে সব তো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এবারে তাঁর সুবুদ্ধি হল। হাত জোড় করে তিনি বলতে থাকলেন, 'ও মোরগ, আগে বুঝতে পারিনি তুমি কত শক্তিশালী। তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব, সে তো আমার সৌভাগ্য। এখন দয়া করে আগুন নেভাও। সব যদি জ্বলে যায়, তাহলে বিয়ে দেব কেমন করে?'

মোরগ তো এই কথাই শুনতে চাইছিল। কান থেকে জল বের করে সে আগুন নিভিয়ে দিল। এবারে সে মহানন্দে গাছ থেকে নেমে এল।

তারপর রাজার এক মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হল। রাজা তো ভারে ভারে চাল, গম, ভুট্টা, গুড়, লবণ, তেল এমন কত কিছু যৌতুক দিলেন। বিয়ের সভায় বাঘ, শেয়াল, আগুন, জল আর বোলতাও এল।

বাঘ বলল, 'জীবনে তোমার বাড়ির কোনও মানুষকে বাঘে খাবে না।'

শেয়াল বলল, 'তোমার বাড়ির কোনও ছাগল ভেড়া শেয়ালের পেটে যাবে না।'

বোলতা বলল, 'তোমার বাড়িতে কখনও বোলতারও পাখার গুঞ্জন শুনতে পাবে না।'

আগুন বলল, 'তোমার ঘরে কখনও আগুন লাগবে না।' আর জল বলল, 'সারা দেশ বানের জলে ভেসে যাক। তোমার ঘর ঠিক থাকবে।'

মোরগ যখন বৌ আর বিয়ের যৌতুক নিয়ে মায়ের কাছে পৌঁছল তখন তার মায়ের আনন্দ কতখানি হল সে কী বলা যায়?

তার গরিব গ্রামের সকলকে নেমন্তন্ন করে ভাত, ডাল, পিঠে আর গুড় খাওয়াল। এরাই তো এতদিন ভিক্ষে দিয়ে ওকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। গ্রামের সবাই বলল, 'বুড়ি মা! এতদিন অনেক দুঃখ করেছ। এবারে তুমি সুখ করো।'

সাত ভূতুড়ে

ফল্গু যে বড় হতে না হতে অমন গল্পবাজ হবে, তা আগে কেন বুঝিনি এখন তাই ভাবি। সব সময়ে ওর জীবনে তাজ্জব সব ঘটনা ঘটত আর আমাদের গল্প বলত। সে সব কি সত্যি, তাও আর জানা যাবে না। ওর ঠিকানাটা তো দিয়ে যায়নি, যে গিয়ে জিগ্যেস করব।

ওষুধ কোম্পানির কাজ নিয়ে যখন পাটনা গেল, তখন তো ওকে সমানে ঘুরতে হত। তখন নাকি অবধলাল বলে একটা লোককে নিয়ে সে ঘুরত। অবধলাল সঙ্গে থাকলে গাঁজা খাবে, পূর্ণিয়া বললে মতিহারির টিকিট করবে, নোট হাতে পেলে খুচরো ফেরত দেবে না, তবু ওকে সঙ্গে রাখা চাই।

কেন রাখা চাই ?

আহা! বুঝলে না! কোন বাড়িটায় বিদেহীদের বাস, কোন রাস্তায় সন্ধের পর ডাইনি ঘোরে, এ সব বিষয়ে ওর একটা ব্যাপার আছে।

তাতে তোর কি?

তুমি কি বুঝবে? কত জায়গা ঘুরতে হয়। কখন কোথায় গিয়ে ফেঁসে যাব, এই তো সেবার...

কি হয়েছিল?

কাজে নয়। কাজ সেরে বেড়াতেই গিয়েছিল ফল্গু। ডালটনগঞ্জের কাছাকাছি কোন্ এক জায়গায় পেয়ে গেল জঙ্গল বাংলা। চৌকিদার নাকি বলে দিল, জল টল তুলে দিয়ে, খানা বানিয়ে দিয়ে ও চলে যাবে। রাতে ও থাকবেই না।

ঘর দুটো। দুটো ঘরই ফাঁকা। লোক নেই। দু কামরাতেই নেয়ারের খাট। চেয়ার টেবিল আছে। অবধলাল ফল্গুকে কিছুতে ভাল ঘরটায় থাকতে দিল না। ছোট ঘরটায় দুজনে থাকব।

কেন রে?

অবধলাল শুধু বলে, ও ঘরে থাকবেন কি দাদা, পরিষ্কার দেখলাম ঘরে স্বামী স্ত্রী বসে আছে।

ফল্গু তো কিছুই দেখেনি। কিন্তু বাইরে তখন বিকেল শেষ হচ্ছে। হেমন্তের বিকেল। বাতাসটা ঠান্ডা হচ্ছে। চারিদিকে জনমানব নেই। এ সময়ে অবধলালের

কথা অমান্য করতে গেলে অবধলাল তুলকালাম কাণ্ড বাধাবে।

অবধলাল চোখ মটকে বলল, ব্যাপারটা বুঝলেন না? ওই যে চৌকিদার, ও কেন রাতে থাকে না? ও ঘরে কারা বসে আছে, তা তো ও জানে। কেন বসে আছে, সেটাই দেখতে হবে।

ফল্গু তো দেখেছে কামরা জনশূন্য, জানলা বন্ধ, অবধলাল কি তা মানে? ও চোখ মটকে বলল, রাতে খেয়ে দেয়ে আপনি ঘুমোন, আমি দেখি ওরা কি করে। ওঃ মেয়েটা ছেলেমানুষ। ভয়ও পেয়েছে খুব, লোকটা ওর দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

ফল্গু ধমকে বলল, আমি ভিতু মানুষ। আমি ওর মধ্যে নেই। তুমি দরজা বন্ধ করে দাও মাঝখানের।

দাদা! অবধলাল থাকতে আপনার কাছেও কেউ আসবে না, কোনো অনিষ্টও করবে না। আমিও ওদের চিনতে পারি, ওরাও আমাকে চিনতে পারে।

এ সব চেনাচিনির কথা সন্ধের মুখে কি ভালো লাগে? চৌকিদারটা এ সময়ে তেল ভরা দুটো লণ্ঠন জ্বেলে রেখে গেল। তারপর ঢেঁড়স দিয়ে ডিমের ডালনা, রুটি আর জলের কলসী রেখে গেল ঘরে। বলে গেল, সাবধানে থাকবেন বাবু, রাতে বাইরে বেরোবেন না।

ফল্গুকে আর দুবার বলতে হল না। ঢেঁড়স দিয়ে ডিমের ডালনা কে কবে খেয়েছে বলো? তা ফল্গুবাবুর কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে ও ছাপরায় অড়র ডাল আর পিঁপড়ের ডিমের মোগলাই কারি (অবধলালের রান্না)। গৈবীপুরে আলু আর আটার গোলা সেদ্ধ (ওর রান্না)। মজঃফরপুরে কামরাঙা দিয়ে পাবদা মাছের ঝোল (অবধ লালের রান্না) খেয়েছে। এ সব কথার সত্যি আর মিথ্যেও জানা যাবে না। কেন না অবধলালও ফল্গুর উধাও হবার সময় থেকেই উধাও।

সত্যি বলতে কি, অবধলালকে আমরা চর্মচক্ষে আজও দেখিনি। ও আরেকটা ফল্গুবাবুকে খুঁজছে। যাকে পেলে তার সঙ্গে জুটে যাবে।

রাতে তো ফল্গু খুব ঘুমোল। সকালে উঠে দেখে অবধলাল চৌকিদারকে খুব চোটপাট করছে।

ব্যাপার তো কিছুই নয়। লোকটা ওই আওরতকে খুন করেছিল। নিজেও খুদকুশি (আত্মহত্যা) করে। তা তুমি এ কামরায় কোনো বন্দোবস্ত করোনি কেন?

কি করব বাবু।

অবধলাল থাকতে ভাবনা?

অবধলাল তার ঝোলা থেকে কি একটা জড়িবুটি বের করল। ঘরের দেয়াল ফুটো করে পুঁতে দিল। ওগুলো নাকি ভূত তাড়াবার মোক্ষম ওষুধ।

ফল্গুরা যখন ট্যুর সেরে ফিরছে, সেই চৌকিদার তো অবধলালকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম।

না না সে দুটো ভূত আর আসছে না। তবুও ভূতুড়ে ঘর শব্দটা চৌকিদার চালু রেখেছে।

কেন?

চৌকিদার খৈনি মুখে দিয়ে বলল, চৌকিদারিতে আর কি মিলে বাবু! এখন আমরা মাঝে মাঝে ও ঘরে একটু জুয়া সাট্টা খেলি। ধরম পথে পয়সাও কামাই হয় দুটো।

পুলিস জানে?

পুলিসের সঙ্গেই তো খেলি বাবু। এ আপনারা খুব বড় কাজ করলেন। পাবলিকের ডাক বাংলা। এখন পাবলিকের কাজে লাগছে। সবাই অবধলালজীকে খুব আশীর্বাদ করছে। তবে কি বাবু! কামরায় তো ঢুকতে পারে না। রোজ ওই তেঁতুল গাছে বসে দুজনে খুব ঝগড়া করে।

তা করুক না। ও বেচারীরা যায় কোথায়। ভূত বলুন, পিশাচ বলুন, ওদের তো থাকার জায়গা চাই। আমার গ্রামেই তো ডাক্তার বাবুর বউ যখন ভূত হয়ে গেল, কেবল সাবান চুরাত, কুয়াতলায় চান করত, আমিই তো তার ব্যবস্থা করে দিলাম। এখন সে পুকুরপাড়ে বেল গাছে থাকে। রোজ একটা সাবান মেখে স্নান করে।

ফল্গু বলল তবে যে শুনি গয়াতে গেলে...

অবধলাল ফচফচ করে হাসল। বলল, গয়াজীতে গেলেও বাবু! ভূতের মধ্যে যারা গিটগিটা আর পিচপিচা, তাদের মুক্তি হয় না।

সে আবার কি?

সে আপনি বুঝবেন না। সবচেয়ে পাজি হল কিরকিচা ভূত। গ্রামের ঝগড়াটি মেয়েছেলেরা কিরকিচা ভূত হয়। তবে হ্যাঁ, বহুত কাজও করে।

কি রকম?

এই আমার মা আর পিসিকে দেখুন না। গ্রামে ঝগড়া লাগলে সবাই ওদের নিয়ে যেত। ওদের মতো গাল দিতে আর ঝগড়া করতে কেউ পারত না। এই যে দুজনে মরে গেল মেলায় গিয়ে কলেরা হয়ে, এখনো কত কাজ করে। বাপ রে বাপ!

কি করে!

সন্ধে হলেই আসবে, ঘরের চালে বসবে, আর বাবাকে, আমার সৎমাকে বাড়ির সকলকে গাল দেবে। কে ঠিক মত কাজ করেনি। বাবা মাঠে গিয়ে কাজ না করে ঘুমোচ্ছিল কেন, বউরা কেন ঝগড়া করেছে, বাসনে কেন এঁটো থাকবে, কাপড়ালত্তা কেন সাফ হয় না—এই নিয়ে এক ঘন্টা গাল দেবে, তারপর চলে যাবে।

এ তো সর্বনেশে কথা!

অবধলাল ক্ষমার হাসি হাসল। বলল বাবুজী! কিরকিচা ভূত না থাকলে কোনো গ্রামে শান্তি থাকে না। মেয়েছেলেরা সবচেয়ে বেশি ঝগড়া করে। কিরকিচারা গিয়ে ডবল তিন ডবল গালি দিয়ে সবাইকে ঠান্ডা রাখে। বাপ রে! আমার বাবা বলছিল

গয়াজীতে যাব। তাতে মা আর পিসিমা গয়াজী গিয়ে এমন গাল দিতে থাকল যে পাণ্ডাজী বাবাকে লাঠি দিয়ে পিটাল। তুমি কিরকিচার পিণ্ড দিতে এসেছ?

চৌকিদারও বলল, হাঁ হাঁ, কিরকিচা প্রতি গ্রামে থাকা খুব দরকার।

ফল্গুর মুখে গল্প শুনে আমাদের খুব ইচ্ছে হয়েছিল একটা কিরকিচা ধরে আনি। মায়ের পুষ্যি যত পাড়ার বাজখেঁয়ে মেয়েছেলে, তারা কি কম ঝগড়া করত?

সাতভূতুড়ে বাড়িতে অবশ্য ও ভূতের বাড়ি জেনে যায়নি। দুমকা ছাড়িয়ে অনেক দূরে কোথায় রাজবাড়ি পোড়ো হয়ে আছে, তাই দেখতে গিয়েছিল।

বাড়িটা দেখিয়ে দিয়েই দুমকার বন্ধু কমলবাবু বলল, আজ চোখে দেখুন, তারপরে সকালে এসে ভাল করে দেখবেন ঘুরে ঘুরে।

সাপের ভয়?

শীতকালে সাপের ভয়?

বদলোকের আড্ডা আছে?

না মশাই। আসলে...

অবধলাল তো মহা খুশি। কি ব্যাপার বাবু? ভূত আছে নাকি? গিটগিটা না পিচপিচা?

সে আবার কি?

বাবুজী জ্যান্ত মানুষের জাত আছে, ভূতের জাত নেই? গিটগিটা, পিচপিচা, কিরকিচা, কত জাতের ভূত আছে তা জানেন?

না বাপু, আমি জানতেও চাই না।

কি আছে ওখানে?

সবাই বলে সাতটা ডাকাত এ তল্লাটে খুব তরাস তুলেছিল। তা রাজবাড়ির একটা কামরায় ডাকাতির মাল ভাগ করতে গিয়ে মারামারি করে সাতটাই মরে। তারাই ও ঘরে দাপাদাপি করে।

মনে হচ্ছে গিটগিটা।

ডাকাতির মালের লোভে যেই গেছে সেই মারা পড়েছে। কেউ যায় না।

অবধলাল বলল, তা হলে তো থেকে যেতে হয়। আমার নাম অবধলাল। আমি সাতটাকেই তাড়াব।

কমলবাবু বললেন, আমি ওর মধ্যে নেই।

গ্রামের লোকরা খুশি। বাপরে, রাজবাড়ির বাগান তো এখন জঙ্গল। ভয়ের চোটে কেউ কুলটা আমটা আনতে যাই না। ভূতগুলো তাড়াও বাবু। আমাদের ঘরে আজ থাকো। খাও দাও আরাম করো।

কমলবাবুও থেকে গেলেন। ও বাড়িতে উনি ঢুকবেন না। কিন্তু তামাশা তো দূর থেকেও দেখা যায়।

মাহাতোদের গ্রাম। ফলে মুরগি, ভাত, জবর খাওয়া হল।

পরদিন অবধলাল আর ফল্গু বাড়িতে ঢুকল। একেবারে পোড়ো বাড়ি। দোতলা দিয়ে বটগাছ উঠেছে বড় বড়।

একতলায় দুটো ঘর তবু থাকার মতো। অবধলাল বড় ঘরটা দেখিয়ে বলল, ওখানেই বেটাদের আড্ডা।

সে ঘর যেমন ধুলোপড়া, তেমনি বড়। কোণের দিকে একটা কাঠের সিন্দুক।

আরে আরে দেখুন!

কি দেখব?

জানালা দিয়ে দেখুন।

জানালার নিচে বেশ বড় একটা খাত। পাশে একটা গাছ।

ওর মধ্যে কিছু আছে বোধ হয়।

পাশের ঘরটা সাফসুৎরো করল অবধলাল। গ্রাম থেকে চাটাই আনল, বালিশ, তেলভরা লণ্ঠন, কুঁজো বোঝাই জল। সন্ধের মুখে বলল, আমি তো চললাম। আপনার ডর লাগে তো আপনি থেকে যান গ্রামে।

ফল্গু বলল, মোটেই না, আমিও যাব।

লোকগুলোর লাশ কোথায় গেল?

মাহাতোরা বলল, সে তো সে সময়েই পুলিশ নিয়ে যায়। পুলিশ ডাকাতির মালও খোঁজে, পায়নি।

অবধলাল আর ফল্গু তো চলে এল। ফল্গু বলল, অবধলাল, আমি শুয়ে পড়েছি। তুমি ভূত তাড়িয়ে তবে আমাকে ডাকবে।

আগে দেখি বেটারা কেমন জাতের। আর একটু কাজ সেরে আসি।

কি কাজ?

খাতের পাশে গাছটা দেখলেন না?

দেখলাম তো!

বেচারি! ওখানে একটা কিরকিচা আছে। বেচারি আছে বলেই কেউ জানে না। একটু খইনি একটু বিড়ির জন্যে বড় কষ্ট পাচ্ছে।

এখানেও কিরকিচা?

বাবুজী, কিরকিচা কোথায় নেই?

ও কেন ভূতগুলোকে তাড়াচ্ছে না?

কিরকিচা বলে ওর আত্মসম্মান নেই? ওকে কেউ বলেছে?

তুমি কি ওকেই ডাকবে?

না না, সে দেখা যাবে। একটু খইনি, দুটো বিড়ি, একটা দেশলাই তো রেখে আসি। বাবুজী, ভূত তাড়াবার জড়িবুটিও তো আমাকে একটা কিরকিচাই দিয়েছিল।

এমনি সময়েই প্যাঁচা ডাকল, আর ফল্গু একটা ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমিয়েও পড়ল।

মাঝরাতে সে কি গণ্ডগোল! অন্য কারো গলা শোনা যাচ্ছে না, অবধলাল চেঁচাচ্ছে।

তাই বলো! কিরকিচার ভয়ে এখানে ঢুকে বসে আছ? কেন, পুলিশ যখন লাশ নিয়ে গেল, তখন সঙ্গে গেলে না কেন?

একটা গলা মিউমিউ করে বলল, গিটগিটা কোথাও যেতে পারে?

সর্দার কে?

আমিই তো ছিলাম।

ঘরে কেন, বাইরে জঙ্গল আছে না?

অহি কিরকিচা!

ওর ভয়ে মরে গেলে?

হাঁ বাবু। আগে তো মারামারি করে মরলাম। তারপর পালাতে যাব, কিরকিচা যা গাল দিল আবার মরে গেলাম। এখন তো পালাতে পারলে বাঁচি। কিন্তু দু'বার মরলে কেমন করে পালাব?

হায় হায়, এ তো বহোত আফশোস। ডবল ডেথ হয়ে গেল। তোমরা তো গিটগিটাও নেই, পিচপিচাও নেই। বিলবিলা হয়ে গেছ, হায় হায়!

আমাদের ছেড়ে দাও ভৈয়া।

ছাড়ব তো, যাবে কোথায়!

তা ফল্গু বলল, অবধলাল বলেছে যে কখনো কোনো কিরকিচা নিজের গ্রাম থেকে নড়ে না।

যদি বেড়াতে ও আসে!

না না সে অসম্ভব।

ফল্গুকে বলতাম, অবধলালের কথা বিশ্বাস করিস?

ও বলত, বিশ্বাস করব না? জঙ্গলে যারা কাজ করে তারা বাঘের চেয়ে ভালুককে ডরায়। বাঘ মানুষ দেখলে সরে যায়। ভালুক তেড়ে এসে আক্রমণ করে। সেবার হাজারিবাগে...

একটা গল্পের সুতো ধরিয়ে দিয়েই, এমন হতভাগা বলত, সকাল আটটা বসে গল্প করার সময় নয়। থলিটা কোথায়, বাজারে চলো।

আমাকে বাজারে টেনে নিয়ে যাবে, যা দেখবে সব কিনবে আর বাড়ি ঢুকে বলবে, ছ্যা ছ্যা, বুড়ো হয়েছে তো! যা দেখে সব কেনা চাই।

গল্প বলার সময় সন্ধেবেলা। বাগানের চাতালে বসে। লোডশেডিং হলে আরো জমত।

হাজারিবাগের জঙ্গলে ঘোরার আসল মজা বিট অফিসারের সঙ্গে পায়ে হাঁটো, তাঁবুতে থাকো, মাঝে মাঝেই দেখবে গ্রামের মেয়ে পুরুষ কাজ করছে।

তেমনি ঘুরতে ঘুরতে ওরা নাকি ভালুকের সামনে পড়ে। ভালুক দেখে ওরা তো দৌড় লাগিয়েছে। ভালুকও তেড়ে আসছে। তখন অবধলাল চেঁচিয়ে বলছে, আরে জঙ্গলে তো কত আওরতও মারা পড়েছে। একটাও কিরকিচা নেই? আরে কিরকিচা, কোথায় আছ?

সঙ্গে সঙ্গে গাছপালায় ঝড়তুফান তুলে ভালুকের দুপাশে দুই কিরকিচা এমন চেঁচাতে শুরু করল যে ভালুক ঘাবড়ে গিয়ে পালাল।

এটা সত্যি?

ইচ্ছে হলেই বিট অফিসারকে জিগ্যেস করে জেনে আসতে পারো।

তা, অবধলাল সঙ্গে থাকত বলে ফল্গুরও ঝোঁক চেপেছিল ভূতের বাড়ি হলেই ওকে নিয়ে সেখানে থাকবে।

বাইরে থেকে কে খনখন করে হাসল। ঠিক যেন হায়েনা হাসল।

যৈসে ভি হো, ভাগ যায়েগা।

কে যেন খনখনে গলায় বলল, সত্যি কথাটা বল্‌না বাপু। আমি তোদের কেন পুরে রেখেছি?

ফিঁচফিঁচ করে কেঁদে একজন বলল, আরে লখিয়াকে মা! তোর তামাকুর ডিব্বা আমরা নিইনি।

গিটগিটার দোহাই?

গিটগিটার দোহাই।

বিলবিলার দোহাই?

বিলবিলার দোহাই।

আমার কাছে মাপ চাইবি?

চাইলাম, চাইলাম।

যা তবে, ছেড়ে দিলাম।

অবধলাল এ সময়ে কি যে করল কে জানে। ঘরে ভীষণ একটা ঝুটোপাটি পড়ে গেল।

সকালে ফল্গুকে তো অবধলাল ডেকে তুলল। ফল্গু বলল, কাল অত চেঁচামেচি সব শুনেছি।

ছাই শুনেছেন। সিদ্ধির সরবত খেয়ে ঘুম মারলেন। কি শুনবেন?

চেঁচামেচি হয়নি?

সব মনে মনে।

ওরা চলে গেছে?

দেখুন না।

ধুলোর ওপর সাত জোড়া ছোট ছোট পায়ের ছাপ। সব বাইরের দিকে বেরিয়ে গেছে।

ছোট ছোট ভূত?

না বাবু। বেচারাদের মতো অভাগা হয় না। মরল তো গিটগিটা হয়েছিল। গিটগিটারা বড় বড় ভূত। কিরকিচার ভয়ে আবার মরে গেল। এখন তো ওরা বিলবিলা। বেঁটে বেঁটে ভূত। কি দুঃখ!

দুঃখ কেন?

আরে বিলবিলা দেখলে গিটগিটা, পিচপিচা, কিরকিচা, সবাই পিটাবে। বিলবিলা হওয়া তো ডর-পোকের লক্ষণ। এক দফে মরলে, ঠিক আছে। আবার ডবল দফে মরবে? ওরা সমাজের কলঙ্ক।

এখন ওরা কি করবে?

পালাবে আর কি করবে।

আসার আগে অবধলাল খাতে নেমে অনেক খুঁজেও কিছু পেল না। মাহাতোদের বলে, ওহি গাছের নিচে পিতলের ডিব্বায় তামাক পাতা, চুন রেখে দেবে। ভূত তো তাড়িয়ে দিয়েছি। গাছে যে কিরকিচা আছে, তাকে চটাবে না।

ডাকাতির মাল?

নির্ভয়ে খোঁজ গে।

গ্রামের লোক তো পায়ের ছাপ দেখতে গেল। গিটগিটাদের বিলবিলা হবার কথাও সব শুনল। ওদের কি আনন্দ! মাহাতোরা, সাঁওতালরা, তেলিরা, সবাই যাবে। দরজা, জানালার কপাট নেবে, ইট নেবে। বাগান থেকে যথেষ্ট কুল, আমলকী, আম নেবে। গাছ কেটে জ্বালানি করবে। ওই মস্ত পুকুরে স্নান করবে। ঘাসবনে গরু চরাবে।

প্রচুর মুরগি কাটা হল, খুব খাওয়া দাওয়া।

কমল বাবু সবই খেলেন, কিন্তু বললেন, ভূতের ডবল ডেথ, ধুলোতে পায়ের ছাপ, দূর মশাই, সব ধাপ্পা।

অবধলাল বলল, ও সব বলবেন না বাবুজী, তা হলে কিরকিচাটা আপনার পেছনে লেগে যাবে। আপনাকে গিরগিটা বানিয়ে ছেড়ে দেবে। আপনি যা ভিতু হয়তো আবারও মরে যাবেন। তখন বিলবিলা হয়ে থাকতে হবে।

বীরাঙ্গনা

হলিউডের অনেক ছবিতে আমরা দেখেছি আমেরিকার আদি অধিবাসীদের বর্বর ও হিংস্র 'রেড ইন্ডিয়ান' রূপে দেখানো হয়। আজ ওঁদের আমেরিকান ইন্ডিয়ান বলা হয়। এঁরা কত সভ্য, এঁদের শিল্প, সাহিত্য, লোককথা, সংগীত যে কত চমৎকার তা বলা যায় না। আমেরিকায় এক সময়ে, নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত ওঁরাই ছিলেন। তারপর শ্বেতাঙ্গরা বারবার এসে ওঁদের জমি-বন-পাহাড় সবই নিয়ে নেয়। নিষ্ঠুর আক্রমণে মেরে ফেলে নরনারী শিশুকে। কিছু আমেরিকান ইন্ডিয়ানও দেশে আছেন। রিজার্ভেশন বা সংরক্ষিত এলাকায় বন্দী হয়েও আছেন, আবার তার বাইরেও আছেন।

ওঁদের রূপকথা যেমন সুন্দর, তেমনি শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে যুদ্ধের বীর কাহিনীগুলিও ওঁরা মুখে বলেন। ওঁদের মেয়েরাও খুব সাহসী ছিলেন, যুদ্ধ করতেন। যুদ্ধের ইতিহাস থেকে এমনি এক সত্য কাহিনী তোমাদের শোনাই। এটি চেইয়েন বা শ্যয়েন গোষ্ঠীর একজন যেমন বলেছেন, তেমনি অনুবাদ করে দিলাম। আমি যতটুকু দেখেছি, পড়েছি, জেনেছি, তাতে মনে হয়েছে আমাদের আদিবাসীদের সঙ্গে ওঁদের খুব মিল আছে।

'১৮৭৬ সালের গ্রীষ্মে সাদা সৈন্যদের সঙ্গে ইন্ডিয়ানদের দুটো বিশাল যুদ্ধ হয় মণ্টানার সমভূমিতে। প্রথম যুদ্ধের নাম রোজবাডের যুদ্ধ। দ্বিতীয় যুদ্ধ এক সপ্তাহ বাদে হয়। এর নাম লিট্‌ল বিগ্‌হর্নের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে জেনারেল কাস্টার পরাজিত ও নিহত হন। চেইয়েনরা, মানে আমরা প্রথম যুদ্ধকে বলি 'যে যুদ্ধে মেয়েটি তার ভাইকে বাঁচিয়েছিল।' কেন বলি, তা শোন।

শ'খানেক বছর আগে, সাদা মানুষেরা চেয়েছিল সব ইন্ডিয়ানদের রিজার্ভেশনে কয়েদখানায় রাখতে। চেয়েছিল আমরা ইন্ডিয়ান হতে ভুলে যাই। স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানো, বন্য মহিষ শিকার করা এসব ছেড়ে দিই। কিছু মানুষ বাধ্য হয়ে তা মেনে নিল, রিজার্ভেশনে কাঁটা তারের বেড়ার জীবনে চলে গেল। তবে সবাই অত সহজে মেনে নেয়নি।

যারা সাদা মানুষদের মতো থাকবে বলে রিজার্ভেশনে গেল, সাদা মানুষরা তাদের বলত 'বন্ধু'। যারা যায়নি, তাদের বলত 'শত্রু'। অথচ তারা শত্রুভাবাপন্ন মোটেও ছিল না। তারা চেয়েছিল ইন্ডিয়ানরা যেমন ভাবে থাকে, যে জীবন অতি সুন্দর, সে ভাবে থাকতে। কিন্তু সাদা সৈন্যরা তাদের পেছনে লেগে থাকত। তারা যুদ্ধ

করতে চাইত না। শান্তিতে স্বাধীনভাবে থাকতে চাইত। কিন্তু সাদা সৈন্যরা ঠিক করল, সব জায়গায় হানা দেবে, স্বাধীন ইন্ডিয়ানদের গ্রেপ্তার করবে, যারা বাধা দেবে তাদের মেরে ফেলবে আর বাকিদের বন্দী করে নিয়ে যাবে।

ততদিনে আমাদের দখল থেকে সব জমি চলে গেছে। সামান্য কিছু আঁকড়ে আমরা পড়ে আছি। সাদা সৈন্য তিন ফৌজ এসে ঢুকল সেখানে। ক্রুক, টেরি আর কাস্টার, তিন জেনারেল সেনাপতি। ক্রুকের সঙ্গে দু'হাজার সৈন্য। তা ছাড়া ছিল কামান, ওদের 'বন্ধু' কিছু ইন্ডিয়ান পথ দেখাচ্ছিল। রোজবাডে ক্রুকের মুখোমুখি হল সাইয়ুক্স আর চেইয়েন যোদ্ধারা।

যুদ্ধে নামার আগে ইন্ডিয়ানরা 'পবিত্র সূর্য নৃত্য' নেচেছে। মহান সাইয়ুক্স দলপতি পুণ্যাত্মা সিটিং বুল এক দিব্য জ্ঞানে জেনেছেন সাদা সৈন্যরা হেরে যাবে। যোদ্ধাদের মনে তখন উৎসাহের জোয়ার। বিখ্যাত যোদ্ধা জাতিগুলির মানুষরা প্রতিজ্ঞা করেছে যে মৃত্যুর গান গাইতে গাইতে তারা লড়বে যতক্ষণ জীবন থাকে। মরবে নির্ভয়ে। তারা মুখে মেখেছে যুদ্ধের রং। সবচেয়ে ভালো পোশাক পরেছে। যদি মরেও যায়, সাজসজ্জা দেখে শত্রুরা বলবে, 'এ কোন মহান দলপতি ছিল নিশ্চয়। দেখ, রাজার মতো শুয়ে আছে।'

বৃদ্ধ দলপতিরা তরুণদের শেখালেন যুদ্ধকালে কি কর্তব্য। আর মন্ত্র পড়ে যাঁরা ওষুধ তৈরি করেন, তাঁরা যোদ্ধাদের রক্ষাকারী কত কি বানালেন। কাঠবিড়ালির ভস্ম মাখালেন তাদের চুলে। তাদের ঘোড়ার গায়ে রং দিয়ে বজ্রশিখার মতো নকশা আঁকলেন। এ গুলো করলে সাদা সৈন্যরা ওদের দেখতে পাবে না। গুলি ওদের গায়ে বিঁধবে না। ব্রেভ উল্‌ফের কাছে ছিল সবচেয়ে চমৎকার রক্ষাকবচ। একটি মরা বাজ পাখির, শরীরে অনেক কিছু পুরে, তাঁর মাথার পেছনে লাগানো। দেখতে সেটা সত্যি বাজপাখির মত। তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে যুদ্ধে যাবার সময়ে তাঁর সেই হুইস্‌ল্ বাজাতেন যেটা ঈগল পাখির হাড়ে তৈরি। যুদ্ধ শুরু হলে বাজপাখিটা জ্যান্ত হয়ে উঠত, ডাকত।

চেইয়েনরা ছাড়াও অনেক তেজী গোষ্ঠীর মানুষেরা ছিল সে যুদ্ধে। যেমন হাংপাপা, মিনি কন্‌জো, ওগলালা বার্নড থাইস, টু কেট্‌লস। অনেক সাহসী দলপতি ও যোদ্ধারা এসেছিলেন। যেমন টু মন্‌স, হোয়াইট বুল ডার্টি মোকাসিন্‌স, লিট্‌ল হক, ইয়েলো ঈগল্ আর লেম হোয়াইট ম্যান। সাইয়ুক্সদের থেকে এসেছিলেন বিখ্যাত ক্রেজি হর্স, আর পুণ্যাত্মা সিটিং বুল। শরীরের মাংস কেটে সূর্য নৃত্যের সময়ে সূর্যকে অর্ঘ্য দেবার ফলে তখনো তিনি দুর্বল। দুর্ধর্ষ রেইন-ইন-দ্য-ফেসও এসেছিলেন। অগণন যোদ্ধা! আর কি মহান সে দৃশ্য, যে যার ঘোড়ার পিঠে!

যাঁরা অনেক যুদ্ধ করে মাথায় শিরস্ত্রাণ পরার অধিকার পেয়েছেন, তাঁরা গান

গাইতে গাইতে মাথা থেকে খুলে তা তুলে ধরছিলেন। তিনবার গান থামালেন। শিরস্ত্রাণ তুলে ধরলেন। চতুর্থ বার সেটি পরে নিলেন। মাথার ভূষণ থেকে পালক ও রঙিন কাপড়ের লম্বা রিবন মাটিতে লুটাল। সে দৃশ্য যারা দেখেছে তারা জানে সে কি চমৎকার।

ওগলাল ইন্ডিয়ান দলপতি ক্রেজি হর্স তাঁর বিখ্যাত যুদ্ধঘোষণা জানালেন, 'মরার পক্ষে বড় চমৎকার দিন, চমৎকার লড়াইয়ের দিনও বটে। কাপুরুষরা পিছু হটো। বীরেরা এগিয়ে এসো, আমার সঙ্গে চলো।'

লড়াই তো শুরু হল। কি সাহস না দেখাল ইন্ডিয়ানরা, কতবার যে হারাল শত্রুকে। যুদ্ধ তো ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। অনেক জাতের ইন্ডিয়ান লড়ছিল, কিন্তু আসলে এটা চেইয়েনদের লড়াই। এ দিন তাদের দিন। চেইয়েনদের মধ্যে দেখা গেল এক সাহসী তরুণীকে। গর্বভরে ঘোড়া চালাচ্ছে সে স্বামীর পাশাপাশি। স্বামীর নাম ব্ল্যাক কিয়োট আর সেই বীরাঙ্গনার নাম বাফেলো-কাফ-রোড-ওম্যান। মেয়েটির ভাইও যুদ্ধ করছিল। ভাই কোথায় মেয়েটি দেখতে চেষ্টা করছে। হঠাৎ দেখে যে ভাই মাটিতে দাঁড়িয়ে লড়ছে, তার ঘোড়া মরে গেছে, আর সাদা সৈন্যরা রাইফেল তুলেছে ভাইকে মারবে বলে।

মেয়েটি তীব্র তীক্ষ্ম চীৎকারে যুদ্ধের আহ্বান জানাল। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল শত্রু সেনাদের ভেতর দিয়ে ভাইয়েব কাছে। ইন্ডিয়ান মেয়েরা বীরাঙ্গ না। যুদ্ধের সময়ে তারা যে রকম চীৎকার করে পুরুষদের উৎসাহ দেয়, সে চীৎকার শুনলে ভয়ে জমে যেতে হয়। সেও তেমনি চীৎকার করতে করতে যুদ্ধের গান গাইতে গাইতে ভাইয়ের কাছে চলে গেল। ভাই এক লাফে তার পিছনে উঠে বসল। সে মেয়ে হেসে উঠল জোরে। আনন্দে তো বটেই, লড়াইয়ের নেশাও আছে।

সাদা সৈন্যরা রাইফেল চালাচ্ছে, ডান হাতে সেও গুলি ছুঁড়ছে লম্বা বন্দুক বগলে চেপে। ঘোড়া এমন ছোটাচ্ছে, যে শত্রুর গুলি ভাই বোনকে স্পর্শও করছে না। হঠাৎ ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে মেয়েটি পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠে গেল। সেখানে প্রবীণ দল - পতিরা আর মন্ত্র পড়ে যাঁরা ওষুধ বানান তাঁরা সাগ্রহে যুদ্ধ দেখছিলেন।

মেয়েটির দুঃসাহসী কাজটা সাইয়ুক্স আর চেইয়েন যোদ্ধারা দেখছিল। সাদা সৈন্যরাও তা দেখে চমৎকৃত। কিছুক্ষণ যুদ্ধ একেবারেই বন্ধ। সবাই দেখছে তরুণী এই বীরাঙ্গনা কেমন করে তার ভাইয়ের প্রাণ বাঁচায়। ইন্ডিয়ান যোদ্ধারা শূন্যে হাত তুলে বজ্রনির্ঘোষে উল্লাস জানাল। তারপর তারা ভীষণ জোরে গলায় ঢেউ তুলে যুদ্ধের আহ্বান ঘোষণা করল। সে যুদ্ধ ঘোষণা শুনলে মানুষের মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে।

এমনকি কিছু সাদা সৈন্যরাও শূন্যে মাথার টুপি ছুঁড়ে 'হুররা' বলে বীরাঙ্গনাকে সম্মান জানাল।

যুদ্ধ তখন অল্পক্ষণই শুরু হয়েছে। দু'পক্ষেই বেশি যোদ্ধা তখনো মরেনি। জেনারেল ক্রুক ভাবলেন, 'ওদের মেয়েরাই যদি এমন লড়া লড়ে, না জানি ওদের পুরুষ যোদ্ধারা কি বীরবিক্রমে লড়বে। যদি জিতিও, আমার সেনাদলের অর্ধেক তো মারা পড়বেই।'

জেনারেল ক্রুক তাঁর সাদা সৈন্যদের পিছু হঠতে বললেন। একশো মাইল পিছিয়ে গেল তারা। সেদিনের যুদ্ধে সাইয়ুক্স আর চেইয়েনদেরই জয় হল।

ক্রুকের মন খুবই দমে যায়। তাঁর জেনারেল কাস্টারের সঙ্গে মিলিত হবার কথা ছিল। ক্রুক কিন্তু সেনাদল নিয়ে পালালেন। এক সপ্তাহ বাদে লিট্‌ল বিগহর্নের যুদ্ধে জেনারেল কাস্টারকে একা লড়তে হল। ক্রুক তো তখন অনেক দূরে। আর এই যুদ্ধে চেইয়েন ও সাইয়ুক্সরা অনেক বেশি উদ্যমে ও তেজে লড়ে। জেনারেল কাস্টার, আর তাঁর মস্ত সেনাদলের একজনও প্রাণ নিয়ে ফেরেননি। ইন্ডিয়ানদের সেটা মস্ত জয়।

বীরাঙ্গনা ওই মেয়েটির জন্যে জেনারেল ক্রুকের মনোবল ভেঙে যায়। রোজবাডের যুদ্ধে সাদা সৈন্যরা হার মেনে পালায়। আর লিট্‌ল বিগ-হর্নের যুদ্ধে জেনারেল ক্রুকের সাহায্য পাননি বলে জেনারেল কাস্টার হেরে ভূত হয়ে যান। বীরাঙ্গনাকেই কৃতিত্ব দিতে হয়।

যারা সে যুদ্ধ দেখেছে, তারা বলে, 'ওই বীর বালিকাব গৌরব সব চেয়ে বেশি। যুদ্ধে নেমে সে প্রাণ নেয়নি, ভাইকে প্রাণ দিয়েছে। সেই জন্যেই তো আমরা, ইন্ডিয়ানরা বলি, ও যুদ্ধের নাম রোজবাডের লড়াই নয়। ওটা হল সেই লড়াই, যেখানে বোন ভাইকে বাঁচিয়েছিল।'

যেখানে বোন তার ভাইকে ঘোড়ায় তুলে নেয়, সে জাযগা তো এখন কৃষিভূমি। সেখানে এখন মস্ত খামার। ঘোড়া পালা হয়।

কিন্তু যতদিন ইন্ডিয়ানরা বেঁচে থাকবে, ততদিন এই বীর বালিকার কথাও বেঁচে থাকবে। এ তো রূপকথা নয়। এ যে ইতিহাস, এ যে কিংবদন্তী।

কিষণ কোরির কাহিনী

মা ভেবেছিল তার ববুয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই কিছু শোনেনি। ববুয়া সব শুনেছিল। ববুয়া ওর নাম নয়। তার নাম কিষণ কোরি। কিন্তু কোলের ছেলে তো! কিষণকে মা "ববুয়া" বলেই ডাকে। মার ধারণা, ববুয়া ওর দাদার মত বেয়াড়া অবাধ্য নয়। এই যে মায়ের এত সাধের মোষগুলো, ববুয়াই ওদের দেখবে, দুধ দোয়াবে, বেচতে যাবে, সংসারটা বেঁধে তুলবে।

বারো বছর বয়সেই ববুয়া কেমন জোয়ান হয়েছে। মোষ চরাতে যায়, মোষ ঘরে তোলে। মোষের ঘর সাফ করে। ওদের খেতে দেয়।

আর মা যখন দুধের কলসি নিয়ে ঝাঁসী শহরে বাজারে যায় দুধ বেচতে, ববুয়া বাঁকের দু'দিকে মোটা দড়ির শিকেয় কলসি বসিয়ে দুধ নিয়ে মায়েব সঙ্গে যায়। অনেক অনেক দুধ বেচে মা, অনেক দিন ধরে। যে ছেলে এমন অনুগত, মা তো তাকে ববুয়া বলবেই।

ঝালি হল ববুয়ার ছোট বোন। ভাল নাম ঝলকারি। কিন্তু সবাই বলে ঝালি। ঝালির বিয়ে হয়েছে গত বছর। সামনের মাঘ মাসেই ওর শ্বশুরবাড়ি যাবার কথা ছিল। যেতও হয়তো, যদি না বলোয়া বেধে যেত।

না, "লড়াই" বলে না ববুয়ারা। "বলোয়া" শব্দটা ওর দাদা পরতাপ শিখিয়ে গেছে।

বলোয়া বেধেছে বলেই তো ঝালির শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হল না। ছোটবেলায় বিয়ে হয়। খানিক বড় হয়ে মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি যায় "গওনা" করতে। তখন থেকে তো মেয়ে শ্বশুরঘরই করবে। তাই মা বাবা মেয়েকে সাধ্যমত জিনিসপত্তর দেয়। জামাকাপড়, বাসনপত্তর, তেল-ঘি-হলুদ-চাল, গুড়ের জিলাবি, ছাতুর লাড়ু, স—ব!

শ্বশুরবাড়ি যাওয়া পিছিয়ে গেল বলে ঝালির কোন দুঃখ নেই। ঝালি বাড়ির কাজ করে। নইলে মা মারবে। কিন্তু তারপরেই দৌড় মারে বাইরে। ঝালি গাছে চড়ে, ঢিল দিয়ে আম পাড়ে, পাখির বাসা থেকে টিয়ার ছানা ধরে।

মা কিছু বললে বলে, —কেন করব না?

—মেয়েরা কি ছেলেদের মত দস্যিগিরি করে?

এ কথা এখন বেলৌড়া গ্রামে কোন মা কোন মেয়েকে বলতে পারে না। বললেই ঝালি, বিদি, তিল্‌নির মত মেয়েরা বলে, ইস্‌-স্‌! বাইসাহেবা ঘোড়া ছুটিয়ে ঘোরে। তরোয়াল চালায়, সেগুলো কি দস্যিগিরি?

ঝালি আরো বলে, — তুমিই তো বলেছ যে বাইসাহেবা রোজ লাঠি খেলে, তরোয়াল খেলে, খেলে না?

মা যদি বলে, — ওরে! সে যে রানী!

তখনি ঝালো বলবে, — ইস্‌! আমরা শুনিনি বুঝি, বাইসাহেবা খুব গরিবের মেয়ে ছিল?

মা বলে, — তিনি হলেন ঝাঁসীর রানী!

—ঝাঁসীতে দেখিসনি, কত মেয়ে ঘোড়ার পিঠে রানীমহল থেকে বেরোয়? তারা কি রানী না কি?

—তুই কি বাইসাহেবা?

— আমি ঝালি, ঝলকারি!

— ঝুঝেছি, এখন জল নিয়ে আয়। আমারও কপাল! পরতাপটা বিয়ে করল না!

এ কথা বললেই পরতাপ হাসে। বলে, — কেন মা? বিয়ে তো দিয়েছিলে? গওনার অনেক আগে বউ মরে গেল, তা আমি কি করব?

— আরেকটা বিয়ে করবি।

— এখন নয় মা! এখন বলোয়া চলছে।

— কবে শেষ হবে?

— সব ফিরিংগিরা পালিয়ে যাবে, তারপর!

— আমার কপালই মন্দ!

—কেন?

—তোর কাজ নেই, আমার তো কাজ আছে। দাঁড়া, ছাতু আর আচার দিই, খেয়ে যা।

আপন মনে মাথা নাড়ে মা, পরতাপের মা। একসময়ে ওর নাম ছিল যম্‌না। বিয়ের পরেও সবাই যম্‌না বলত, যতদিন না গওনা হল, ঘর করতে এল। যখন ঘর করতে আসে, তখন যম্‌না কত না কেঁদেছিল। কোথায় বেলৌড়া, আর কোথায় ওর বাপের বাড়ি কুণ্ডারপুরা। কুণ্ডারপুরা খুব বড় গ্রাম। জমিদারের বাড়ি যেমন বড় বড় তিনটে কুয়ো, গ্রামের লোকেদের জন্যে দুটো কুয়ো। মস্ত একটা তাল দীঘি) আছে। তাতে স্নান করো, কাপড় কাচো, সুখ কত।

কুণ্ডারপুরায় দশেরার মেলা কি জমজমাট হয়। কত নাচ গান, দূর দূর থেকে

নাট (গীতাভিনয়) দল আসে, তাড়কাবধ, হরিশচন্দ্র, এমন কত গান শুনেছে যমুনা। কত অবাক কাণ্ড দেখেছে! ও মা। আজ যে শৈব্যা সেজে এত গাইল, মানুষকে কাঁদাল, সকালে দেখা গেল সে পুরুষ মানুষ। শালপাতায় চিড়ে দই মেখে খাচ্ছে।

বেলৌড়ায় এ সব কিছু নেই, কিছু নেই।

ওর মা সান্ত্বনা দিয়ে বলল, দেখবি সব আছে। জামাই দুধ বেচে, দই বেচে, নিজের ক্ষেতে মকাই গম চাষ করে। দেখবি কত সুখে থাকবি।

শ্বশুড়বাড়ি এসে যমুনা নাম কেউ বলে না আর। গ্রামের মেয়েরা বলে, গণেশের বউ, শাশুড়ি বলে বহু। আর পরতাপের জন্ম থেকে যমুনা তো পরতাপকে মাঈ হয়ে গেল। পরতাপ, শম্ভু, কিষণ, ঝলকারি, চারটে ছেলেমেয়েও হল। শম্ভু অবশ্য এক বছর বয়সে মরেও যায়। এখন আর তার মুখটা ভাল মনে পড়ে না মা'র।

পরতাপের বয়স যখন বারো, তখন পরতাপের বাবা, ঠাকুমা, গ্রামের অনেকে মিলে কোথায় বিধুর না ব্রহ্মাবর্তে তীর্থ করতে গেল। পরতাপের বাবা বলে গেল, —মকাই জনার ক্ষেত থেকে তুলে দিয়েছি। গোহালটা শক্ত আগড় দিয়ে পোক্ত করেছি। ঘরটা তো একেবারে নতুন করে নিয়েছি। গ্রামে কার বাড়িতে এমন পাথরের ভিত, মোটা দেয়াল, মোটা ছাউনি দেয়া ঘর আছে বল?

—কতদিন বাদে আসবে তোমরা?

—কত আর। এক মাস, দেড় মাস।

—আমি থাকতে পারব?

—বেলৌড়া কি যেমন-তেমন গ্রাম? ঝাঁসীর পাঁচিল দেখা যায়। সিপাহীরা কুচকাওয়াজ করে। এ গ্রামে ষাট ঘর মানুষ আছে। ভয় কি?

না, ভয় যমুনা করেনি। গ্রাম যত বড় হোক, ওদের ঘর এক প্রান্তে। তারপর একটা বিল, তারপর জঙ্গল, কিন্তু ডাকাতের ভয় নেই। বাঘ বা নেকড়ে বা হায়েনা এলে ছেলেরাই তীর-সড়কি নিয়ে দৌড়য়। আর যমুনাদের ঘর, গোহাল, উঠোন ঘিরে মাটির পুরু পাঁচিল। এটা এ অঞ্চলের নিয়ম। ঝাঁসী যেমন পাঁচিলের মধ্যে কেল্লা, প্রাসাদ, জনবসতি, গ্রামগুলোও তেমনি মাটির পাঁচিলে ঘেরা। যমুনাদের ঘর একপ্রান্তে বলে ওরা আলাদা করে ঘিরে নিয়েছে।

হোক একপ্রান্তের ঘর। তেমনি ওদের জমি যে বিলের কাছে। সেচটা ওরা যত সহজে পায়, তেমন অন্যরা পায় না। পাঁচিলের বাইরেই যমুনার নিজস্ব তরকারির ক্ষেত। ধুঁধুল, কুমড়ো, লঙ্কা আর মথনির চাষ করে ও। মথনির শাক খেতে খুব ভাল। মূলটা শুকিয়ে নিয়ে ঘরে রাখা চলে। বছর ভরে তরকারি খাও।

ভয় করেইনি যমুনা। সড়কি ছুঁড়তেও পারে ও। আর লাঠি নিয়ে বার বার জংলি ময়ূর তো তাড়াতে হয়। বুনো ময়ূরের উৎপাত খুব যমুনার বাড়ি। উঠোনে মেলে রাখা মকাই-জোয়ার, বড়ি-আচার-পাঁপড়, সব খেয়ে নেয়। ফেলে দেয়।

ছেলেরাও কম যায় না, সুযোগ পেলেই জংলী ময়ূর বা হরিণ মেরে ভোজ লাগায়।

সে ব্রহ্মাবর্ততীর্থ থেকে তো বেলৌড়া গ্রামের কেউ ফিরল না। হাজাম (নাপিত) মোহর ছাড়া। গাঁ থেকেই ওরা নাপিত নিয়ে গিয়েছিল। আর চার মাস বাদে মোহর শুকনো কাঠের মত চেহারা করে ফিরে এল।

গ্রামের মুখিয়া হরদেবকেই খবরটা দিল। শুকনো গলায় বলল, কেউ ফেরেনি।

—ফেরেনি মানে? বাইশটা লোকের কেউ ফেরেনি?

কি করবে মোহর? কি তার হাতে ছিল? সে কি জানত, যে মুখিয়ার কাকি জেদ ধরবে, ব্রহ্মাবর্ত যদি এলাম, তো প্রয়াগ যাব না কেন? গণেশের মত সংসারী পুরুষরা ফিরতে চেয়েছিল। ঘর গৃহস্থালী ফেলে রেখে কতদিন থাকা যায়?

কিন্তু গণেশের মা, মুখিয়ার কাকি, বুড়িরা তো তুফান তুলে দিল। যাবেই তারা প্রয়াগ। গঙ্গাযমুনার সঙ্গমে স্নান করলে, ব্রাহ্মণকে দান করলে, এত পুণ্য হবে, এত পুণ্য হবে যে ওরা নিজেরা তো বটেই, অধস্তন সাত পুরুষ মরে গেলে স্বর্গে জায়গা পাবে। ঘরগৃহস্থী, ক্ষেত, গোহাল, এ সব তো ছিল। আছে। থাকবেও। কিন্তু তীর্থ করার সুযোগ কি বারবার আসবে?

গণেশের মা মুখ হাত নেড়ে বলল, —ওরছা, দাড়িয়া, লালথাপুর, তালবেহুত, সব জায়গা থেকে মানুষ হরদম তীর্থে যায়। বেলৌড়া থেকে গিয়েছিল, গণেশ জন্মাবার পর, সেই একদল তীর্থযাত্রী। আর এলাম আমরা। এত বছর কেউ যায়নি।

—পথের বিপদ?

—কিসের বিপদ? সবাই ফিরে এসেছিল ঘরে।

—গ্রামে যে কেউ জানবে না?

—আমরা তো ফিরেই আসব।

ওরা প্রয়াগ রওনা হয়েছিল, পৌঁছেছিল ঠিকই। সঙ্গমে স্নান, ব্রাহ্মণকে দান, সবই করেছিল। কিন্তু নৌকোর মাঝিরা অনেকে যে এমন ভয়ঙ্কর হয়, তা কে জানত? তারা কয়েকজন বলল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেলৌড়া যাবে। বুঝেছি, ঝাঁসীর কাছে বলছ, ও সব জায়গা থেকে হরদম এখানে লোক আসে।

—তা এখান থেকে ফিরবে তো? চলো, আমরাও যাব খানিক পথ একসঙ্গে। তারপর কপিলেশ্বর মহাদেবকে পুজো দিতে যাব, তোমরা ঘরে চলে যেও।

মোহর গ্রামবাসীদের বলেছিল, —লোকগুলোকে সুবিধের মনে হচ্ছে না। যে পথে লোক চলাচল আছে, সে পথ একসঙ্গে যাব। যদি ওরা কোন অচেনা পথ ধরে, আমরা যাব না।

সবাই একমত হয়েছিল। তাই কখনো যায় কেউ? তীর্থের পথ অনেক নিরাপদ। কিছু বাদে বাদে চটি পাওয়া যায়। বিশ্রাম করো। রেঁধে বেড়ে খাও। পথ চলো

পরদিন। মোহর এত জ্ঞান দিচ্ছে কেন? বেলৌড়ের লোকদের কি মনে করে মোহর হাজাম? তারা শহরের কাছে থাকে। তাদের বুদ্ধি আছে অনেক। মোহরকে আনা হয়েছে কেন? তীর্থে নাপিত তো দরকার। নখ কাটতে হয়। কেউ মাথা মুড়োতে চায় পূর্বপুরুষদের নামে শান্তিপুজো দিয়ে। পয়সাটা তীর্থের হাজামকে দেব কেন? গাঁয়ের হাজামকেই দেব। বেলৌড়ার লোকদের বুদ্ধি আছে সে কথা যেন মোহর ভুলে না যায়।

এত কথা হয়ে গেল, ঘরের পথও ধরত ওরা দু'দিন বাদে। কিন্তু মাঝিরা সারাটা পথ কপিলেশ্বর মহাদেবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করছিল। আর গ্রামবাসীরা শুনছিল হাঁ করে। ষোল/সতের দিন ধরে যদি এক কথা শোনা যায়, তা হ'লে বুড়িদের মনে বিশ্বাস জন্মে যায়।

গ্রামবাসীরা হাঁ করে মোহরের কথা শুনছিল। যম্‌না মুখে আঁচল গুঁজে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল। এখন পরতাপ বলল,

—তারপর?

—সর্বনাশ তো করল....মাপ কোর মুখিয়াজী! তোমার চাচী আর পরতাপের দাদী। ওরা জেদ ধরল, যে শিব গুপ্ত হয়ে আছেন আজও, জঙ্গলে ঢুকে মাটির ওপর তাঁর ত্রিশূলের ডগায় জল দিলে ত্রিশূল নাড়িয়ে ভক্তদের ফুল-ফল প্রসাদ দেন, যাঁর প্রহরী গোহুমন (গোখরে) সাপ ভক্তদের দেওয়া দুধ খেয়ে বেল গাছের নীচে গর্তে ঢুকে যায়। তাঁর পুজো ওরা দেবেই দেবে।

মুখিয়া বলল, —এই দুই বুড়ী তো গাঁয়ের সব চেয়ে দজ্জাল বুড়ী! আমার চাচী, "কৌন্ হৌ" বলে চেঁচালে চিতাবাঘ পালায় এ তো আমি স্বচক্ষে দেখেছি। কিন্তু কি হল? তারা পুজোই দিচ্ছে? এখনো?

মোহর মাথা নাড়ল। কে পুজো দেবে? এ পথ ও পথ ঘুরিয়ে ওরা সকলকে গাছের নীচে বসাল। নিজেরাই গেল "গোয়ালাদের গাঁয়ে যাচ্ছি" বলে, আর দু'কলসি বহোৎ মিঠা, নানারকম সুগন্ধি মশলা মেশানো দুধ নিয়ে এল। সকলকে বলল, খাও, আরাম করো, ঘুমিয়ে পড়ো। সবাই ঘুমিয়ে পড়ল।

—তারপর?

—কয়েকঘণ্টার মধ্যে পেটে বুকে যন্ত্রণা, বমি করছে আর শরীর খিঁচে খিঁচে উঠছে। হা ঈশ্বর! তীর্থ করার কি পুণ্য দিলে? গলায় স্বরও নেই যে চেঁচিয়ে ডাকব কাউকে। চেঁচালে বা কে শুনত?

মোহর আর নান্দু কোরি তখনি কেন মরে যায়নি কে জানে। যন্ত্রণায় গড়িয়ে গড়িয়ে ওরা রাস্তায় গিয়ে পড়েছিল। সে পথ জঙ্গলে পায়ে চলা পথ।

সকালে রাখালরা ওদের দেখতে পায়। ওরা গ্রাম থেকে লোক ডেকে আনে।

মোহরের তো হুঁশ চলে যাচ্ছিল। গ্রামে নিয়ে গেলে পরে নান্দুও মরে। যায় ওরা বৈদ্য এনেছিল। সে অনেক চেষ্টা করেছিল।

—আর ওরা?

—কেউ বাঁচেনি।

গ্রামবাসীরা বলল, —এ তো মথুরা কালোড়ের দল। এই নিয়ে গত সাত বছরে চারবার ওরা এমন কাজ করেছে। তীর্থে আসতে হলে এমন লোককে আসতে হয়, যে কয়েকবার তীর্থে এসেছে। পথঘাট, মানুষ, দুর্জন-সুজন চেনে। তীর্থে যেতে হলে লোক-চলাচলের পথ ছাড়তে নেই। বেলৌড়ার লোকরা ওদের বিশ্বাস করল কেন? মোহর ওই গ্রামেই পড়েছিল। ওখানকার হাজামের ঘরের দাওয়ায়। দেহে বল পেয়ে তবে আস্তে আস্তে দেড় মাস হেঁটে ফিরেছে।

—কেন, কেন ওদের মারল?

—টাকা আর সোনারুপোর লোভে।

মুখিয়া বলল, —ওদের সৎকার?

—কে করবে? ও গ্রামে তো স্বজাতি নেই। আর জঙ্গলের জানোয়ার....

মোহর মাথা নাড়ল। বলল, —আমি খুব কম পিয়েছিলাম. তাতেই হয়তো বেঁচে গেলাম। মুখিয়াজী! গ্রামের তো অশৌচ লেগে গে᳚.। তোমাদের হাজামও লাগবে। আমি তো পারব না। কেমন করে এতটা পথ এসেছি, তা আমি জানি।

—না পারো, হাজাম এনে দাও।

—কেমন করে যাব তালবেহুতে?

সত্যিই সে এক ভয়ংকর সর্বনাশ নেমেছিল বেলৌড়ে। বেলৌড়ের ঘরে ঘরে কান্না, অশৌচ। শেষে মুখিয়া মোষের গাড়ি দিল। মোহর তালবেহূত থেকে নিয়ে এল ওর শালা চান্দোকে।

এ গ্রামের ক্রিয়াকর্মে ঝাঁসী থেকে বামুন আনা হয়। তাই আনা হল। স্বপ্ন স্বপ্ন সব। খড়ের মানুষ বানিয়ে তাদের দাহ করা হল বিলের ধারে। তারপর ক্রিয়াকর্ম হল। অনেক, অনেক দিন ধরে চলল। অপঘাতে মরেছে বলে কত পূজাপাঠ! যমুনার কিছু মনেও নেই। শেষে যখন বামুন আরো পূজাপাঠের উপক্রম করছে, যমুনা মুখিয়ার কাছে গেল পরতাপকে নিয়ে।

—আর পূজাপাঠে আমি নেই মুখিয়াজী! আমার ঘরের মানুষ চলে গেছে, আমাদের পেট তো আছে। আমরা রাজা, না আমীর, যে ঘরে অফুরন্ত মকাই-জনার থাকবে? এখন ক্ষেত-গোহাল না দেখলে আমার চলবে না। যাদের আছে তারা করুক।

যমুনা যেন সকল গ্রামবাসীর মনের কথাই বলেছিল। গ্রামবাসীরা বামুনকে বলল, দেওতা! আর আমরা পারছি না। ক্ষমা দাও। পরতাপের বাবার জন্যে কাঁদতেও

সময় পায়নি যম্না। ছেলেকে বলেছিল, —ক্ষেতে চল। কাজ কাম না করলে চলবে? বাবা নেই, তুই এখন মাথা।

অবশ্য পরতাপকে মাথা হতে হয়নি। মা নিজেই সব ভার নিয়ে নিল। কুণ্ডারপুর থেকে পরতাপের মামা নরসিং এসে বলল, —আমি অরছার রাজার সেপাই। জমি-মোষ, সব আছে আমার। তোরা আমার সঙ্গে চল্।

বোন মাথা নাড়ল।

—ক্ষেতীর কাজ সামলাবি কি করে?

—গাঁয়ের সবাই যেমন করে সামলাবে।

গণেশ যাদের নিয়ে চাষ করত, তাদেরই ডাকল যম্না। বলল, আধা নাও, আধা দাও, তোমরাই চাষ করো, পরতাপ দেখবে। ববুয়া যদি এত ছোট না হত, সেও খাটত।

সেই নিয়মই বহাল থাকল। মা দুধ আর দই বেচতে যেতে থাকল ঝাঁসী শহরে।

আর ভক্তরনরা দশেরার আগে দিকে দিকে গান বেঁধে গাইল, বেলৌড়ার মানুষরা তীর্থ করতে গিয়ে কেমন করে মরে গেল সে কথা!

পরতাপ আর ববুয়া আর ঝালি। এখন সবাই বলে, পরতাপের মা দশটা মরদের সমান বটে! সংসার সামলে নিল। ছেলে মেয়ের বিয়ে দিল। পরতাপের বউটা গওনার আগেই মরে গেল সাপের কামড়ে। এই যা দুঃখ! পরতাপের মা নিশ্চয় ছেলেকে আবার বিয়ে দেবে।

ববুয়া জানে দাদার বিয়ে দেবার ইচ্ছে মা'র কত!

দাদা ফিক করে হেসে সরে যায়, নয়তো লাঙলটা মেরামত করতে বসে যায়, নয়তো গোহাল মেরামতে লেগে যায়।

—মেয়ে আমি দেখেছি পরতাপ! তালবেহুতের মেয়ে রেন্না।

—তুমি দেখেছ?

—মোহর দেখেছে।

—এখন তো বিয়ে করা যাবে না মা! এখন খুব গোলমালের সময়। বলোয়া হবে খুব।

—এ কথাটাই তো বুঝি না তোর। এখন বিয়ে করতে আপত্তি কেন?

—আমার সময়ই নেই।

—তোর যখন সময় হবে, ততদিনে ও মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে।

—তখন কি আরেকটা আট/দশ বছরের মেয়ে পাওয়া যাবে না?

মা হাতের তালু উলটে বলল, কালে কালে কতই দেখলাম! ছেলের বিয়ে দেয় বাপ মা। হাজাম খবর আনে। হাটে বাজারে ছেলের বাপ মেয়ের বাপ কথা বলে।

মেয়ের বাপ বাড়ি আসে ছেলের। তিন কথায় বিয়ে ঠিক। বিয়ে হয়। তোর বাপ কি মেয়ে নিয়ে কথা বলেছিল?

—দাদী বলত, কুণ্ডারপুরার মেলাতে দাদী তোকে দেখেছিল, তুই চুড়ি পরেছিলি?

—মেলাতে কে কাকে দেখল, আমি জানি? কিন্তু বউ মরেছে, বিয়ে না করলে ববুয়ার বিয়ে হবে?

—এখন হবে না মা! আমার বিয়েই হবে না। আর ভালা, সুরজ, নওল, অর্জুন কেউ বউ আনবে না ঘরে।

—বলোয়ার জন্যে?

—বলোয়ার জন্যে। বুঝতে পারিস না?

মা বলল, ঝাঁসী যাই। বাজারে বসি। কথা শুনি, কিছুই কি বুঝি না?

—এখন আমরা ঘরেও থাকব না রোজ রাতে।

—জানি।

—কি জানিস?

—বিলের ওপারে জঙ্গলে তোরা গাছের মাথায় ঘর বানিয়েছিস।

—কে বলল, মা?

—যেই বলুক। কিন্তু কেন?

—বাইসাহেবাকে ছেড়ে দেবে নাকি ফিরিংগিরা? ওরা বহোৎ সেপাই-লস্কর-হাতী-ঘোড়া-কামান নিয়ে আসবে না?

—তোরা কি লড়বি?

—বাইরে থেকেও কাজ করা যাবে কত!

—বুঝেছি। এখন তো ঘাসের গন্‌জী বানাচ্ছিস।

কাঠের মাচানের ওপর ছাউনি। তার নীচে ঘাসের টাল রেখে বড় বড় তাঁবুর কাপড়ে ঢেকে রাখো, জল ছিটিয়ে ঘাস তাজা রাখো এর নাম গন্‌জী।

ঘোড়া হল যুদ্ধে প্রধান সহায়। তার খাবার লাগবে না?

—বেশ! যা করবি কর। আমি তোকে আর কোন দিন কোন কথা বলব না। বলোয়ার কাজটা বড় হল! আর মা-ভাই-বোন-ক্ষেতী-গোহাল, সব ভেসে গেল। বাইসাহেবাকে বলব আমি সব।

—তুই কথা বলিস তার সঙ্গে?

—বলিনি। বলব।

—মা! কেন যে মেয়েমানুষ হলি!

—বাইসাহেবা কি বেটাছেলে? রানী যখন ছেলেকে ঘোড়া চড়তে শিখায়, দেখিস নি? বাপরে সাহস! বিধবা হল তো সমাজের নিয়ম মানেনি। মাথার চুল কাটেনি।

দরবারে বসে স কল কাজ করে, আর এখন তো শুধু সেপাই-সওয়ার আর গোলন্দাজ ভর্তি করছে ফৌজে।

—শুনলাম গুলাম ঘৌস কামান দাগতে শিখায়।

—সে তো আগেও শিখাত।

—মা! তুই ওইসব কামানের আওয়াজ শুনেছিস?

—শুনেছি। রাজা গঙ্গাধর রাও যখন বাইসাহেবা লছমীবাইকে বিয়ে করল তখন, —বাপরে! ঘনগর্জের আওয়াজ যেন গড়িয়ে গড়িয়ে চলে আসে। সমুদ্রসংহারের আওয়াজ দাতিয়া থেকেও শোনা যায়,, আর কড়কাবিজলী দাগলে দূরের পাহাড় অবধি কেঁপে ওঠে।

—শুনব, আমিও শুনব।

বিড়বিড় করে বলল পরতাপ। তারপর বলল, —কুলাড়টা (কুঠার) দে মা! এ ইমলি গাছের গুঁড়ি লোহার মত, ফেড়ে দিয়ে যাই।

বুড়ো তেঁতুল গাছটা! আহা, নিষ্ফলা হয়ে গিয়েছিল, ওর গুঁড়ি থেকে কি ভালো গরুর গাড়ির চাকা, তেল পিষাইয়ের ঘানি হত, বসবার ছোট ছোট চৌকি! তেঁতুল গাছের মত ভালো কাঠ দিতে পারে কোন গাছ? পরতাপের মায়ের কপাল!

যখনি কাটার কথা হয়, তখনি মুখিয়া বলে, —আহা! তিথি নক্ষত্র বিচার করে তো কাটবে।

দিন দেখতে দেখতে দিন এলই না। বাজ পড়ে গাছটা ঝলসে গেল।

এখন যতটা কাঠ মেলে ভালো।

পরতাপ কাঠ চেলা করল, ঘরের মাচানে ওঠাল। জ্বালানি সঞ্চয়টা তো রাখতে হয়। বাবুই ঘাসের দড়ি পাকাল অনেক। আর মাটির পাঁচিলের গা দিয়ে ওঠার-নামার মই বানাল একটা।

ববুয়া ঝালিকে বলল, —ভৈয়া কত কাজ করছে দেখছিস?

—সংসারে মন বসেছে।

—ছাই বসেছে। আমাদের ভোলাচ্ছে। এবার একদিন পলাবে।

—কোথায় যাবে রে?

—যাবে! সব কথা মেয়েদের বলতে নেই।

—না বললি। আমি জেনেই নেব।

—যা যা, মোষগুলোকে জল দে! আমি দেখছি ভৈয়া কি করে?

ভৈয়া আর কি করবে!

সকাল হল, ভৈয়া নেই।

ভালার মা, সুরজের দাদী, নওলের মা, অর্জুনের পিসি সবাই ঘয়লা (জলের বা দুধের ঘড়া) মাথায় পরতাপের মার কাছে এল।

—চল্ রে, জল আনতে যাই।

কুয়ার পাশে বাঁধানো কুয়াতলায় ময়লা নামিয়ে এ-ওর দিকে চাইল।

সুরজের দাদীর বয়স বেশি। বয়সকালে ও বর্শা দিয়ে বুনো শুওর মেরেছিল। এ গ্রামে ঝগড়া করতে হলে সুরজের দাদীরই ডাক পড়ে। ও তো সকলের কুলুজি কুষ্ঠী জানে। তাই চেঁচিয়ে শুরু করে। কি! গোবিন্দ ধুরুয়াকে চোর বলেছে? সেও কয়েকটা আম পেড়েছে বলে? আরে গোবিন্দা! তোর বাপ তুলারাম তো চোরের সর্দার ছিল। তুই কাকে বলিস রে?

সুরজের দাদী সর্বদা চেঁচায়, জোরে কথা বলে। সেই বলল, পরতাপ কাল বাড়ির কি কি কাজ করল?

—গাছ ফাড়ল, দড়ি পাকাল, মই বানাল!

—আর ভালা?

সে তো ভাঙা গোহাল লোক ডেকে মেরামত করে আমাকে অবাক করে দিল।

-নাওল কি করল।

- যত মকাই জনারের বোরা (বস্তা) কাচল। শুকাল। সব তুলল বোরায়। গরুটার শিঙের গোড়ায় মলম লাগল। মোষের গাড়ির ছই সারল!

- আর অর্জুন না কি কাল ঘরে এসে খুব রংতামাশা দেখাচ্ছিল?

অর্জুনের পিসি বলল, -সে কি নাচ গো! ঝাঁসী না অবছায় দেখে এসেছে, কাঠের তলোয়ার ঘুরিয়ে সে কি নাচ্। আবার শোবার সময়ে বলে কি, আয় পিসি তোর পায়ে মালিস করে দিই।

- আজ সকালে ভোঁ ভাঁ তো?

- সবাই!

- যাই করুক, ভাল কাজে গেছে। এখন এ কথা পেটে রাখতে হবে।

- বলা কওয়া করব না?

- না। এর কথা তার কাছে না বললে তোর পেট ফুলে ওঠে তা জানি।

পরতাপের মা বলল, - পরতাপের বাবা বলত, বাজে কথা ব'ল না। কথা থেকে যত সংসার জ্বলে। ঘরে আগুন লাগার চেয়ে তা অনেক বেশি।

অর্জুনের পিসি বলল, - না, এ কথা আর বলব কাকে? সে ছেলে কি ঘর ছাড়ত? সৎমাকে ঘরে আনল। বাবাও বিগড়ে গেল। বাড়িতে আমি ছাড়া ওকে....

পরতাপের মা বলল, — কেঁদ না বোন। সবাই জানে ছেলে বিইয়ে মা পাশ ফিরল আর মরল। তুমি যে কত কষ্টে ওকে বড় করেছ, সবাই জানে।

ভালার মা বলল, - যাক গে ও সব কথা। চলো ঘরে যাই। আর হাঁ। যদি কেউ শুধায় ছেলেরা কোথায়?

সুরজের দাদী বলল, —আজকালকার ছেলেরা ঘরে সব কথা বলে নাকি? বান্দায় কি নাটক-নাচ হবে, দেখতে ছুটেছে। বলে লালথাপুর, হামিরপুর, সব জায়গায় মেলা দেখে তবে আসবে।

তারপর বলল, - জলটা তুলে দে বাছারা! জল টানতেই যত কষ্ট। সুরজ জলটা টেনে দিত!

সবাই বিধবা। সকলের পরনে কালো ঘাঘরা, কালো জামা কালো ওড়নি। তীর্থ করতে গিয়ে ওদের বাড়ির পুরুষরাও মরেছিল। সুরজের দাদী অবশ্য বাপের বাড়ি চলে যেতে পারত। ওর বাপের বাড়ির অবস্থা খুব ভাল। ওরা লবণ আর কাপড় ছাড়া কিছু কেনে না। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। বউ নাতি নিয়ে চলে যেতেই পারত, যায় নি।

বলেছিল, বেটা এতগুলো গাছ বসিয়ে গেছে। ওগুলো বড় হোক, তবে যাব।

সে গাছগুলো বড় হয়ে গেছে কবে। আর ওদের বাড়ির সামনে অশ্বথ গাছটা এখন মস্ত বড়। ওর নীচে বসে সুরজের মা চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ পিপাসার্ত পথচারীকে একটু গুড় আর জল দেয়।

সুরজের দাদী বলল, - যে যা খবর পাব, নিজেদের মধ্যে জানিয়ে দেব।

পরতাপের মা দাঁড়িয়ে রইল সবাই চলে গেলেও। এক জীবনে যে ক'বার সংসার বেঁধে তোলা যায়? পরতাপের বাবা গেল তো ভাসিয়ে গেল। সবে মনে হচ্ছিল এবার সংসার সেজে উঠবে, পরতাপ চলে গেল বলোয়ার ডাকে।

বাড়ি ফিরতে ববুয়া বলল, —এত ভাবনা কেন? আমি ঘরে নেই? আমি বড় হইনি?

- খুব বড় হয়েছিস!

মা জলের ঘয়লা নামাল। তারপর বলল, —রান্নার কাঠ স্লেট করে কাটল কে? পরতাপ এসেছিল?

-আমি কেটেছি। দাদা যা যা পারে, আমি স-ব পারব। দাদা বলে গেছে মা আর ঝালিকে দেখবি।

মার বুক যেন ভরে উঠল।

- চোখ মুছলি, মা?

- ধুলো পড়ল যে?

- বলোয়ার সময় তো! এখন ছোট্ট থাকলে চলে না।

এইরকমই চলছিল। চলছিল, কিন্তু কয়েকদিন ধরে ববুয়া দেখছে, মার মুখ খুব গম্ভীর।

রাতে মা বাইরে বসে থাকে, দোরগোড়ায়।

দেখতে দেখতে ববুয়া ঘুমিয়ে যায়।

আজ ববুয়ার ঘুম ভেঙে গেল। মিটমিট করে চেয়ে দেখল, মা কাকে ফিসফিস করে কি বলছে।

- বুঝেছ তো, চাচী?

- খুব বুঝেছি, তুই যা.

- খবর জেনে আসবে। কেমন?

- হ্যাঁ হ্যাঁ। তুই যা। অতটা যাবি!

- ওই তো। বিলের ওপারে। যাই।

- সাবধানে, সুরজ!

- হ্যাঁ চাচী।

মা দরজা বন্ধ করল। শেকল তুলল। আগড় দিল। তারপর বিছানায় উঠল।

ববুয়া চোখ বুজে শুয়ে থাকল। কিছু একটা হয়েছে, গুরুতর কিছু।

মা কিছু বলেনি। বেশ! ব'ল না! ববুয়া নিজেই জেনে নেবে সব।

।। দুই।।

সকালে মা একাই ঝাঁসী রওনা হল দুধ নিয়ে। ববুয়াকে বলল, কাল্‌নীটার বাচ্চা হয়েছে, ওকে একটু দেখভাল্ কর। ঝালি এগোলে তো ঢুঁ মারবে।

কথা মিথ্যে নয়। কাল্‌নী ববুয়ার অনুগত। আর কাল্‌নীর মা লাল্‌নী শান্ত মোষ, ঝালির অনুগত। বাহাদুর তো এমন বেয়াড়া মোষ যে পরতাপ ছাড়া ওকে কেউ বাগাতে পারত না। সেই বাহাদুরও কেমন ববুয়ার অনুগত হয়ে গেছে। পরতাপ বোধহয় ওদের কানে কানে বলে গেছে। এখন সময় খুব খারাপ। ঝামেলা কোর না কেউ।

শুধু যে মা গেল, তা নয়, সঙ্গে ভালার মা আর অর্জুনের পিসিও গেল। ঘরে মন বসছে না। ঝাঁসী বাজারে দোকানপাট লোকজন দেখলে মনটা ভাল লাগবে।

ওরা ঝাঁসী যাচ্ছে শুনে কতজন যে কত অনুরোধ জানিয়ে গেল! মুখিয়ার বউ দিল প্যাঁচলাগানো ঘটি।

- বাইসাহেবা রোজ মহালছমী মন্দিরে যায়। লছমীতালের জল এক ঘটি এনো বাছা। পূজোয় কাজে লাগে।

ঝালি বলল, — একটা পেতলের আরশি!

মুখিয়ার ছেলে হরোয়ার বউ বলল, —চোটি (বেণী) পাকাবার লাল দড়ি এনো।

সুরজের দাদী বলল, মোষের গলার থরকি (ঘন্টা)। বেদিনীরাও আসে না আর। এ সব তো তারাই আনত। বলোয়ার ভয়ে পালিয়েছে।

পরতাপের মা বলল, — এত কিছু আনা যাবে? আমরা পিতলের থালা সোনার মত করে মেজেছি, মুখ দেখেছি। এখন এরা পেতলের আরশি চায়।

ভালার মা বলল, — চাইবে না কেন গো? এত বড় শহরের কাছে যদি গাঁ হয়, গাঁয়ের গায়ে লাগবে না শহরের হাওয়া? নে, একটু বোস্, জল খাই একটু। আহা! এই কুণ্ডীর (পাহাড়ী ঝর্ণার জল, যা গভীর গর্তে পড়ে) জল কি মিষ্টি গো!

সবাই আঁজলা ভরে জল খেল। এখন ঝাঁসী কাছে আসছে। কি পাঁচিল! কি বড় বড় ফটক! দরোয়াজাগুলোর নাম বা কত সুন্দর! সাগর, লছমী, অরছা, সাঁইয়ার, ভাণ্ডীর! দেখলে পরে মনে মনে সমীহ হয়।

সুরজের দাদী, ভালার মা, পরতাপের মা'র কত কথা না মনে পড়ছে আজ! সত্যিই গঙ্গাধর রাও নেই। এ কথাও সত্যি, বাইসাহেবা রানী লক্ষ্মীবাইয়ের কাছ থেকে ঝাঁসী কেড়ে নিয়েছে সাহেবরা।

কিন্তু ১৮৫৭ সালের চৌঠা জুন, সাহেবদের সেপাইরাই তাদের মেরে কেটে চলে গেছে, আর আজ নয় মাস বাইসাহেবা রাজ্য চালাচ্ছেন। সাহেবরা তো ছেড়ে দেবে না। তারা আবার আসবে।

ভীষণ, ভীষণ যুদ্ধ হবে। এবারকার যুদ্ধে সাহেবদের পালাতে হবে সাতসমুদ্র পেরিয়ে আপনদেশে।

ঝাঁসীতে চলবে বাইসাহেবার রাজ।

সে অনেক ভালো হবে সন্দেহ নেই। এই তো গত পৌষে বাইসাহেবা শহরের খলিফাদের দিয়ে এক হাজার তুলোর কোট তৈরি করিয়ে গরিবদের দিলেন। কত দানধ্যান, কি হাসিমুখে কথা বলেন। মানুষ কত শান্তিতে আছে!

তেমন শান্তিতে থাকতে কি দেবে?

পরতাপের মা বলল, — খবর নেব আমি। তোমরা লছমীতালের ওদিকে সওদা-টওদা করো, কেমন?

- হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই তো যাবি রানীমহালে।

- মেয়ের কাছে!

- চুপ চুপ। যদি কেউ শোনে...

রানীমহালে নয়, চকবাজারে নয়, পরতাপের মা গেল রানীমহালের পিছনে, রানীর খাস আস্তাবলে।

- কাকে চাই?

একটা জোড়া গোঁফ পাকানো লোক বলল।

- ঝলকারি কোরিনকে বলো ওর মা এসেছে।

- তুমি ঝলকারি কেরিনের মা?

- হ্যাঁ বাছা, ওকে ডাকো।

লোকটি চলে গেল। পরতাপের মা নিঃশ্বাস ফেলল। বাইসাহেবার খাস অনুচর মেয়ে সিপাহীদের একজন ঝলকারি কোরিন। আলাপ হওয়া থেকেও পরতাপের মাকে "মা" বলে।

ঝলকারি এসে দাঁড়াল। বলল, —কি খবর মা?

- বাইসাহেবাকে বলবে, ছেলেরা খবর এনেছে, সাহেবরা আসছে গড়াকোটার দিকে।

- ঠিক আছে মা!

- ছেলেরা কি করবে?

- খুব ছটফট করছে বুঝি?

- হ্যাঁ গো মেয়ে।

- কাল থেকেই দবণ্ডী (ঢোল) বাজিয়ে খবর চলে যাবে। তবে কি! এক গাঁ খবর পেল, অন্য গাঁকে জানাল, এই ভাবে খবর ছড়াতে হবে।

- জানি তোমরা সব কাজই করছ। কিন্তু আমাদেরও তো কিছু করতে মন চায়! আচ্ছা, "খবর ছড়াতে হবে" কেন বললে? খবর তো ছড়িয়ে গিয়েছে।

- কাল থেকেই দবণ্ডী বাজবে।

- ঝাঁসী....রক্ষা পাবে তো?

- নিশ্চয়ই।

- আমরা কি করব? আমরাও ঝাঁসী রাজের প্রজা, আর বাইসাহেবাকে আমি বউ হয়ে আসতে দেখেছি।

এমনসময়ে শোনা গেল, —ঝলকারি! এই তোর মা?

পরতাপের মা চমকে চোখ তুলে তাকাল। পাকা গমের মত রং। মাথায় নীল মুরেঠা, পরনে নীল পাঠানী পোশাক। কিন্তু উজ্জ্বল চোখ। কালো ভুরু। কপালে কি মিষ্টি একটা উলকি, আধখানা চাঁদের কোলে তারা। গলায় মুক্তোর হার।

পরতাপের মা নিচু হতে গেল। বাইসাহেবা বললেন, —ঝলকারি তোমার মেয়ে?

- ওই আর কি! নাম সুবাদে। আমার মেয়ের নামও ঝলকারি। আর ও তো বৈজাগড়ের মেয়ে। ওর মার নাম গঙ্গা।

- তোমার নাম?

- যমুনা।

- তা। কি পরামর্শ করছ?

বাইসাহেবার চোখ যেন হাসছে।

- সাহেবরা তো গড়াকোটার পথে। আমরা কি করব? বেলৌড়ার লোকজন?

- বেলৌড়া! সেই তীর্থে গিয়ে....

ঝলকারি বলল, — মা তো সেই থেকে বিধবা।

বাইসাহেবা খুব সস্নেহ গলায় বললেন, — আমি যদি বেলৌড়ার মানুষ হতাম, সব গরু-ছাগল-মোষ তাড়িয়ে নিয়ে তুলতাম জঙ্গলে। গম-বাজরা-মকাই লুকাতাম মাটি খুঁড়ে। আর ক্ষেতে আগুন দিতাম!

- ভরা ফসলে?

- হ্যাঁ। ওরা যেন একদানা খাবার না পায়, ঘোড়ার ঘাস না পায়। যেন ধুঁকতে ধুঁকতে আসে। গ্রামের কাছে এলে যেন দেখে গ্রামে মানুষ নেই। এ সব কাজ মেয়েরা খুব পারবে।

- ছেলেরা?

- ছেলেরা জানে ওরা কি করবে। আর কাল তেকে সংকেতও জানানো হবে।

পরতাপের মা বলল, - তোমার ভয় করে না?

— না। একটুও না। আমার ভয় তো তোমাদের জন্যে।

- মহালছমী তোমাকে রক্ষা করুন!

ফেরার পথে পরতাপের মা মহালক্ষ্মী মন্দিরে পুজো দিল। সঙ্গিনীদের বলল, মুখিয়ার তো মাথায় ঢোকে না কিছু। ওর মা আর কাকি ছিল দজ্জাল। বউটাও তেমনি। ওকে বোঝাতেই প্রাণ বেরোবে। প্রাণ থাকতে ও ক্ষেতে আগুন দেবে না।

দবগুী বেজেছিল।

দূরদুরান্তেও সবাই জেগে গিয়েছিল। সাহেবদের এক দানা খাবার, ঘোড়ার এক আঁটি ঘাস যেন না জোটে। পাহাড়ী পথে পাথর ফেলে রাখো। নিজেরা পালাও জঙ্গলে। আর ছেলেরা গাছের মগডালে, পাহাড় চুড়ায় উঠে জ্বলন্ত মশাল ঘুরিও। তা দেখে জানা যাবে কোন পথে সাহেবরা আসছে।

বেলৌড়া গ্রামে সে কি উত্তেজনা! মুখিয়া তো বলে দিল ক্ষেত জ্বালাতে পারব না।

পরতাপের মা বলল, —কি করবে, বেচবে?

- নয় তো কি?

সুরজের দাদী বলল, —সাহেবরা যখন গাছে লটকে দেবে, তখন ফসল বেচবে কে?

ববুয়া, তিল্না, কাহ্না, চাঁদের মত ছেলেরা, ঝালি, তিল্নি নান্দির মত মেয়েরা তো খুব খুশি।

ববুয়া বলল, — বিলের পুবধারের জঙ্গলে যাব। ওখানে গেলে কে কাকে দেখে।

মা বলল, — আজ নয়। রাতে কাজ আছে।

—কী কাজ মা?

- দেখতেই পাবি।

হ্যাঁ, অসম্ভব ছটফট করে উঠেছিল বেলৌড়া গ্রাম, যেখানে সবাই কোরি, শুধু একঘর না দু'ঘর হাজাম থাকে। যেখানে সকলেই মেয়েপুরুষে চাষবাস করে, গরু মোষ পালে, দুধ বেচে। ঘরে ঘরে পেতলের বাসন আছে। ঘাঘরা, চোলি আর ওড়নি পরে মেয়েরা। বিধবারাই শুধু কালো পোশাক পরে। চাষবাস-কাজকর্ম করে বলেই উপোস করে না কেউ। পুরুষ-মেয়ে-ছোট মেয়ে-ছেলে সব হট্টাকট্টা জোয়ান। এদের গায়ের রং রোদে পোড়া, তামাটে। ভাংলার বীজ পিষে যে তেল হয়, তা ওরা গায়ে মাথায় মাখে, মেয়েরা তাতে আমলকীর রস মেশায়। বেসেতি দোকান যার, সেও কোরিন। সে ঝাঁসী থেকে এসে তেল, মশলা, বাসন, কাপড় স-ব বেচে।

শিকার টিকার করতে হয়, করেও। তবে বারোমাস মোটা গরম রুটি, ডাল আর আচার দিয়েই খায়।

এ গ্রামে কবে বা কি ঘটেছে? একবার সুরজের দাদীর ঘরের চাল ফাঁক করে বাঘ ঢুকেছিল। আরেকবার ফসল কাটার পর কারা যেন সিদ্ধি খাইয়ে বেহোঁশ করে অমৃত, জগৎ আর বলদেবের টাকা পয়সা নিয়ে পালিয়েছিল। ওরা ঠক। ঘুরে ঘুরে সচ্ছল গ্রামে গাঁয়ের মানুষকে ঠকায়। আর, সত্যি কথা, গাঁয়ের বাইশটা মেয়েমরদ কোন দেশে গিয়ে বিষমেশানো দুধ খেয়ে মরে গেল।

এ কথাটা বেলৌড়ার লোকরা ভোলেনি। কিন্তু এক বছরও হয়নি কত কি ঘটে গেল!

সিপাহীরা সাহেবদের কাটল, বাইসাহেবা হলেন রানী। তারপর সুখেশান্তিতে কটা মাস বা গেল! এখন তো একটাই কথা, দিল্লী, আগ্রা, কানপুর, মীরাট সব অজানা জায়গায় সাহেবরা হেরে মরে ভূত হয়ে গেছে।

ঝাঁসীর কোষ্টাপুরার ভকতজীও তরোয়ালে শান দিচ্ছে আর বলছে, একশো বছর তো হল। এবার সাহেবদের শেষ করব। আবার আমরা আগের মত থাকব।

পরতাপের মা ভালার মাকে বলে, —বাইসাহেবার ফৌজে মুসলমান বলো, তাঁতি-কোরি-বন্দেলা-বাঘেলা বলো, সবাই আছে। তা, আমাদের ছেলেরা হিম্মত দেখালে ওরাও ফৌজীসিপাহী হয়ে যাবে হয়তো।

সুরজের দাদী বলে, — ঔরভরাও তো বাইসাহেবার ফৌজে আছে। তুই চলে যা!

- বয়স থাকলে যেতাম।

- আরে, আমরাও তো তার ফৌজ! এই যে কাজ করছি এটাও তো বাইসাহেবার কাজ!

হ্যাঁ, মেয়েরা কাজ করেছিল গ্রামে গ্রামে।

সাহেবরা যখন এসে পড়বে, তখন নিজেরা উপোসে না মরে সে জন্যে মেঝে খুঁড়ে গমবাজরার বোরা লুকাচ্ছিল।

জ্বালিয়ে দিচ্ছিল শস্যক্ষেত্র, গরু ছাগল মোষ তাড়িয়ে নিচ্ছিল ছোট ছেলেমেয়েরা জঙ্গলে।

আর অনেকদিন বাদে পুরনো তরোয়াল, জং ধরা সড়কি, ভাল্লা, টাঙ্গিতে শান দিচ্ছিল রাতে। ববুয়ারা সেগুলো পৌঁছে দিচ্ছিল জঙ্গলে। আর মেয়েরা নিজেরাও রাখছিল বল্লম দা, ছোট কুঠার।

সাহেবরা এগোচ্ছে, সে খবর ঝাঁসীতে চলে যাচ্ছিল। কেন না গাছের ডগায়, পর্বতচূড়ায় মশালের অগ্নিসংকেত।

ইউরোজ সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া গিল্ড ফোর্মের দুই ব্রিগেড সেন্য নিয়ে ঝাঁসীর পথে এগোচ্ছিলেন।

এ কি শ্মশান হয়ে গেছে গ্রামগুলি?

পথের পাশের শস্যক্ষেত্র আগুনে জ্বলে গেছে, কুয়ো আর পুকুরের জলে বিষ, মানুষজনের সাড়া নেই, গরুছাগল চরতে দেখা যায় না।

ভীষণ রাগে হিউরোজ বললেন, —বিদ্রোহ! বিদ্রোহ করেছে সব! একটা লোককেও যদি ধরতে পারি সব খবর আদায় করে নেব।

পাশের জঙ্গলে ছায়ার সঙ্গে মিশে চলতে চলতে সুরজের আর পরতাপের বুক দমে এল। যুদ্ধ তো হবেই, এরাও এগোবে। এত হাজার হাজার সৈন্য! এত হাতি, এত ঘোড়া, এত কামান! কিন্তু মানুষ কি ওদের এগোতে দেবে?

সুরজরা মুখ কালো করে জঙ্গলে ফিরে এল।

- কি দেখলি, অ সুরজ! অ ভালা! অ পরতাপ!

- ওরা যে এগোচ্ছে!

- কেউ বাধা দিচ্ছে না?

- বারোদিয়া, গড়াকোটা, না লড়াই না করে এগোচ্ছে না মানুষ লড়ছে।

- কি করা যাবে?

- যদি, যদি, ওদের পথ ভুলিয়ে বেপথে নেওয়া যেত!

- ওরা কি একসঙ্গে আসছে?

- গড়াকোটার বোধন দৌয়ার ভাইপো হামির তো বলল, না, আসছে না। একেকজন সাহেব একেক দল সৈন্য নিয়ে আসছে।

পরতাপের মা বলল, —হ্যাঁ, ঝলকারিও তো তাই বলল। চারদিক থেকে এসে মিলবে, আর ঝাঁসী আক্রমণ করবে।

- বাইসাহেবা খুব ভাবছেন?

-ভাবার সময় কোথা? আর, আমরা মহালক্ষ্মীকে ডাকছি, বিষ্ণুমন্দিরে, শিবমন্দিরে পুজো দিচ্ছি সবাই, - মুসলমান সিপাইরা আল্লার করুণা চাইছে, জিত বাইসাহেবারই।

পরতাপের মা বললে, বটে, কিন্তু ববুয়া আর ঝালোকে নিয়ে ঘরে বসবার পরও জেগে রইল। গড়াকোটা, মাদিনপুর, যুদ্ধ হয়নি কোথায়? তবু তো সাহেবরা এগোচ্ছে আর এগোচ্ছে।

।। তিন ।।

সইয়ার গেটের নীচের দিকের দরজা দিয়েই ঢুকল পরতাপের মা। শাস্ত্রী ওকে ঢুকতে দিচ্ছিল না বটে, কিন্তু ও যখন বলল, ''আমি ঝলকারি কোরিনের মা, ''তখন ওকে ঢুকতে দিল।

উঁচু প্রাকারঘেরা দুর্গ-শহর। প্রাকারের মাথা দিয়ে সৈন্যরা ঘোড়া নিয়ে চলতে পারে এত চওড়া। আর বুরুজে বুরুজে কামান পাতা আছে।

গাড়ি গাড়ি গম, মকাই, জনার চলে যাচ্ছে কেল্লায়। উনাও ফটক সেই জন্যেই খোলা আছে। খাবার জমা করে না রাখলে মানুষ খাবে কি? না, ভয় তো পায়নি কেউ। দোকানে, সবজিমণ্ডিতে কেনাবেচা হচ্ছে। মানুষ মন্দির-মসজিদেও যাচ্ছে। সব তো স্বাভাবিকই আছে বলে মনে হয়।

যেন এমনি স্বাভাবিকই থাকে!

যম্‌না কোরিন, পরতাপ-ববুয়া-ঝালির মা, আজকের কত কোনদিন বোঝে নি, এই স্বাভাবিক, এই নিত্যকার জীবন ছন্দ, এটা ওর কাছে কতটা দামী!

নাকে গরম গালার গন্ধ এল।

ওই তো গণেশপুরার মোড়। বিয়ের পর ছোট্ট যমুনাকে নিয়ে এসেছিল শাশুড়ি। হাতের মাপসই গালার বালা আগুন তাতে নরম করে হাতে পরাত চুড়িওয়ালা। লাল আর কালো বালা, দেখতে শোভা।

ঝালিকে নিয়েও চুড়ি পরিয়ে নিয়ে গেছে যম্‌না। মেয়ে সব চুড়ি ভেঙ্গে ফেলেছে। এখন ঝালি দু'হাতে দুটো দস্তার বলা পরে থাকে। যখন ঘর করতে যাবে, তখন খাঁটি রুপোর বালা, হার, মাকড়ি পরে যাবে।

এমনি যেন স্বাভাবিক থাকে ঝাঁসী!

পরতাপ আর ববুয়ার বউদের, ঝালির হাতে বালা পরিয়ে নিয়ে যাবে যমুনা। এই সাহেবদের সঙ্গে লড়াই নিশ্চয় খতম হবে। আবার গ্রামে গ্রামে ছোট ছেলেমেয়েরা চরাবে গরু, মোষ। যুবকরা খাটবে মাঠে। কামারশালায় শোনা যাবে নেহাইয়ের ওপর হাতুড়ির যা। যম্‌নারা উঠোনে শুকোবে গম-মকাই-জোয়ার বাজরা।

ঝলকারি বলল, — সময় খুব কম গো! তাড়াতাড়ি বল।

- লড়াই হচ্ছে তা জানি। তবু ওরা এগোচ্ছে কি করে?

- ওদের সৈন্য বেশি, কামান আর বন্দুক অনেক ভালো।

- তা হ'লে?

- দুটো দিন হাতে পেলে হয়।

- কেন?

- ধামুনি গিয়ে পৌঁছতে পারবে না বুটা খাঁর সৈন্যরা। তার মধ্যেই সাহেবরা ওখানে পৌঁছে যাবে, আর লাল্লা দুলকারা লড়াই করবেন বলেই তৈরি। ওই ছ'শো সৈন্য নিয়ে আসছে বুটা খাঁ। তাকে খবর দেয়া যেত যদি, সে ধারোয়া আর বেতপুর ঘুরে ধামুনি পৌঁছবার চেষ্টা না করে সিধা ঝাঁসী চলে আসত, খুব ভাল হত।

- তাকে পাওয়া যাবে কোথায়?

- নারোলা গড়ে। ওর সঙ্গে আছে ফৌজী-সিপাহী অনেক, ভালো ভালো রাইফেল আছে।

- বেটি, অমন বন্দুক আমাদের কামার গড়তে পারে না?

--হয়তো পারবে এবার।

- তা হলে আমি চলি।

- সবটা বুঝলে তো?

- বুঝলাম।

- সেই জন্যেই তো বাইসাহেবা বলল, আমার সঙ্গে কত মানুষ আছে, সাহেবরা জানে? কেল্লায় আর কতজন? কেল্লার বাইরেই তো অনে—ক মানুষ। এটা তো তাদেরও লড়াই।

যম্‌না অন্যমনস্ক ভাবে বলল, হ্যাঁ...নিশ্চয়...বুটা খাঁকে কেউ চিনবে কি করে?

- ওর এক চোখ কানা, আর বাঁ হাতের কড়ি আঙুলটা নেই। লড়াই করতে করতে শরীরে যে কত...

- চলি বেটি! অনেকটা পথ।

- সাবধানে যেও। বুটা খাঁ খবর পেয়েই এসে পড়বে। পুরনো সিপাহী। ও এসে পড়লে ঠেকাতে পারবে সাহেবদের। তা হ'লে তাঁতিয়া টোপী তাঁর ফৌজ নিয়ে চলে আসতে পারবেন।

- তাঁতিয়া টোপী!

- হ্যাঁ, অনেক বড় ফৌজ! অনেক বন্দুক, অনেক কামান! বাইসাহেবরার বল বেড়ে যাবে।

- এত কি মনে রাখতে পারব? চলি।

- বেলৌড়া থেকে কেউ যেতে পারবে না মা?

- কে যাবে বেটি? জোয়ান বল, আধবুড়ো বল; মরদরা কেউ নেই। যে যার যা হাতিয়ার, তাই নিয়ে গড়াকোটা, বাণপুর, চিরখারি, চন্দেরি, দিকে দিকে চলে গেছে। পরতাপের মত ছেলেরাও পাহাড়ে জঙ্গলে আগুন জেলে নিশানা দেখায়। আছি তো আমরা আর ছোট ছেলেরা।

- ঘরে আসে না?

- ঘরে তো নয়, জঙ্গলে চৌকিঘরে আসে। আমরা রুটি, ছাতু, আচার পৌঁছে দিই। নিয়ে চলে যায়।

- হ্যাঁ...সব গ্রামেই তো এক কহানী!

- এই বলোয়া তো ছোটদেরই মরদ বানিয়ে দিল বেটি! কখনো কি ভেবেছি, ববুয়ার মত ছেলেরা গরু মোষ চরিয়ে জঙ্গলে নিয়ে যাবে, সেখানে থাকবে? ঝালির মত মেয়েরা ঘাস কেটে গঞ্জীতে পৌঁছবে? চলি!

- আবার দেখা হবে।

- তাই বলো!

ফেরার সময়ে মহালক্ষ্মী মন্দিরের দিকে মুখ ফিরিয়ে একটা নমস্কার করল যম্‌না। না, আজ পুজো দিতে যাবে না। সময় হবে না।

গ্রামে ফিরে মা বলল, তুই আজ সুরজের দাদীর ঘরে ঘুমোতে যা ঝালি।

- কেন?

- আমি জঙ্গলে যাব, ফিরতে পারব না।

- আমি কেন সেখানে যাব? বিদি, তিল্‌নি আর আমি খুব থাকতে পারব।

- সব বন্ধ করে দিবি।

- তুমি কিছু ভেব না। তিল্‌নির পিসিও থাকবে।

- সে তো ভাল কথা।

- কি নিয়ে যাবে?

- ছাতু, আচার, গুড়।

বিকেলের আলো থাকতে থাকতে পরতাপ, ভালা, আর অর্জুনের মা, তিনজন চলল জঙ্গলের দিকে। ওদের দেখে মুখিয়া মাথা নাড়ল। খুব খারাপ এই বলোয়া! মেয়েরা মরদদের মত সাহসী হয়ে গেছে।

ঘরে ঢুকে বলল, —মুনাবর কোথায়? এখনো ঘরে ফিরল না?

বউ চুপ করে রইল। মা বলল, —ববুয়াদের সঙ্গে আছে।

- কেন?

- আর কেন! সাহেবরা আসছে জানিস না? গাঁয়ে গরুমোষ কেউ ঘরে রাখছে

এখন? আমিই ওকে পাঠালাম। সাহেব এলে তো তোকে আগে ধরবে। তুই একা মরদ, যে ঘরে বসে আছিস।

মুখিয়া বলল, —বলোয়াটা এসে সব ওলটপালট করে দিল দেখছি। এর পরে যে কি হবে!

বউ নথ নেড়ে বলল, —ঝাঁসীতে বাইসাহেবার রাজই থাকবে। সাহেবরা পালাবে, আর কি হবে? আমরা সবাই....

মা বলল, জঙ্গলে খাবার পৌঁছাই, বুঝলি?

মুখিয়া এতক্ষণে বুঝল।

বলল, — কোনো মরদ নেই, গাঁ-পাহারার জন্যে তো কারো থাকা দরকার!

বউ বলল, —ওঃ! আমরা বর্শা টাঙ্গি নিয়ে লাকড়া (নেকড়ে) তাড়াই, গুলবাঘা (চিতাবাঘ) তাড়াই, কোরিন মেয়ে কম কিসে? পুরণ কারি তো সিপাই ছিল ঝাঁসীরাজে, তার বউ ঝলকারি ঘোড়া চেপে তলোয়ার হাতে ঘুরছে না?

- ঠিক আছে, আমিও যাব। থাকুক পড়ে ক্ষেতী।

- লড়াইয়ের পর ক্ষেতী কোর।

- তাই হবে।

ওরা যখন ঝগড়া করছে, পরতাপের মা-রা তখন জমিয়ে বসেছে।

জঙ্গলের মাঝে অনেকটা জায়গা সাফ করে গাছের খুঁটি দিয়ে বেড়া দেয়া। তার মধ্যে খোঁটা বাঁধা সকলের গরুমোষ। আর চারপাশে মোষ থাকে, মাঝে ববুয়ারা শোয়। কোন জানোয়ার এলে মোষই চঞ্চল হয়ে উঠবে, জানাও যাবে।

জঙ্গলে এখন এত মানুষ ঢুকছে আর বেরোচ্ছে, যে জানোয়াররাও গভীর জঙ্গ লে চলে গেছে।

আজ ধানুয়া আর কালুয়া দুই ভাই এসেছে বারোদিয়া থেকে।

—আমাদের ওদিকে তো সাহেবরা জিতেছে বলে গ্রাম জ্বলে গেছে, লড়াইয়ে মরল শত শত, আর এগারো জনকে ফাঁসি দিয়ে গেল।

- এত মরল, ধনুয়া?

- বিলায়েতী আফঘান সিপাইরা লড়ছিল সাহেবদের সঙ্গে যাতে গ্রামবাসীরা আর বানপুরের রাজা ঠাকুর মর্দন সিং পালাতে পারে ফৌজ নিয়ে। গ্রামবাসীরা শুনল? পাথর, তীর ধনুক, বর্শা নিয়েই লড়তে গেল..পারে কখনো?

- আহা! সৎকারও হল না।

- দাও,কি দেবে দাও। পরতাপরা পাঠাল আমাদের।

- তোদের পায়েও তো চোট।

- ও কিছু নয়, দাও। চারদিক থেকে ওরা এগোচ্ছে।

- অত সহজ হবে না। আমি শুনে এলাম...

পরতাপের মা সব বলল। ধামুয়া বলল, —এ তো জবর খবর। কিন্তু আমাদের ওপর নির্দেশ, ধামুনিতেই যেতে হবে। বুটা খাঁকে খবর দেবে কে?

- বল্ কাউকে, পাঠা কোন মরদকে। ধামুনিতে অনেক লোক আছে লড়বার। বুটা খাঁ নারোলাগড় থেকে বেতোয়া নদীর বুক ধরে যদি এদিকে চলে আসে, মস্ত কাজ হবে।

- কি কাজ?

- সাহেবদের হয়রানি করবে, আটকে রাখবে। তা হলে তাঁতীয়া টোপী এসে যাবেন।

- দাও কি দেবে। দেখি..

ওরা চলে গেলে পরতাপের মা বলল, —কে কোন গাঁয়ের ছেলে সব! কত আপনজন হয়ে গেল দেখ! বলোয়া ফুরাবে, কিন্তু সব ছেলে তো ঘরে ফিরবে না। আমাদের ছেলেরাও. বর্শা-বল্লম—টাঙ্গি নিয়ে কত যুঝতে পারবে?

- ভালার মা বলল, শুয়ে পড় পরতাপের মা!

- জঙ্গলে ঘুমাব, ভেবেছি কখনো?

- ভাবিনি রে অর্জুনের মা! এই বলোয়া ভাবিয়ে ছাড়ল। ওরা সবাই ঘুমোল। ববুয়া জেগে রইল। বুটা খাঁ! একচোখ কানা। বুটা খাঁ! বুটা খাঁ যদি ধামুনি না যায়, ঝাঁসী চলে আসে, তবেই ভালো। কেন ভালো তা ববুয়া জানে না। বাইসাহেবার তো অনেক ফৌজ, গোলন্দাজ, ঘোড়সওয়ার! বুটা খাঁর বাঁহাতে কড়ে আঙুল নেই আর খবরটা ওকে দেয় এমন লোকও নেই। বুটা খাঁ নাকি সাহেবদের আটকে দেবে, দেরী করাবে। তা হলে কে যেন এসে পৌঁছে যাবে অনেক সৈন্যসামন্ত-হাতিঘোড়া-কামানবন্দুক নিয়ে। তা হলে বাইসহেবার ভাল হবে।

ববুয়া উঠে পড়ল। নতুন কাঠ দিয়ে ধুনি উসকে দিল। দাদা বলে, গমগমে আগুনে জানোয়ারদের বড় ভয়। কাল্নীটা দেখ, চোখ বুজে জাবর কাটছে। বলোয়া হয়ে গেলে ববুয়া মাকে বলবে, কালনীর শিং দুটোর মাথায় পেতলের খাপ চাই, গলায় নতুন ঘন্টা।

।। চার।।

বেতোয়ার শীর্ণ ধারা বয়ে যাচ্ছে, সাদা বলি ঝকমক করছে রোদে।

বুটা খাঁকে জোবাহার দৌড়ে গিয়ে বলল, —দেখুন, কি কাণ্ড! দূরবীনটা নিন।

- কি কাণ্ড?

- দেখুনই না।

দূরবীন চোখে দিয়ে বুটা খাঁ দেখলেন, সাদা বালির ওপর দিয়ে একটা মোষ আসছে, তার পিঠে আদুড় গা একটা ছোট ছেলে, মাথায় গামছা বাঁধা।

- ও তো এদিকেই আসছে খাঁ সাহেব!

- এক চোখে আমি ভালই দেখি জোবাহির! কেন আসছে? নীরোলাগড় ছেড়ে এসেছি কতক্ষণ! এখানে দু'পাশে শুধু জঙ্গল আর পাহাড়ী জমি। সবচেয়ে কাছের গাঁ নিশ্চয় পনেরো মাইল দূরে।

- লাঠি তুলে নেড়ে নেড়ে কি বলছে।

- চলো, দেখা যাক। ফৌজকে নিশানা দেখাও। তুমি আর চন্দা ঘাটোয়াল চলো আমার সঙ্গে।

- ছেলেটা জল খাচ্ছে।

- চলো, চলো। আরে! ভয়ডর নেই? বাঘ এসে পড়লে কি হবে?

ববুয়া কাল্‌নীর পিঠে বসে সামনের দিকে তাকাল। হ্যাঁ, ঝোপজঙ্গল নড়ছে, কেউ আসছে। যদি বাঘ হয়? না, বাঘ হলে কাল্‌নী শিং বাঁকিয়ে দাঁড়াত, পা ঠুকত। বাঘ যেন না হয়।

তিন জন সওয়ার। তিন জনের সঙ্গেই বন্দুক। এরকম পিঠে ঝোলানো বন্দুকের কথাই বলছিল মা?

তিন জনই কাছে এল, ঘোড়া থমকে দাঁড়াল। তিন জনকে এক রকম দেখাচ্ছে কেন?

- তুই কে?

- আমি ববু...কিষণ কোরি।

- গাঁ কোথায়?

- বেলৌড়া, ঝাঁসীর কাছে।

- এখানে এসেছিস কেন?

- বুটা খাঁকে বলব।

- বুটা খাঁকে তুই চিনিস?

ববুয়া মুখ তুলল। নাকের নীচে থেকে রুমাল দিয়ে ঘাম মুছছে লোকটা। পাশের লোকটা শুধু তাকিয়ে আছে।

আঙুল তুলে ববুয়া বলল, —তুমি বুটা খাঁ।

- বটে? চিনলি কি করে?

- বাইসাহেবার সিপাহী ঝলকারি কোরিন আমার মাকে বলেছে, তোমার এক চোখ কানা, বাঁ হাতে কড়ে আঙুল নেই।

- হঠাৎ এ সব কথা?

- তোমাকে বলব শুধু।

- বল্। এদের সামনেই বল্।

- না, তোমাকে বলব।

কালোকালো, ঝাঁকড়া চুলো ছেলেটার চোখ কি ঝকঝকে, ঠোঁটে কি জেদ।

- বলো বেটা, আমাকেই বলো। তোমরা দূরে যাও।

ববুয়া সব কথা বলল। মনে করে করে, আঙুলের কর গুনে গুনে।

বুটা খাঁ গম্ভীর হয়ে গেল।

- তোমাকে পাঠাল? এত ছোট ছেলে?

- আর কে আসত? জঙ্গলের ডেরায় যখন পৌঁছল মা, বড়রা নেই, দাদারা তো গাছের ডগা থেকে মশাল দেখাতে চলে গেছে...আর, আর মা তো পাঠায়নি আমাকে। আমি নিজে চলে এসেছি।

- সে কি? কখন রওনা হলে?

- আকাশে ভোরাই তারা ফুটল পুবদিকে, আমিও রওনা হলাম।

- মোষের পিঠে!

- কাল্নী যেমন তেমন মোষ নয়। খুব তেজী আর সাহসী। আর খুব দম কাল্নীর। হ্যাঁ...বলেছে বেতপুর আর ধারোয়া হয়ে ধামুনিতে না যেতে। সিধা ঝাঁসীর দিকে যেতে। তাঁতিয়া...কে যেন আসছেন.. অনেক ফৌজ নিয়ে...তুমি সাহেবদের দেরি করিয়ে দেবে শুধু। তা হ'লেই...

ববুয়ার গলা ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল। ও চেয়ে রইল শুধু। বুটা খাঁ মাথা নাড়ল। বেলৌড়া...ভোররাতে রওনা..এই বনজঙ্গল..একটা ছোট ছেলে...

হঠাৎ দূর থেকে বুম্ বুম্ শব্দ ভেসে এল।

এ তো ধামুনির দিক থেকে।

বুটা খাঁ বলল। চল্, যাচ্ছি। খোদাতাল্লাহ্ সাক্ষী। তোর চোখে আমি সাচাই দেখেছি। চল্।

- তোমাদের সঙ্গে যাব কি করে? কাল্নীকে নিয়ে ফিরতে হবে না? কাল্নীর কিছু হলে...

- বাবা মারবে?

- আমার তো বাবা নেই!

- মা মারবেন?

- না...কাল্নী আমার মোষ। ওর কিছু হলে আমি, আমি কেঁদে কেঁদে মরেই যাব।

বলবীর ঘাটোয়াল ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এল।

- খাঁ সাহেব! খাঁ সাহেব! ধামুনির দিক থেকে..

- জানি। এই ছেলেকে দেখ। এ সাংঘাতিক জরুরি খবর এনেছে, সাংঘাতিক। আমাদের লোক ঠিক খবর দেয়নি। সাহেবরা তো ধামুনি পৌঁছেই গেছে। আচ্ছা বেটা। নির্ভয়ে চলে যাও। তোমাকে খোদাতাল্লাহ্ ঠিক রক্ষা করবেন, কিছু হবে না তোমার।

ঘোড়ার খুরে সাদা বালি উড়িয়ে বুটা খাঁ আর তাঁর ফৌজ চলে গেল।

ব্যস্ সব ঝুমঝুমে নিঃশব্দ আবার। পাহাড়, ঘাটিপথ (পাহাড়ী পথ), জঙ্গল, বেতোয়া। মানুষ সরে যেতেই এক ঝাঁক ময়ূর নামল গাছের ডাল থেকে, ল্যাজঝোলা বানর। না, বাঘ থাকলে ওরা এমন নিশ্চিন্দি থাকত না।

কাল্নীর গায়ে হাত বুলিয়ে ববুয়া বলল, —ঘর চল্ কাল্নী!

পথ, পথ, কত পথ! পূর্য যখন ঢলছে, তখন ববুয়া পৌঁছেছিল বেলৌড়া।

মা দরজা ধরে দাঁড়িয়েছিল।

তারপর?

পরদিন কাকভোরে মা ববুয়াকে নিয়ে ঝাঁসী গিয়েছিল। আর রানীমহালের সামনে গিয়ে বলেছিল, - ঝলকারিকে ডাকো, আমি ওর মা!

তারপর?

মা যখন সগর্বে বলল, - আমার ববুয়া.. কিষণ, মোষের পিঠে চেপে বুটা খাঁকে খবর দিয়ে এসেছে!

তখন কি কম কোলাহল পড়েছিল?

ঝলকারি বলল, —বল তোর কি চাই?

ববুয়া বুড়ো আঙুলে মেঝে ঘষে বলল, বাইসাহেবাকে সামনে থেকে দেখব।

- নিশ্চয় দেখবে!

বাইসাহেবা এগিয়ে এসেছিলেন।

- দেখ! এই তো আমি!

ববুয়া চোখ তুলে তাকিয়েছিল।

মা বলল, - প্রণাম কর্।

- না! ও তো আমার মতই লড়িয়ে। সমানে সমানে আবার প্রণাম কি? এখন! বাহাদুর ছেলে! বলো কি চাও।

ঝলকারি বলল, - এক থলি মোহর চা!

ববুয়া মাথা নাড়ল।

বাইসাহেবা বললেন, —ওকেই বলতে দাও!

- বলোয়া...হয়ে গেলে... কাল্‌নীর শিঙের জন্যে পিতলের খাপ....আর গলায় একটা পিতলের ঘন্টা চাই।

- নিশ্চই পাবে। কাল্‌নী?

- আমার মোষ। ওর পিঠে চেপেই তো-

বাইসাহেবা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, — সে তো হবেই। তোমাকে একটা সত্যিকারের হাতিয়ার দিচ্ছি। বীরকে সম্মান জানাতে হয় তো! কালীবাই! নতুন তলোয়ারটা আনো তো!

ছোট ছেলের মুঠিতে হাতল ধরা যায়, এমনি ছোট তলোয়ার। কিন্তু কি ঝকঝকে!

- সত্যি তলোয়ার?

- সত্যি।

এবার ববুয়া মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে একটা পেন্নাম ঠুকে দিল।

- মা আর ভাইকে মহালক্ষ্মীর প্রসাদ দাও ঝলকারি!

মা বলল, - ঘরে নিয়ে যাই বাইসাহেবা! সকলকে দেব ভাগ করে।

ওরা ফিরে এসেছিল। ওরা যখন ফিরছে, তখন ঝালি মস্ত একটা ফুলপাতার মালা গেঁথে কাল্‌নীকে পরিয়েছে, আর কাল্‌নী সেই মালা চিবোবে বলে চেষ্টা করছে।

- এসেছে। ববুয়া এসেছে!

মা বলল, —সবাই "কিষণ" বলো। ছোট ছিল, "ববুয়া" বলেছি। এখন তো ও বড় হয়ে গেছে। কিষণ! কি পেয়েছিস, দেখা?

তারপর?

সে অন্য কথা, অন্য কথা। সে কথা অন্য সময়ে বলা যাবে। ববুয়ার "কিষণ" হবার গল্প এখানেই শেষ!